বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-প্রণীত

শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত

THE

CASTES AND SECTS
OF
BENGAL

BY

NAGENDRA NATH VASU M.R.A.S.
Editor, Visvakosha ; Associate Member,
Asiatic Society of Bengal, &c., &c.

(THE HISTORY OF THE BENGAL KAYASTHA)

Vol. V.

(কায়স্থ-কাণ্ডের পঞ্চমাংশ)

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

১৩৩৬

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা] [কাগজের মলাট ২॥০ টাকা।

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বিশ্বকোষ প্রেসে এ, সি সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-প্রণীত

শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত

THE

CASTES AND SECTS OF BENGAL

BY

NAGENDRA NATH VASU M R.A.S,

Editor, Visvakosha ; Associate Member,

Asiatic Society of Bengal, &c., &c.

(THE HISTORY OF THE BENGAL KAYASTHA)

Vol. V.

(কায়স্থ-কাণ্ডের পঞ্চমাংশ)

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

১৩৩৬

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩ টাকা] [কাগজের মলাট ২॥০ টাকা।

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বিশ্বকোষ প্রেসে এ, সি সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

যিনি বহু কায়স্থের আশ্রয়স্থল

যিনি ত্রিসহস্রাধিক কায়স্থের সভাপতি বলিয়া সম্মানিত

যাঁহার সদাব্রতে দৈনন্দিন সহস্রাধিক নরনারীর

অন্নের সংস্থান হইয়া থাকে

প্রজারঞ্জন ও দীন পালন যাঁহার নিত্য কর্ম্ম

সনাতন ধর্ম্ম, সদাচার ও সমাজরীতি

অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যিনি নিয়ত-প্রয়াসী

দিল্লীশ্বরগণের প্রদত্ত বংশানুক্রমিক উপাধি

'মহাশয়' শব্দ

যাঁহার আদর্শ চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুটিত হইয়াছে

সেই স্বার্থত্যাগী, বিষয়বৈরাগী, ঋষিকল্প

ভাগলপুরাধিপতি

শ্রীল মহাশয় তারকনাথ ঘোষ মহাশয়ের

পবিত্র নামে

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বিবরণের

এই তৃতীয় খণ্ড

গ্রন্থকারের ভক্তিসহকারে

উৎসর্গীকৃত হইল

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

তৃতীয় খণ্ড সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডের শেষাংশ বা ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে বিশ্বামিত্রগোত্র মিত্রবংশ, কাশ্যপগোত্র দত্তবংশ, শাণ্ডিল্যগোত্র ঘোষবংশ, কাশ্যপগোত্র দাসবংশ, ভরদ্বাজগোত্র সিংহবংশ, ভরদ্বাজগোত্র দাসবংশ ও মৌদ্গল্যগোত্র করবংশ এই সাত ঘরের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাত ঘর বলিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ছয় ঘর, কারণ ভরদ্বাজগোত্র সিংহবংশের মধ্য হইতে দুইটী বংশ দাস উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা ও কুলকারিকাসমূহে বাৎস্যগোত্র সিংহবংশ, সৌকালীন ঘোষবংশ ও মৌদ্গল্য দাসবংশের কুলপরিচয় যেরূপ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—এই তৃতীয় খণ্ড বর্ণিত উপরোক্ত সাতঘরের পরিচয় সেরূপ বিশদভাবে ধরা হয় নাই। কুলাচার্য্যগণ এই কয় ঘরের প্রধান প্রধান বংশ ভিন্ন সকলের বংশ ও কুলপরিচয় লিখিয়া রাখেন নাই। এ কারণ এই সাত ঘরের মধ্যে অনেকেই আদ্যোপান্ত বংশপরিচয় দিতে পারেন না। আমরা মূলগ্রন্থে উক্ত বিভিন্ন বংশের যেরূপ কারিকা ও ঢাকুরী পাইয়াছি, সমস্তই যথাস্থানে ছাপাইয়াছি। যেরূপে মূল কুলগ্রন্থগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে স্বীকার করিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড মুদ্রণকালে উত্তররাঢ়ীয় কোন কুলজ্ঞের সাহায্য পাই নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই খণ্ডের মুদ্রণকালে মিত্রবংশের শেষাংশ হইতে একজন কুলাচার্য্যের সাহায্য পাইয়াছি, তিনি যশোর জেলাস্থ পুঁড়াপাড়ার প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য-বংশোদ্ভব, তাঁহার নাম শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘটকসিংহ তিনি সুপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্য শুকদেব সিংহের বংশধর। তাঁহার পিতামহের স্বহস্তলিখিত কুলগ্রন্থসহ এখানে আসিয়া এই খণ্ডের দত্ত, ঘোষ, দাস, সিংহ ও করবংশের বংশলতা প্রকাশে উপযুক্ত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে তাঁহাদের বংশে পুরুষানুক্রমে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে দত্তবংশের কুলকারিকা বা কুলপঞ্জিকা কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হইবে না। এইরূপ কুসংস্কার এই বংশে প্রচলিত থাকায় ও দত্তবংশের অমূল্য কারিকাগুলি অতি গুপ্ত ভাবে রক্ষিত হওয়ায় অনেক মূল পুঁথি কীটদষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক ঘটক মহাশয় দীর্ঘকাল আমার বিশ্বকোষ-ভবনে থাকিয়া বংশলতা প্রকাশ সম্বন্ধে নানাভাবে সাহায্য করিয়া কেবল আমাকে নহে, উত্তররাঢ়ীয় সমাজকেও চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বলিতে কি এই শরচ্চন্দ্র সিংহের মত ধার্ম্মিক, সরল ও বিনয়ী কুলাচার্য্য আমি ইদানীন্তন অপর কাহাকেও দেখি নাই। আশা করি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ তাঁহাদের এই কুলাচার্য্যকে যথাশক্তি উৎসাহিত করিবেন।*

---

* শুকদেব সিংহের বংশলতা পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত না হওয়ায় যথাস্থানে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বংশধর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহের নিকট বংশলতা পাইয়া প্রয়োজনীয় বোধে এই খণ্ডের সর্ব্বশেষে মুদ্রিত হইল।

১ম ও ২য় খণ্ড এই সমাজের কুলীন-ঘরের পরিচয়জ্ঞাপক বলিয়া উত্তররাঢ়ীয় সমাজে যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে, হয়ত এই ৩য় খণ্ড তাঁহাদের নিকট সেরূপ আদরণীয় না হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট এই খণ্ড সমধিক মূল্যবান্ ও সমাদরের যোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই খণ্ডে মিত্রবংশ প্রসঙ্গে বঙ্গাধিকারিগণের বিবরণ, কাশ্যপ দত্তবংশ প্রসঙ্গে গৌড়েশ্বর গণেশ দত্ত খানের প্রকৃত ইতিহাস, কেশদত্ত, বিষ্ণুদত্ত ও থাকদত্তের বংশপরিচয়, এবং কাশ্যপ দাসবংশ প্রসঙ্গে রাজা সীতারামের বংশপরিচয় ও বীরকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং কেবল উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ বলিয়া নহে, এই খণ্ড সম্বন্ধে সমগ্র বঙ্গবাসীর মনোযোগ আহ্বান করিতেছি। দত্তবংশের ইতিহাস হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে গৌড়বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই এক সময় দত্তবংশের শাসনাধীন ছিল। রাজা গণেশের ত কথাই নাই। তিনি সমস্ত গৌড়বঙ্গের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশ মুসলমান ও পরে তাঁহাদের রাজ্য লোপ হইলেও পাঠানরাজত্বকালে রাজা বিষ্ণুদত্ত ও তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ হিমালয়ের তরাই হইতে গঙ্গা ও পদ্মার উত্তরকূল পর্য্যন্ত এবং বিষ্ণুদত্তের ভ্রাতা কেশদত্তের বংশধরগণ উত্তরে গঙ্গা ও পদ্মা হইতে দক্ষিণে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে বেহার সীমা হইতে সমগ্র ভাগলপুর জেলা থাকদত্ত ও তাঁহার বংশধরগণ কানুনগোরূপে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "খৃঃ ৫০০ হইতে ৬০০এর মধ্যে ... দেখা যায় বৃদ্ধ কায়স্থ ও কায়স্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমি গ্রামের মধ্যে পাইতে পারিত না।"† সেই সুদূর অতীতকাল বলিয়া নহে, খৃষ্টীয় ১৮শ শতক অর্থাৎ ইংরাজাধিকারের প্রাক্কালে বঙ্গাধিকারিগণের কর্ত্তৃত্বকাল পর্য্যন্ত কায়স্থের সেই সনাতন অধিকার বলবৎ ছিল। বলিতে কি ইংরাজাধিকারে বঙ্গাধিকারী ও কানুনগো পদ উঠিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ-সমাজের অবস্থা বিপর্য্যয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

১ম ও ২য় খণ্ড মুদ্রণকালে সিংহ, ঘোষ ও দাসবংশের যে সকল ঘরের সম্পূর্ণ বংশাবলি যথাকালে আমাদের হস্তগত না হওয়ায় প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বংশলতা পৃথক্ পরিশিষ্ট খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। প্রকাশিত ৩ খণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে ত্রুটি ও ভ্রমপ্রমাদ পাইলে তাহা জানাইবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি। সেই সকল ত্রুটি বা ভ্রম পরিশিষ্ট খণ্ডে বা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল। পরিশিষ্টে যাঁহাদের বংশলতা প্রকাশিত হইবে, তাঁহাদের প্রত্যেককেই উপযুক্ত ভাবে অর্থসাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

যাঁহাদের সাহায্যে আমি আজ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, তন্মধ্যে অশেষ সম্মান ভাজন দিনাজপুরাধীশ মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহাদুর

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩৬ সাল, ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক হাজার টাকা, ভক্তিভাজন স্বর্গীয় রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার বর্ত্তমান সভাপতি কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় আট শত এবং ভাগলপুর-সমাজপতি মহাশয় তারকনাথ ঘোষ মহাশয় পাঁচ শত টাকা দিয়া আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম দিতে পারিলাম না। বলিতে কি এরূপ সাহায্য না পাইলে আমি কখনই এরূপ বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতাম না।

অবশেষে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এই তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবার পর বাঁশবাড়িয়ার ও সেওড়াফুলীর রাজবংশের চারি খানা বাদসাহী সনদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ১ম বাদশাহ শাহজাহান-প্রদত্ত রাঘবেন্দ্র দত্তের 'রাজা' উপাধির সনদ*, ২য় শাহসুজা প্রদত্ত রাঘবেন্দ্র রায়ের রাজা উপাধির সনদ, ৩য় বাদশাহ অরঙ্গজেবের প্রদত্ত রামেশ্বর রায়ের 'রাজা মহাশয়' উপাধির সনদ এবং ৪র্থ খানি বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্বাক্ষরযুক্ত ২য় শাহজহানের মোহরাঙ্কিত রাজা রাজচন্দ্র রায়ের জমিদারী সনদ, এই চারি খানি সনদের প্রতিকৃতি যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। রাজা রামেশ্বর রায়ের সনদের বঙ্গানুবাদ ১০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। শাহসুজা প্রদত্ত রাঘবেন্দ্র রায়ের "রাজা" উপাধির সনদে লিখিত আছে—

"১০৬৬ হিজরী ১২ রবি-আওয়াল তারিখে বাদ্‌সাহ শাহজহানের পুত্র শাহসুজা বাহাদুর ধর্ম্মযোদ্ধা রাজেশ্বর ও রাজাধিরাজের মোহরযুক্ত এই মহৎ আদেশ প্রকাশ করিতেছেন—রাঘবেন্দ্র রায় মজুমদার চৌধুরী মহাশয় সুখ্যাতি ও সুবন্দবস্তের সহিত পরগণা কোট-এক্তিয়ারপুর ইত্যাদি স্থানের করাদি আদায় ও পত্তনাদি আবাদ করিয়াছেন। সেই হেতু উক্ত পরগণা কোট এক্তিয়ারপুর আদি বজায় রাখিয়া তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিলাম। তাঁহার পরে তাঁহার মুখ্য উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যে বিদ্বান্ ও উপযুক্ত হইবে, সে ঐ পদে অভিষিক্ত হইবে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য্যাধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ, জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ উক্ত রাজাকে প্রকৃত চৌধুরী জ্ঞান করিয়া 'রাজা' এই উপাধিতে আহ্বান করিবে, এবং তাঁহার উপাধির উপযুক্ত প্রাপ্য অর্পণ করিবে। যাহাতে সরকারের লব্ধ অংশ আদায়, প্রজার মঙ্গল ও বণিক্‌দিগের উপকার হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। করাদি আদায় ও উপঢৌকনাদি নিয়মিত ভাবে তাহার নিকট থাকিবে।"

রাজা রাজচন্দ্রের সনদে লিখিত আছে—"উত্তরাধিকার ক্রমে ৷৶০ আনার সরিক রাজচন্দ্র চৌধুরীকে জানান হইতেছে, মহম্মদ আমীনপুর ওগয়রহ, মহালের তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত ও মালগুজারি যেরূপ ছিল, তদনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন এবং প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া মাস মাস নিজের স্বাক্ষরে বা তাহার মুন্সীর স্বাক্ষরে রাজস্ব পাঠাইবেন। তিনি অন্যায়রূপে এক দির্হাম্‌ও কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। বাঙ্গলা ১১৮৩ সন পর্য্যন্ত যে ভাবে কর আদায়

---

* মূল সনদের প্রতিকৃতি অস্পষ্ট হওয়ায় অনুবাদ হইল না।

হইয়া আসিয়াছে, সেই ভাবেই খাজনা আদায় করিতে থাকিবেন। যে সকল জমি বা জলকর, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহত্তর, আয়মা, মদদমাস বা পীরোত্তর, এই সকল নিষ্করের উপর কোনও বন্দোবস্ত বা হুজুরের অনুমতি ভিন্ন কোনও প্রকার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না। সীমা সরহদ্দ ঠিক রাখিবেন, চোর ডাকাতের হাত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন। প্রজারা কিস্তি কিস্তি যে সকল টাকা দিবে তাহা বর্ষে বর্ষে রাজকোষাগারে চালান দিতে হইবে। সেলামী নজর বা তহরী লইতে পারিবে না। রাজকর বাকী পড়িলে প্রাপ্যকরের পরিমাণ জমি বিক্রয় করিয়া লওয়া হইবে। ১৭৭৮ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর বাঙ্গলার ১১৮৫ সন ২৭শে অগ্রহায়ণ এই সনদ দেওয়া হয়।"

উপরোক্ত চারি খানা সনদ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বাদশাহ শাহজহানের আমল হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় পর্য্যন্ত বাঁশবাড়িয়া ও সেওড়াফুলীর রাজবংশ বিশেষ সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

এই খণ্ডে উক্ত ৪ খানি সনদের প্রতিকৃতি ছাড়া আরও ১২ খানি চিত্র প্রকাশিত হইল। এতদ্ব্যতীত রাজা সীতারাম রায়ের কীর্ত্তিগুলি চিত্র ও প্রথমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা নানাগ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ায় বাহুল্য ভয়ে তাহা আ'র এই গ্রন্থে দেওয়া হইল না।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনকালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বিশ্বকোষ-কুটীর
৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা
১৩১৬ সাল।

তৃতীয় খণ্ডের সূচী।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

(প্রথম খণ্ড ১২৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র)

বাদশাহী সনদের প্রতিকৃতির সূচী।

তৃতীয় খণ্ডের চিত্র-সূচী

বিশেষ ভ্রম-সংশোধন

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মৌদ্গল্য দাসবংশীয় চাঁদপাড়ার চৌধুরীগণের বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৯৪ পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতে লিখিত "পূর্ব্বপ্রথা" শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ ছত্রের শেষ পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিষয় পাঠ করিতে হইবে—"কার্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরীর প্রার্থনা অনুসারে এখন বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ চৌধুরী বাড়ীতে আসিয়া জলযোগ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য নূতন করিয়া নিমন্ত্রণের আবশ্যক হয় না। ব্রাহ্মণেতর অনেকেই ঐরূপে আসিয়া জলযোগ করিয়া থাকেন।"

উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠায় সৌকালীন ঘোষ জজানের উচিত খাঁর বংশে বলরামের ধারার বংশলতায় ২৪ বদনচন্দ্র এবং ২৫ কেনারাম, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র লেখা হইয়াছে। তথায়, ২৪ বদনচন্দ্র, ২৫ পরেশনাথ এবং ২৬ কেনারাম, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র হইবে।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বিবরণ

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বামিত্র গোত্র—মিত্রবংশ

যে পঞ্চ কায়স্থ পশ্চিম দেশ হইতে উত্তররাঢ়ে আগমন করেন, সুদর্শন মিত্র তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। কুলগ্রন্থানুসারে তিনি মায়াপুরী বা হরিদ্বার হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি রাঢ়দেশে যে প্রদেশের সামন্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা এখনও মিত্রভূম নামে খ্যাত রহিয়াছে। জেলা বীরভূমের অন্তর্গত রামপুরহাট মহকুমার এলাকাধীন গয়তা, বোন্‌তা, বেলুন, মেহগ্রাম, কুড়ুমগ্রাম, কালুহা প্রভৃতি গ্রাম মিত্রভূম নামে খ্যাত। সুদর্শন প্রথমতঃ বেলুন গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ ক্রমশঃ নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের গ্রাম ও কক্ষানির্ণয়কালে ১৬৭ খানি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে ৩১ খানি মিত্রের গ্রাম। কয়েকখানি গ্রাম দূরে ২ থাকিলেও অধিকাংশ গ্রামই মিত্রভূমে অবস্থিত।

সুদর্শন আদিত্যশূরের সভায় আসিয়া রাজার প্রধান অমাত্য পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। সুদর্শনের পুত্র সোম ও তৎপুত্র শম্ভুমিত্র। কোনও কোনও কারিকায় ও বংশতালিকায় এই শম্ভু মিত্রকে চন্দ্রমিত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।(১) শম্ভু

---

(১) "সুদর্শনসুতো সোমস্তৎসুতো চন্দ্রমিত্রকঃ। শ্রীকণ্ঠস্তৎসুতো জাতস্তৎসুতো ব্যাসমিত্রকঃ॥
তস্য পুত্র জয়পতিস্তৎসুতো হর্ষমিত্রকঃ।
পুরুষোত্তমাখ্যস্তৎপুত্রো তস্য চত্বারি সূনবঃ। কোচঃ বাচস্পতিশ্চৈব বটমিত্রস্ত মধ্যমঃ॥
কনিষ্ঠো নরসিংহোঽপি এতে চত্বারি সংজ্ঞকাঃ। বেলুনে চ স্থিত কোচঃ মগধে প্রস্থিতো বটঃ।
গোকর্ণগ্রামমায়াতো বাচস্পতিঃ উদারধীঃ। কনিষ্ঠ নরসিংহোঽপি পশ্চাৎ কুড় মমাগতঃ॥
কোচাত্মজঃ শূলপাণিশ্চত্বারি তস্য সূনবঃ। রঙ্গ-রুদ্র-রবিখ্যাতঃ খেলানঃ মেলানস্তথা॥
বেলুনাধিপতি রঙ্গো মেহগ্রামেতু খেলনঃ। হিলোড়াক গতো রুদ্রো মেলানঃ বংশবর্জ্জিতঃ।"

মিত্রের চারিটি পুত্র—শ্রীকণ্ঠ, মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ ও কালিদাস। শ্রীকণ্ঠ বেলুনে ও পুণ্ডরীকাক্ষ গোকর্ণে বাস করেন ও ইহাঁদের বংশধরগণ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থশ্রেণী মধ্যে রহিয়াছেন। মধুসূদন সপ্তগ্রামে ও কালিদাস দক্ষিণরাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থশ্রেণী মধ্যে কালিদাসের বংশ দেখা যায়।

শ্রীকণ্ঠের পুত্র ব্যাস, তৎসুত জয়পতি, তৎসুত হর্ষ বা হরিশ্চন্দ্র, তৎসুত পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের চারিপুত্র—কোচ, বট, বাচস্পতি ও নরসিংহ। কোচমিত্র বেলুনেই বাস করিয়া ছিলেন। বটমিত্র রাজা বল্লালসেনকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।(২)

উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকায় লিখিত আছে--

"মিত্রবংশে সদা ধারা বটমিত্রশ্চ ভাগ্যবান্। কন্যৈকা লক্ষণা তস্য কুমারী রত্নমন্দিরে॥
দূতং প্রেষ্য সমানীয় বল্লালো গৌড়ভূপতিঃ। সা কন্যা পরিণীতবান্ যথাশাস্ত্র নিজেচ্ছয়া॥
বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূৎ মগধেশ্বরঃ। তাত-ভ্রাতৃ-পরিত্যাগী বিরাগী সর্ব্ববন্ধুষু॥
মগধাৎ পুনরায়াতো বটধারা ধনাশ্বযুৎ। রাঢ়ায়াং গীয়তে সর্ব্বে কুলস্থানে পুনঃ স্থিতাঃ॥"(৩)

ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত কাহালগাঁও ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বটমিত্রের রাজধানী ছিল। কাহালগাঁও ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে যেখানে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী হইয়াছেন, তথায় পূর্ব্বতটে পর্ব্বতগাত্রে বটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির ও মহাদেবের নাম এখনও বটমিত্রের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

বটমিত্রের পরিচয়

বটমিত্রের পুত্র মগধদেব মগধরাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে ইনি টিকাইত মিত্র নামে পরিচিত। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বেশীদিন রাজ্যভোগ ঘটিল না। খৃষ্টীয় ১১৯৯ অব্দে মুসলমান-সেনানায়ক মহম্মদ-ই বখতিয়ার খিলিজির আক্রমণে হৃতরাজ্য হইয়া বটবংশধর টিকাইত সপরিবারে বেলুনে প্রত্যাগমন করেন। তথায় আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে স্থান দিলেন না। ইহার দুইটী কারণ ছিল। প্রথম কারণ বল্লালের আদেশে ব্যাসসিংহের শিরশ্ছেদ হইবার পর রাজা লক্ষ্মীধর সিংহ যখন সমস্ত স্বজাতিকে আহ্বান করিয়া সমাজবন্ধন করিয়াছিলেন, তখন বল্লালের শ্বশুর বটমিত্রকে বর্জ্জন করা হইয়াছিল। এজন্য কেহ সাহস করিয়া তাঁহার বংশধরগণকে সমাজমধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় কারণ বটমিত্রের বংশধরগণ মগধরাজ্যে বাস হেতু তাঁহাদিগের ভাষা ও বেশভূষার অনেক পার্থক্য হইয়াছিল। মুসলমানকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠে ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে ধনরত্নাদি সহ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকেরাও পথে বিপদের আশঙ্কায় যোদ্ধৃবেশে অশ্বপৃষ্ঠে আগমন করেন। বাঙ্গালীর চক্ষে এরূপ দৃশ্য বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) "রাঢ়ায়াং গীয়তে বাড়া কুলপঞ্জীবিবর্জ্জিতা।"—পাঠান্তর।

ঘনশ্যামমিত্রের কারিকায় লিখিত আছে,—

"পাঁজির ভিতর লেখা টিকার সূত্র। কেহ বলে মগধ হইতে আইলা বটপুত্র॥
পুরুষ লেখায় কেহো না মিশায় আপনার ভিতর। গণে বলে আতবছাড় মিত্র আনা কর॥
বটপুত্র টিকাইত আইল গৌড়দেশে। উটে বাহিয়া আনে ধন অশেষ বিশেষে॥
অশ্বপৃষ্ঠে দাসদাসী তোলাইয়া যানে। ঘোড়া মিত্র বলিয়া গালি দেন জ্ঞাতিগণে॥
ধনবলে ভূমি করে দেশে আসিয়া বসে। কুলশাস্ত্রে আছে তথা জ্ঞান পরকাশে॥
বলিব বটের বংশ সপ্তদশ গ্রাম। করে ধরিয়া লেখা করি বুঝিয়া লও নাম॥
ধামতড় পদ্মমড়ি কোড়গাঁ নৈহাটি। পাঁচবাড়িয়া শুকপাড়া কৈয়ড় ভালকুটি॥
নগাঁ মান্দারি আর টিকরি সাটই। গজপতিপুর সিদ্ধিপুরা সোনাই আকরবৈ॥
শিবরামবাটী পিলসামা পরে নারায়ণপুর। ঘোষবাটী পায়রাকান্দি যেই বিংশতিপুর॥
ধামতড়ি পদ্মমড়ি নারায়ণপুর। গজপতিপুর ছাড়িয়া বাটী তৈছে হইল দুর॥
নৈহাটী ছাড়িয়া পরে ঘোষহাট গত। আকরগাঞি বলিয়া ডাকে বটের বংশজ॥"

প্রাচীন কারিকা হইতে মনে হয়, জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বটবংশ বেলুন হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তরে যেখানে ব্রহ্মাণী নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছেন, তথায় ধামতড়ি ও আলতড়ি গ্রামে বাস করিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণ ক্রমশঃ কোড়গ্রাম, কৈয়র, পদমুড়ি প্রভৃতি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। অর্থবলে তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজে বাঢ়া মিত্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে ধামতড়ি বা ধামড়ী এবং আলতড়ী গ্রামে কায়স্থের বাস নাই। জঙ্গলমধ্যে একটী দেবীর মন্দির রহিয়াছে মাত্র। তবে নিকটবর্ত্তী স্থানে মধ্যে মধ্যে ইষ্টকালয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়।

প্রাচীন কারিকায় পুরুষোত্তম মিত্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"কোচো বচো বটো নরপুরে ধারা চারি। বটকুল মগধগত গণে গত বারি॥
কালে ফিরে ধারা বলি বশে নানা ঠাঞি। পৃষ্ঠগত ভ্রাতৃড'কে আকরগাঞি॥
কালে ফিরে ধারা বনি ধনে করে কুল। ছাড়া পাঁজি বাড়া গণি তবে বট মূল॥
কন্যকা লক্ষ্মণা দত্তা বটোঽভূদ্‌মগধেশ্বরঃ।
কোচো বচো নর দেশে কুলাবনি পাট। বেলুন গোকর্ণ দুষা দক্ষিণ কপাট॥
কোচো সাত তাথে পাত উত্তরাস্ত ঘাট। পরে ছয় নিরাময় আগে পাছে আট॥
কোচপুত্র শূলপাণি তাথে ধারা চারি। রঙ্গ রুদ্র খেলান মেলান ক্রমে সারি ২॥
রঙ্গ বেলুন রুদ্র মিত্র উত্তরাস্ত গত। খেলান মেহগ্রাম মেলান বংশহত॥
রঙ্গ উভয় পক্ষ পুত্র সাতে দুয়ে নয়। শেষা তিন ধারাহীন ধারাবন্ত ছয়॥
ছয়ে যুগল উত্তরাস্ত দেশে বাসে চারি। তাথে মহী পঞ্চ গাঞি অনুক্রমে সারি॥
কেশে দেশে গরুড় চতুর নারায়ণ। সাধব মাধব কুমার আদি দ্বৈপায়ন॥

কেশে বেলুন দেশে কুল্যা গরুড় কুড়ুমগাঁই। গঙ্গাধারী নারায়ণ হিলোড়া মিশাই ॥
সাধব দক্ষিণে তায় যুগল সন্ততি। গোকর্ণ কাঞ্চনাবাসী কুলপতি গোমতী ॥
মাধব দ্বৈপায়ন কুমায় তিনে ধারা নাই। ছয়ে চারি দেশে সারি তাথে পঞ্চ গাঁঞি ॥”

কোচমিত্র-বংশ কেশবের ধারা
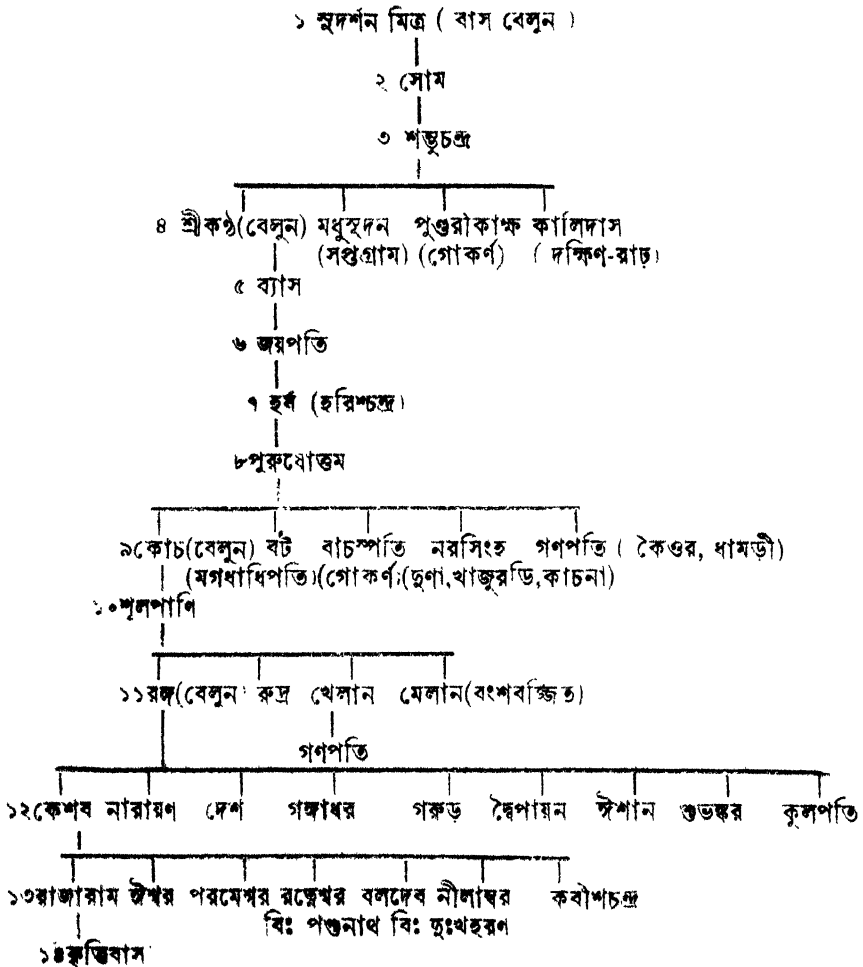
পুরুষোত্তমের জ্যেষ্ঠ পুত্র কোচ মত্র। তৎসুত শূলপাণি। শূলপাণির চারি পুত্র রঙ্গ, রুদ্র, খেলান ও মেলান। মিত্র বেলুনে, রুদ্র মিত্র মিত্রপুরে ও খেলান মিত্র মেহগ্রামে বাস করেন; মেলানের বংশ নাই। মেহগ্রামে যে সকল মিত্র বাসক করিতেছেন তাঁহারা খেলান মিত্রের বংশ বলিয়া প্রাচীন কুলকারিকায় দেখা যায়। কিন্তু কোনও কোনও মতে তাঁহারা কোচ মিত্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গণপতির বংশ। এই বংশের আদিপুরুষ সর্ব্বেশ্বর কাহারও মতে খেলান বা খেলারাম মিত্রের পুত্র; আবার কোনও মতে সর্ব্বেশ্বর গণপতি মিত্রের পুত্র।

কোচমিত্রের বংশ

বেলুনের মিত্র—মাহাতার মি বংশ

সুদর্শন মিত্রের ২৫শ পুরুষ অধস্তন বেলুনবাসী শ্যামকিশোর মিত্র মাহাতাগ্রামবাসী চিন্তামণি রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মাহাতা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্যামকিশোরের পুত্র চৈতন্যচরণ ও চৈতন্যচরণের পুত্র জগন্নাথপ্রসাদ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। জগন্নাথপ্রসাদের জীবদ্দশায় তিনি ও তৎপুত্র বদনচন্দ্র বার্ষিক একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মুনফার জমিদারী অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়াছিলেন। জগন্নাথের মৃত্যুকালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বদনচন্দ্র বয়স্ক ছিলেন। বদনচন্দ্র আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি কিছুকাল বর্দ্ধমান মহারাজের 'দেওয়ান চাকলে' অর্থাৎ প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত ছিলেন। পরে তখনকার মহারাজের মৃত্যুর পর প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ও দ্বিতীয়া বিধবা পত্নী মহারাণীর সহিত যাবতীয় সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মৃত মহারাজের প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীই বিধবা মহারাণীর পক্ষ অবলম্বন করেন। কেবলমাত্র বদনচন্দ্র মৃত মহারাজের পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজকুমারের পক্ষে হুগলী জজ আদালতে মোকদ্দমা করিয়া জয়লাভ করেন এবং তাঁহাকে বর্দ্ধমান রাজগদীতে বসাইয়াছিলেন। মহারাজকুমার বদনচন্দ্রের নিকট উপকৃত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার জমিদারীর কতক অংশ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু সহৃদয় মিত্র মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। ভক্তিমান্ বদন মিত্র চাকরী উপলক্ষে বর্দ্ধমানে থাকিতেন এবং প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় ৺রাধামোহন দেবের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিতে যাইতেন। উক্ত যুগলমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার এরূপ গাঢ় ভক্তি ও প্রেম জন্মিয়াছিল যে তিনি কাঁটোয়ার নিকটবর্ত্তী কালিকাপুর-গ্রামনিবাসী একজন সুদক্ষ ও সুনিপুণ ভাস্করকে আনাইয়া শ্রীশ্রীরাধামোহন জীউর অনুরূপ যুগলমূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য আদেশ দেন এবং উক্ত ভাস্করের সহিত এইরূপ চুক্তি করেন যে, তাঁহার নির্ম্মিত যুগলমূর্ত্তি উক্ত রাধামোহনজীউর যুগলমূর্ত্তির ঠিক অনুরূপ না হইলে তিনি উক্ত ভাস্করের নির্ম্মিত মূর্ত্তি লইবেন না বা তজ্জন্য কোন মূল্য বা পারিশ্রমিক

দিবেন না। একদিন শেষরাত্রে শ্রীশ্রীরাধামোহন জীউ উক্ত মিত্র মহাশয়কে স্বপ্ন দেন, 'তোমার অন্য মূর্ত্তিতে প্রয়োজন নাই, তুমি আমাকে বর্দ্ধমান হইতে লইয়া গিয়া তোমার মাহাতার বাটীতে আমাকে স্থাপিত কর।' তাহাতে মিত্র মহাশয় স্বপ্নাবস্থায় নিবেদন করেন যে, 'প্রভো ! আপনি অতি ধনাঢ্য ব্যক্তির ঠাকুর, আমি সামান্য লোক, আপনাকে কিরূপে লইয়া যাইব ?' তাহাতে রাধামোহন জীউ আদেশ করেন যে, 'আমি ত হার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছি।' সেই রাত্রে ঠিক ঐ সময়েই বর্দ্ধমানাধিপতিকেও রাধামোহনজীউ স্বপ্ন দেন যে, 'বদনমিত্র দ্বারা তুমি বর্দ্ধমান-রাজসম্পত্তি লাভ করিয়াছ, সে তোমার ধন সম্পত্তি কিছুই চাহে না, সে কেবলমাত্র আমাকে চাহে। অতএব কল্য প্রভাতে বদন মিত্র যখন তোমার কাছারীতে আসিবেন, তখন তুমি মিত্রকে আমার শ্রীমূর্ত্তি দান করিও, নচেৎ তোমার মঙ্গল হইবে না।' পরদিন প্রভাতে বদন রাজবাটীর কাছারীতে যাইলে মহারাজ মিত্র মহাশয়কে ডাকাইয়া রাধামোহন জীউর শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে মিত্র মহাশয় বলেন যে, মূর্ত্তিটী বড়ই মনোহারী, তজ্জন্য তিনি কালিকাপুরের জনৈক সুনিপুণ ভাস্করকে অনুরূপ মূর্ত্তি গঠনের জন্য বরাত দিয়াছেন। মহারাজ বলেন যে আর নূতন মূর্ত্তিতে আবশ্যক নাই। রাধামোহনজীউ তোমার বাটীতে যাইতে ইচ্ছুক, তুমি তাঁহাকে লইয়া যাও, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমি কিছু জমিদারী দেবসেবার জন্য দিতে চাহি। তাহাতে মিত্র মহাশয় বলেন যে রাজার ঠাকুর যখন গরীবের বাটীতে যাইতেছেন, আমার যেরূপ জুটিবে সেইরূপ সেবা করিব। আমার জমিদারীর আবশ্যকতা নাই। কিন্তু মহারাজ বলেন যে আমি জমিদারী তোমাকে দিতেছি না, ঠাকুরকে দিতেছি, তুমি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিও না। বদনমিত্র অগত্যা সম্মতি দেন। মহারাজ রাধামোহনজীউ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি এবং বার্ষিক ছয়হাজার টাকা মুনফার লাট চানক নামক বর্দ্ধমান জেলাস্থিত একটী জমিদারী সম্পত্তি মিত্র মহাশয়কে অর্পণ করেন। পরে (১১৯৮ সালে) মিত্র মহাশয় শ্রীশ্রীরাধামোহনজীউকে নিজ বাটী মাহাতা মোকামে লইয়া আসেন। উক্ত লাট চানকসহ বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উক্ত রাধামোহন জীউর দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দেন এবং অতি সমারোহের সহিত উক্ত ঠাকুরের নিত্যনৈমিত্তিক সেবাপূজা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ঠাকুরের সেবাদির জন্য অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দেন।

বদন মিত্রের পরলোকান্তে তাঁহার দুই পুত্র গঙ্গানারায়ণ ও নরনারায়ণ প্রথম যৌবনাবস্থায় পরলোকগমন করেন। গঙ্গানারায়ণ ও নরনারায়ণ অল্প বয়সেই আরবী, পারসী, ও সংস্কৃত ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করেন এবং তাঁহার পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির সহিত একত্র একান্নে সদ্ভাবের সহিত বসবাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পরলোকান্তে তাঁহাদের মাতা স্বীয় স্বামীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত বিবাদ ও কলহ আরম্ভ করেন। তাহার ফলে দীর্ঘকালব্যাপী মালি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বদনমিত্রের দৌহিত্রগণ তাঁহাদের মাতামহের জ্যেষ্ঠাধিকারিত্বসূত্রে যাবতীয় সম্পত্তির রকম ॥৵০ আনা এবং প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ও

তাঁহার সহোদরগণ উক্ত সম্পত্তির রকম ।৴০ আনা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বদন মিত্রের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র মদনচন্দ্র ঘোষ মিত্রবংশের যাবতীয় সম্পত্তির রকম ॥৴০ তাঁহার সহোদরগণ সহ প্রাপ্ত হন। মদন ঘোষ বর্দ্ধমান কালেকটার সাহেবের দেওয়ান বা সেরেস্তাদার ছিলেন। এই সূত্রে সেকালে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু উক্ত মদন ঘোষের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ স্বীয় সহোদর ভ্রাতৃগণকে ফাঁকি দিবার দুরভিসন্ধিতে লাট কুলহাস্তার কালেকক্টরীর রাজস্ব না দিয়া নীলাম করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নীলামে বর্দ্ধমানরাজ খরিদ করেন। বদন মিত্রের স্থাপিত শ্রীশ্রী৺ রাধামোহন জীউ ঠাকুরের যে সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল তাহাও বেনামী করিতে গিয়া ক্রমশঃ ঐ সমস্ত সম্পত্তি বেনামদারগণের হস্তগত হয়। এইরূপে উক্ত মদন ঘোষের শেষ আমলে তিনি ও তাঁহার সহোদরগণ একেবারেই নিঃস্ব হইয়া পড়েন। প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ও তাঁহার সহোদরগণ ধর্ম্মপথে চলিতেন বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক একেবারে নিঃস্ব হয়েন নাই। তবে দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমার ফলে তাহারা বিশেষ ঋণ-ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ সমস্ত ঋণ পরিশোধের পরও তাঁহাদের অনেক টাকা আয়ের সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল। প্রাণকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় অত্যন্ত সদাশয় ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। বৈষয়িক যাবতীয় কর্ম্ম তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর জীবনকৃষ্ণ মিত্র করিতেন। জীবনকৃষ্ণ অতি বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর লোক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। এই কন্যার সহিত রাইপুরনিবাসী সত্যেন্দ্রপ্রসন্নসিংহের (যিনি পরে লর্ড সিংহ নামে প্রখ্যাত হন) বিবাহ হয়। প্রাণকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনারায়ণ পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র গোপেন্দ্র ও নগেন্দ্র বৰ্দ্ধমান জজ আদালতে ওকালতি করিতেন। গোপেন্দ্র ওকালতিতে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণগোপাল মিত্র এক্ষণে জীবিত আছেন। তিনি বীরভূমে সুখ্যাতির সহিত ওকালতি করিতেছেন। শ্রীনারায়ণের তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত প্রথমা কন্যার সহিত রাইপুর-নিবাসী চন্দ্রনারায়ণ সিংহের বিবাহ হইয়াছিল। চন্দ্রনারায়ণ বহুকাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া অবশেষে কলিকাতার ষ্ট্যাম্প কালেক্টার হইয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

কোচমিত্রবংশ—কেশবের ধারা।

- ১৪ কৃত্তিবাস (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
  - ১৫ নরহরি
    - ১৬ যজ্ঞেশ্বর
      - ১৭ মহেশ্বর
        - দামোদর
          - বনমালী
            - ২০ যোগানন্দ
              - ২১ নিরঞ্জন
                - ২২ রামজীবন
                  - রামচরণ
                    - গোবিন্দ
                      - বিশ্বনাথ
                        - পঞ্চানন
                          - রাজীব (বংশ নিজামপুর)
                  - প্রভুরাম
                    - ২৪ নন্দরাম
                      - ২৫ হটুরাম
                        - ২৬ কীর্ত্তিচন্দ্র
                    - আত্মারাম
                      - শিবপ্রসাদ
                        - দোলগোবিন্দ
            - ভৃগুরাম
              - গৌরচরণ
                - রামকৃষ্ণ
                  - উৎসবানন্দ
                    - শ্রীনিবাস
                    - স্বরূপ
                    - সনাতন
                    - গুরুচরণ
              - রামকিঙ্কর
                - নারায়ণ
                  - রামসুন্দর
                    - শিবচরণ
                      - নীলমাধব (চন্দনপুর বীরভূম)
                        - অযোধ্যারাম
                        - হৃদয়রাম
                          - ২৫ শতঞ্জয়
                            - ২৬ শ্যাম
                              - ২৭ শ্রীকৃষ্ণ
                                - ২৮ স্বরূপচন্দ্র
                                  - ২৯ রামচরণ
                                - ক্ষুদিরাম
                                  - রাসবিহারী (মাহাতা)
                            - জগমোহন
                          - মনসুখ
                            - দুর্গাদাস
                        - যদুরাম
                        - হরিদেব
                  - গোবিন্দ
                  - গুরুপ্রসাদ
                  - ভোলানাথ
          - রামহরি
        - কোলাহল
        - কৃষ্ণরাম
        - নিত্যানন্দ
      - ১৭ যশোধর
        - ১৮ পদ্মগর্ভ
          - ১৯ ধরণীধর
            - ২০ জিতরাম
          - ধর্ম্মদাস
        - ভূগর্ভ
          - জন্মেজয়
            - হরিলাল
            - বেচুলাল (বংশ রতনপুর ভাগলপুর)
          - বেদগর্ভ
          - সুরসেন
      - ১৭ ভবনাথ
        - নরহরি
          - রাজারাম
            - কালিদাস
              - রাজীব
                - ক্ষুদিরাম
                  - গুরুপ্রসাদ
                    - রামকিশোর
                    - ত্রিলোচন (বংশ এরোয়ালি)
                  - বলরাম
                  - বিজয়রাম
                  - ভাগবত
            - কৃষ্ণকান্ত
          - রামকান্ত
        - কৃষ্ণরাম

২০ জিতরাম (৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
২১ কৃষ্ণনাথ
২১ জীবনরাম রায় (বাস বোনূতা)
২২ বৃন্দাবন
২২ হরিনারায়ণ
২৩ নিধিরাম
২৩ কাশীনাথ
২৪ দুর্গানাথ
২৪ গোবিন্দ গোপাল
২৫ শ্যামকিশোর
(বাস মাহাতা)
দীনদয়াল ২৫রাধামোহন কৃষ্ণমোহন
বনোয়ারি
২৬গৌরচন্দ্র
নিত্যানন্দ
২৬ চৈতন্য
গৌরাঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণ
নিত্যানন্দ
২৭ অবলাকান্ত বিনয়কৃষ্ণ
২৭ জগন্নাথ
স্বরূপচন্দ্র
ক্ষুদিরাম
রামচরণ রাসবিহারী
সদানন্দ
পরমানন্দ
কন্যা
সর্ব্বানন্দ
রামানন্দ
বদনচন্দ্র
২৮ প্রাণকৃষ্ণ ধনকৃষ্ণ সুধাকৃষ্ণ জীবনকৃষ্ণ
২৮ গতিকৃষ্ণ
কৃষ্ণচন্দ্র
২৯ গৌরনারায়ণ
গঙ্গানারায়ণ নরনারায়ণ
কন্যা
৩০ প্রমথ
(বিবাহ লর্ড
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন
সিংহের সহিত)
জয়নারায়ণ ২৯ শ্রীনারায়ণ কেশবনারায়ণ
৩০ উপেন্দ্র দেবেন্দ্র ৩০ গোপেন্দ্র নগেন্দ্র যতীন্দ্র হেমেন্দ্র ৩০ কৃষ্ণগোপাল
৩১ রমাপ্রসাদ
৩১ প্রভাস
৩২ অপূর্ব্বকুমার
৩২ প্রফুল্ল হরিগোপাল সুন্দরগোপাল
৩১ ক্ষিতীশ ৩১ অনাদীশ ৩১ বারুণীশ ৩১নলিনীশ ৩১সত্যগোপাল ৩১আনন্দ ৩১ব্রহ্মগোপাল
৩২ হ্বারিকেশ
৩২ প্রণবেশ

গয়তার রাজা রামরায় চৌধুরী

কেশমিত্র বা কেশব মিত্রবংশে কৃত্তিবাসের ধারায় সুন্দররামরায় চৌধুরী একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরী 'বীরপুরুষ' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। গঙ্গা-তীরে এলাহিগঞ্জে তাঁহার একটী বাড়ী ছিল। রঘুনাথের সহিত ৫০০০ বাদশাহী সৈন্য থাকিত, কিন্তু তিনি কোন্ পদে কার্য্য করিতেন তাহার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। শুনা যায় তিনি জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারে দাখিল করিতেন। রসড়ার সানন্দ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রামজীবন ঘোষের কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র—রামরাম রায় চৌধুরী ও ভবানী রায় চৌধুরী। বালিয়ার শ্রীধরসিংহ বংশের সুবিখ্যাত রঘুনাথ সিংহের কন্যার সহিত রামরাম রায় চৌধুরীর এবং কান্দী জীবধর বিষ্ণুদাস বংশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের খুল্লপিতামহ মধুসিংহের কন্যার সহিত ভবানী রায়ের বিবাহ হয়। ঘটককারিকায় লিখিত রহিয়াছে—

"কুলে ভবানী গয়তাবাসী। মধুর কুলে মধুর হাসি॥"

উক্ত কারিকায় দেখা যাইতেছে, বিবাহকালে ভবানী রায় গয়তায় বাস করিতেছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রামরায় বেলুন হইতে গয়তায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ রায়ের বেলুন বাস ত্যাগ করিয়া গয়তায় বাস করার প্রবাদই ঠিক বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে মিত্রবংশের কারিকায় দেখা যায়—

"বেলুন হ'তে গয়তা লিখি দুই একই ঘর।"

যাহা হউক, গয়তাবাসের কারণ বেলুন মধ্যে রঘুনাথ রায়ের যে বাসভূমি ছিল যাহা এক্ষণে সেরেস্তায় চকমুরারিপুর নামে লিখিত হয় তাহার পরিমাণ তাঁহার অবস্থার সহিত তুলনায় গৃহাদি নির্ম্মাণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। জ্ঞাতিগণের সহিত বিরোধ করিয়া বল-পূর্ব্বক তাঁহাদের বাসভূমি অধিকার করা অপেক্ষা অন্যত্র গিয়া প্রশস্ত বাস ভবন নির্ম্মাণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া রঘুনাথ গয়তায় বাস করেন।

রঘুনাথের পুত্র রামরায় বাঙ্গালা সন ১০৪৬ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৬৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বনামখ্যাত পুরুষ ছিলেন। সুদীর্ঘ ১১৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া তিনি বহু কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বাদশাহ অরঙ্গজেবের সময়ে তিনি কয়েকটী পরগণার কানুনগোই নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও উত্তররাঢ়ের জমিদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারে দাখিল করিতেন। তৎকালে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল, এজন্য রাঢ়দেশের জমিদারগণ প্রবল হইয়া রাজস্ব আদায়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা স্বাধীন রাজা হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বীর-কিটি বা বীরখেতির রাজা উদয়নারায়ণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। নগরের রাজাও কম শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহাদের আদর্শে অনেক ক্ষুদ্র জমিদার রাম রায়কে অগ্রাহ্য করিতে

লাগিলেন। রাম রায় অগত্যা ঢাকার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট দেশের অবস্থা জানাইতে বাধ্য হইলেন। অপরদিকে যশোহরে রাজা সীতারাম রায় মোগল সৈন্যদলের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় যশস্বী হইয়াছিলেন। এজন্য নবাব ঢাকা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে রাম রায়ের প্রেরিত সংবাদ পাইয়া অবিলম্বেই পশ্চিমবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাম রায় স্বীয় বাসভূমি এলাহিগঞ্জের অপর পারে রাজধানী স্থাপন করিবার জন্য নবাবকে অনুরোধ জানাইলেন। তদানীন্তন বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ রায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে তথায় রাজধানী স্থাপিত হইল এবং নবাবের নামানুসারে রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ রাখা হইল।

মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে আসিয়া প্রথমতঃ রাজা উদয়নারায়ণকে শাসন করিয়া ও তাঁহার সম্পত্তি সরকারে জব্দ করিয়া সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। সীতারাম বন্দী হইয়া দরবারে আনীত হইলে নবাব তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। রামরাম রায়ের মাতা ও সীতারাম রায়ের মাতা দুই ভগিনী ছিলেন। সুতরাং সীতারাম রামরামের মাসতুত ভ্রাতা ও বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। নবাবের নিকট রাম রায় স্বীয় ভ্রাতার জীবনভিক্ষা চাহিলেন। বঙ্গাধিকারী ও জগৎ শেঠ অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নবাব কাহারও প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। তখন রাম রায় সাশ্রুনয়নে নবাবের চাকরিতে ইস্তফা দিয়া ও এলাহিগঞ্জের বাস ত্যাগ করিয়া গয়তার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

রাজকার্য্যে রাম রায়ের বিশেষ যোগ্যতা ছিল এবং তিনি 'রাজা' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি চাকরীর আয় বন্ধ হইলেও পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত ভূসম্পত্তির আয় হইতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া তন্ত্রসাধনায় মনঃসংযোগ করিলেন। রঘুনাথ রায় অধীনস্থ সৈন্যদলের সাহায্যে লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ ও রত্নাদি আনিয়া একটী গৃহে রক্ষা করিতেন। উক্ত গৃহের ভগ্নস্তূপ এখনও 'জয়ঘরা' নামে খ্যাত রহিয়াছে। রাম রায় তন্ত্রসাধনার সহিত সুরাপান অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ এই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিলেন।

প্রবাদ আছে, একদা তিনি স্বীয় গুরু ও পুরোহিতের সহিত চক্রে বসিয়াছিলেন এমন সময়ে জনৈক ভৃত্য আসিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! বেলা তৃতীয় প্রহর, এখনও ঠাকুরসেবা হয় নাই।" পুরোহিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুদিতনেত্রে উঠানে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন দেখিয়া রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত যখন জানাইলেন তিনি দূর্ব্বা খুঁজিতেছেন তখন রাজা স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন "এই পাকা উঠানে এখন কোথায় দূর্ব্বা পাইবেন। যখন এতবেলা পর্য্যন্ত ঠাকুরসেবা হয় নাই তখন শীঘ্রই এই বাড়ীতে দূর্ব্বা গজাইবে। তখন উঠাইবার লোক রহিবে না।" এই মহাপুরুষের বাক্য সত্য হইয়াছে, রাজবাড়ী এখন শ্মশানপুরী তুল্য বোধ হয়।

রাম রায়ের কতকগুলি কীর্ত্তি এখনও পরিলক্ষিত হয়। শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রামের

নিত্যসেবা, দুর্গোৎসব, কালীপূজা প্রভৃতি দেবকার্য্য ছাড়া তিনি রামসাগর নামক পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে ২টী সুদৃশ্য শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে দ্বারদেশের উপরে একখানি কৃষ্ণপ্রস্তরে উৎকীর্ণ একটী শ্লোকে জানা যায়, ১৬১২ শকাব্দের বৈশাখ মাসে মহাষ্টমী তিথিতে মঙ্গলবারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্লোকটী এই—

"শাকে পক্ষৈকষট্ চন্দ্রে মহাষ্টম্যাং মেষে কুজে।
অকারি রামরায়েণ প্রাসাদস্থার্পণং শিবে॥"

উক্ত রামসাগর পুষ্করিণীর ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বের ভিত্তিগাত্রসংলগ্ন একখানি প্রস্তরফলকে উক্ত পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার শকাব্দাদি লিখিত রহিয়াছে। জলমগ্ন থাকায় তাহা পাঠের সুবিধা হয় না। সন ১৮৮৫ সালের মে মাসে ঘাটের জল শুষ্ক হওয়ায় একবার তাহা পাঠ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা স্মরণ নাই। তবে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এইটুকু মাত্র স্মরণ রহিয়াছে।

এই রামসাগর একটী সুদৃশ্য পুষ্করিণী, পরিমাণ ৫০⁄ বিঘা। উচ্চ পাহাড় ও গভীর কৃষ্ণবর্ণ জল দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। এইটী রাম রায়ের বাড়ীর দক্ষিণপূর্ব্ব পার্শ্বে। আর একটী পুষ্করিণী বাড়ীর কিছু পশ্চিমে, পরিমাণ ২৫⁄ বিঘা, নাম রায়দীঘী। তৃতীয় পুষ্করিণীটী বাড়ীর ঈশানকোণে, পরিমাণ ১২॥০ বিঘা, নাম চৌধুরী পুষ্করিণী। পরিমাণের তারতম্যানুসারে উক্ত তিনটী পুষ্করিণী যথাক্রমে সাগর, দীঘী ও পুষ্করিণী আখ্যা পাইয়াছে এবং তাহাদের নামের আদি শব্দগুলি যোজনা করিলে একটী সম্পূর্ণ নাম 'রাম রায় চৌধুরী' পাওয়া যায়। যাহাতে লোকে প্রত্যহই তাঁহার সম্পূর্ণ নামটী উচ্চারণ করে তিনি তজ্জন্য এই অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজা রামরায় চৌধুরীর অপর কীর্ত্তি নদীর স্রোত পরিবর্ত্তন। ত্রিপূতা নদীর জল সতীঘাটা নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেহগ্রাম, কুড়ুমগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের উত্তর পার্শ্বস্থ বহু গ্রামের শস্যহানি করিত। রাজা রামরায় একটী প্রশস্ত খাল কাটিয়া ত্রিপূতা ও 'ব্রহ্মাণী নদী একত্র করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রহ্মাণী নদীর বিস্তার কিছু প্রশস্ত হইয়াছিল। উক্ত নদী জগধরী, আলতড়ি, ধামতড়ি প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া তথাকার জলকষ্ট নিবারণ করিয়া দেয়।

তন্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার যজ্ঞাদির প্রতি বিশেষ আস্থা হইয়াছিল। তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণপার্শ্বে জগডাঙ্গা নামে একটী উচ্চভূমি ও তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ের মত নিম্নভূমি রহিয়াছে। উক্ত নিম্নভূমির চতুঃপার্শ্ব ইষ্টকমণ্ডিত। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে, উক্ত স্থানে ধনরত্ন প্রোথিত করিয়া একটী ব্রাহ্মণ বালককে সজীব অবস্থায় সমাধি দেওয়া হয়। যক্ষের উদ্দেশ্যে এইরূপ অর্থ উৎসর্গ করা হইয়াছিল বলিয়া স্থানটী জগডাঙ্গা নামে খ্যাত। কিন্তু এই প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে রামরায় উক্ত স্থানে একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ স্থানে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি

প্রদান করিতেন বলিয়া কুণ্ডটী প্রশস্ত করা হইয়াছিল। একদা একটী সাধু অর্থলোভে উক্ত স্থান খনন করেন। কিন্তু তিনি অর্থের পরিবর্ত্তে রাশীকৃত ভস্ম দেখিতে পাইয়া পুনরায় মৃত্তিকাদ্বারা খনিত স্থান পূরণ করেন ও স্বীয় দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উক্ত স্থানে এক সহস্র গো আনাইয়া তৃণ ও অন্নাদি খাওয়াইয়া গোসেবা করেন।

রাম রায়ের দুইটী পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী ও উদয়চন্দ্র রায় চৌধুরী রাম রায়ের জীবন-কালেই পরলোক গমন করেন। উদয়চন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। আনন্দচন্দ্রের এক মাত্র কন্যা ভৈরবীদেবীর জামুয়া মুলোবাড়ীর কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের সহিত বিবাহ হয়। বাঙ্গলা সন ১১৩২ সালে একখানি দানপত্র দ্বারা রামরায় কৃষ্ণচন্দ্রকে গয়তার বাড়ীর কিয়দংশ দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। একখানি পুরাতন কাগজে দেখা যায়, কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার সিংহ নবাব সরকার হইতে পরগণা সাহাজাদপুর দশ বৎসরের জন্য বন্দো-বস্ত লইতেছেন। ১১৪১ সালে ১৫০০০৲, ১১৪২ সালে ১৬০০০৲, ১১৪৩ সালে ১৭০০০৲ ও ১১৪৪ সালে ১৮০০০৲ টাকা ও তৎপরে ১.৫০ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১৮০০০৲ টাকা মাল গুজারি দিবার কথা উল্লেখ আছে। উক্ত রামগোপাল বা নকড়ির বংশ নাই। ভৈরবীর অপর দুই পুত্র দেবীপ্রসাদ ও রামশঙ্করের বংশধরগণ এক্ষণে গয়তার বাড়ীতে বাস করিতেছেন।

সন ১১৬১ সালে রামরায় পরলোকগমন করেন। তখন তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ রাণী পীতাম্বরী চৌধুরাণী তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুজ ভবানী রায়ের পুত্র রাজচন্দ্র চৌধুরী জ্যেষ্ঠতাতের নিকট হইতে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া জেন্দুরী গ্রামে বাস করিতেন। তথায় এখনও তাঁহার বাড়ী রাজার বাড়ী বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে ও একটী শিবমন্দির আছে। রাণী পীতাম্বরী ১১৬৮ সালে এলাহিগঞ্জের বাড়ীতে পরলোকগমন করেন। তৎকালে তাঁহার নিকটে ভৈরবীর দুই পুত্র দেবীপ্রসাদ ও রামশঙ্কর এবং রাজচন্দ্র রায়ের দুই পুত্র ফতেচাঁদ ও বুলচাঁদ উপস্থিত ছিলেন। রাণী উভয় পক্ষকে ডাকিয়া বিবাদ করিতে নিষেধ করেন এবং ষোল আনা সম্পত্তির ॥০ আনা ভৈরবীর পুত্র-দ্বয়কে ও ॥০ আনা রাজচন্দ্রের পুত্রদ্বয়কে লইতে বলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। ফলে সদর নিজামতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। দীর্ঘকাল এই মোকদ্দমা চলিতে থাকায় ক্রমশঃ সম্পত্তিক্ষয় আরম্ভ হইল। সন ১২০১ সালে পরগণা সাহজাদপুর ও কতকগুলি ভাল ভাল সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট ছিল, ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকে। এক্ষণে আর কোনও সম্পত্তি নাই। ফতেচাঁদের পুত্র বেণীচাঁদ তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর করিয়া পুরোহিতকে ৬৪ বিঘা নিষ্কর ভূম দান করিয়াছিলেন, এখনও সেই দানপত্র দেখা যায়। গত সেটেলমেণ্ট কালে রাজা রামরায়ের ও তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণের প্রদত্ত নিষ্কর দেবত্র, ব্রহ্মত্র, মহত্রাণ এবং পীরোত্তর ভূমির অনেক দানপত্র বাহির হইয়াছিল।

রামরায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ কান্দী প্রভাকর বংশে হরিদাস সিংহের সহিত হইয়াছিল।

অপর ২টী কন্যার বংশ নাই। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ জামুয়া রঘুনাথপুরে শ্রীমুখ বংশে শিব-নারায়ণ সিংহের সহিত হয়। এই শিবনারায়ণ কিছু ভূমি সম্পত্তি পাইয়া বোন্‌তা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র সভাচন্দ্র সিংহ ভাগলপুরের মহাশয় লোকনাথ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। বেণীচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামচাঁদের প্রপৌত্র জ্যোতিষচন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র এক্ষণে রতনপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। চৌধুরী বংশে আর কোনও ধারা নাই।

এই চৌধুরীবংশের প্রতিপত্তি স্থানীয় সকল জাতির উপরেই ছিল। রাজা রামরায়ের শেষ অবস্থায় ভদ্রপুরের মহারাজ নন্দকুমার যখন লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন, তৎকালে একদিন বেলুন ও নিঙ্গাগ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। কৌলীন্য মর্য্যাদায় নন্দকুমার তাঁহাদিগের সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। রাজা রামরায়ের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা যাইতে পারেন বলিয়া পাঠাইলেন। নন্দকুমার ইহাতে অবমানিত বোধ করিলেন, আর তাঁহা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাঁহারা রামরায়ের বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তদবধি বেলুন ও নিঙ্গা গ্রামের ব্রাহ্মণগণ উত্তররাঢ়ে বিশেষ মর্য্যাদাবান্ রহিয়াছেন।

কুড়ি (ময়রা), সুবর্ণবণিক ও জুগী জাতির বড় সামাজিক কাজ হইলে রাজবাড়ীর অনুমতি লইতে হইত। কুড়ি জাতির চারিটী শ্রেণীর মধ্যে একটী শ্রেণী চৌধুরীর থাক নামে খ্যাত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বড় কাজ হইলে গয়তার মধ্যে 'বর্ত্তনতলা' নামে একটী অশ্বথ-মূলে বসিয়া রাজবাড়ীতে বরণবস্ত্রাদি দিয়া অনুমতি লইয়া নিমন্ত্রণের সুপারি বিলি হইয়া থাকে। বহুদূর হইতে কুড়িগণ এখনও সুপারি বিলি করিবার জন্য এই 'বর্ত্তনতলায়' আসিয়া থাকে।

রাজা রামরায়ের বংশ

- সুন্দররাম রায় চৌধুরী, সুত রঘুনাথ রায় চৌধুরী
  - রাজা রামরামরায় চৌধুরী
    - আনন্দচন্দ্র রায়চৌধুরী
      - কন্যা বিবাহ জেমো রঘুনাথপুর মুলোবাড়ীর মাধসিংহ বংশে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহে (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডের ১ম খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
    - উদয়চন্দ্র রায় চৌধুরী
  - ভবানীরায় চৌধুরী
    - রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী
      - ফতেচাঁদ
        - বেণীচাঁদ
          - রূপচাঁদ
            - হরসুন্দর
              - চন্দ্রশেখর
              - রাখাল
              - বনমালী
            - বিশ্বেশ্বর
              - রামনারায়ণ
              - রামলাল
            - পরেশনাথ
              - হরিশ্চন্দ্র
          - শ্যামচাঁদ
            - সারদা
              - জ্যোতিষচন্দ্র
              - জ্ঞানেন্দ্র
            - বরদা
        - পুত্র
          - ঈশ্বর
            - সিদ্ধেশ্বর
      - বুলচাঁদ
        - পুত্র
          - ভোলানাথ
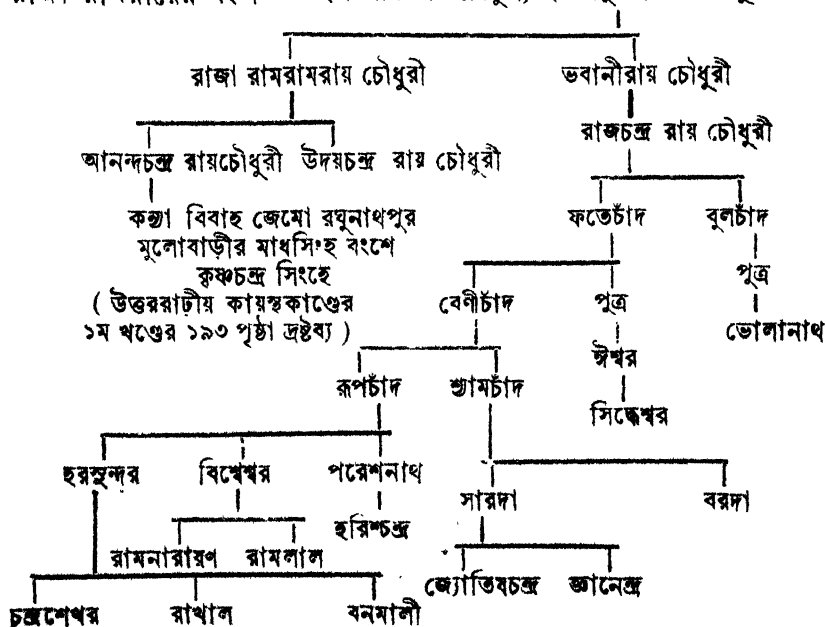
কোচমিত্রবংশ কেশবের ২য় পুত্র ঈশ্বরের ধারা
১২ কেশব মিত্র (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৩ ঈশ্বর মিত্র, সুত ১৪ জয়হরি মিত্র
(সভাপতি)
১৫ পদ্মাবতী
ধৃতিকর
সিতিকর
১৬ লক্ষ্মীনারায়ণ
১৭ অপরাজিত
রাজীব
মধুসূদন
কন্যা (তিন)
১৮ খোসাল
কন্যা
১৯ নরসিংহ
কৃষ্ণমঙ্গল
কন্যা
২০ ফতেচন্দ্র, সুত ২১ কৃষ্ণপ্রসাদ
লক্ষ্মীনারায়ণ, সুত রাজীব
২২ দুর্গাদাস
কন্যা
রামনাথ
সুমেরু
দুর্গারাম
হরিনারায়ণ
২৩ আনন্দীরাম
পীতাম্বর
কন্যা
কোচবংশ কেশবের ৩য় পুত্র পরমেশ্বরের ধারা
১৫ নিঃশঙ্কর মিত্র (১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৬ রামচন্দ্র
১৬ অভিরাম
১৭ নন্দরাম
১৭ সুন্দররাম
১৭ রাধাবল্লভ
বিশ্বনাথ
১৮ দেবীপ্রসাদ
(শিলাকোট)
১৮ কৃষ্ণকান্ত
দীননাথ
লোকনাথ
১৮ গৌরমোহন
১৯ রামকৃষ্ণ
গঙ্গাপ্রসাদ
১৯ রামকান্ত
কুড়ারাম
২০ প্রাণকৃষ্ণ
নবকৃষ্ণ
২০ দুর্লভ
যাদব
গঙ্গাগোবিন্দ
২১ কৃষ্ণগোপাল
২১ সনাতন
ব্রজমোহন
কৃষ্ণমোহন
(শিলাকোট)
২২ জগদ্বন্ধু
২২ রামেশ্বর

কোচবংশ কেশবের ৩য় পুত্র পরমেশ্বরের ধারা

কোচমিত্রবংশ কেশবের ৪র্থ পুত্র রত্নেশ্বরের ধারা

১২ কেশব মিত্র, সুত ১৩ রত্নেশ্বর মিত্র, সুত ১৪ বাণীচন্দ্র

১৫ নন্দরাম, সুত ১৬ রামরাম, সুত ১৭ মদনমোহন | কৃষ্ণরাম (ঘোড়াঘাট) | কৃষ্ণকুমার (বীরভূম)

১৮ মুচিরাম সুধারাম

১৯ কেবলরাম | বংশীবদন (রসড়া)

২০ কৃষ্ণমঙ্গল

২১ কীর্ত্তিচন্দ্র

২২ গৌরসুন্দর

শুকচন্দ্র | পূর্ণচন্দ্র | রামানন্দ | কুঞ্জরাম

বিশ্বম্ভর | কৃষ্ণানন্দ

২২ পীতাম্বর গিরিধর | উৎসবানন্দ মাণিকচন্দ্র জগন্নাথ

২৪ রামকান্ত শ্রীদামচন্দ্র গুরুপ্রসাদ নিমাই

২৫ শ্যামসুন্দর

২৬ বঙ্কবিহারী ব্রজবিহারী গৌরসুন্দর রাধাসুন্দর কৃষ্ণকিশোর
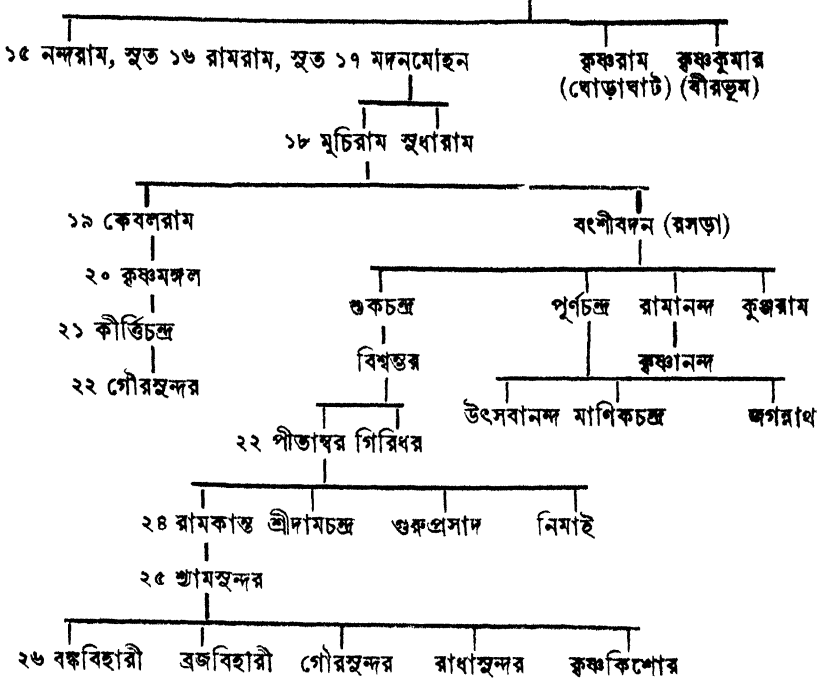
কোচমিত্রবংশ—কেশবের ষষ্ঠ পুত্র নীলাম্বরের ধারা।

১২ কেশব, সুত ১৩ নীলাম্বর

১৪ধরাধর সুধাকর বিশ্বম্ভর

১৫শ্রীজ্ঞান

১৬জ্ঞানানন্দ শোভানন্দ

১৭ দেবীদাস হরিদাস

১৮ গোপাল, সুত ১৯ হরিরাম

২০ উদয়নারায়ণ, সুত ২১ চৈতন্য

২২ কালীচরণ

২৩নিত্যানন্দ (বাস কল্যাণপুর মাহাতার উত্তর)
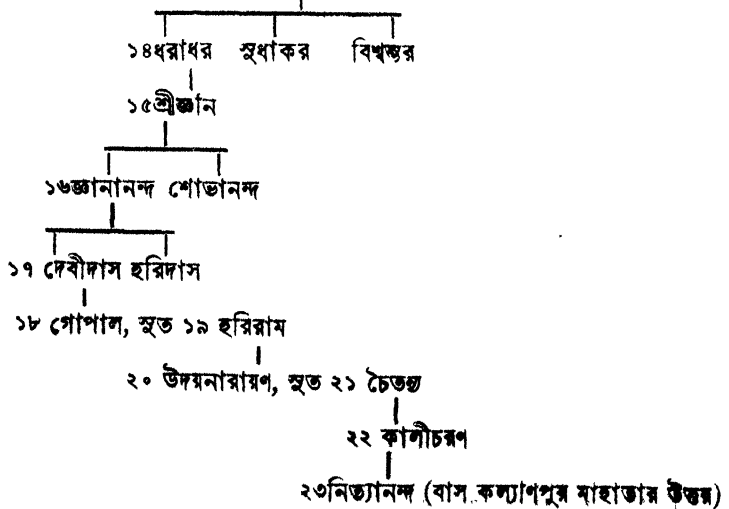
দেশমিত্রের ধারা কালুহার মিত্রবংশ

রঙ্গ মিত্রের ৯টি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব বা কেশমিত্র বেলুন গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। মধ্যম পুত্র নারায়ণ, চতুর্থ গঙ্গাধর ও ষষ্ঠ দ্বৈপায়ন হিলোড়ায়, তৃতীয় পুত্র দেশমিত্র কালুহায়, পঞ্চম পুত্র গরুড় কুড়ুমগ্রামে, সপ্তম পুত্র ঈশান কাচনায় ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র কুলপতি গোমতী বা গুমতা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।* অষ্টম পুত্র শুভঙ্করের বংশধারা নাই।

কোনও মতে দেশ মিত্র বেলুন হইতে মেহগ্রামে গিয়া বাস করেন ও পরে কালুহাগ্রামে গিয়াছিলেন। এই কালুহা গ্রাম মেহগ্রামের এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামের নাম ঘটককারিকায় কোথাও কালুয়া এবং কোথাও কাল্বা লিখিত দেখা যায়। ক্রমশঃ এই 'কালুয়া' 'কালুহা' শব্দে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রামে এক ব্রাহ্মণবাড়ীতে কৃষ্ণ ও বলরাম বিগ্রহের সেবা রহিয়াছে। সাধারণতঃ এই বাড়ীতে কেহ কালুয়ার পাঠ এবং কেহ বা কেলে রায়ের পাঠ কহিয়া থাকে। এই বিগ্রহের নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল কি না বলা যায় না।

দেশ মিত্রের পুত্র কুতুহল মিত্র নিয়োগী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তদবধি তাঁহার বংশধরগণ নিয়োগী উপাধি বহন করিয়া আসিতেছেন। অর্জ্জুন মিত্র রাজকর্ম্ম করিয়া 'রায়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার বংশধরগণ কেহ কেহ রায়, কেহ বা নিয়োগী ও কেহ বা মিত্র লিখিয়া থাকেন।

এই বংশে ব্রজমোহন মিত্র বিশেষ বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি চাকরির অন্বেষণে বাহির হইয়া প্রথমে দিনাজপুর রাজধানীতে একটী সামান্য মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া শেষে দেওয়ান ও বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি 'রায় সাহেব' উপাধি লাভ করেন। তৎকালে দিনাজপুর রাজ্যের অধিকার বহু বিস্তীর্ণ ছিল এবং আয়ও তদনুরূপ ছিল। ব্রজমোহন এই দেওয়ানী কার্য্যকালে কালুহার পার্শ্ববর্ত্তী বহু সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। বাড়ীর পার্শ্বে একটী দীঘিকা খনন করাইয়া স্বীয় উপাধি অনুসারে তাহার নাম 'রায়সাগর' রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়েও মিত্র মহাশয়ের বিশেষ আস্থা ছিল। দুর্গোৎসব এবং ৺ভুবনেশ্বরী ও ৺বাশুলী দেবার পূজা স্থাপন করিয়য়াছেন। ৺লক্ষ্মীনারায়ণদেব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিত্যসেবার জন্য উপযুক্ত দেবত্র সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর পূর্ব্বে দিনাজপুররাজ-বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রজমোহন যে সময়ে তথায় দেওয়ান ছিলেন তৎকালে একদিন তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, "তুমি আমাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত কর।" এই স্বপ্নাদেশের পর পূজারী ব্রাহ্মণের সাহায্যে নিজ বাটী কালুহা গ্রামে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, রাজবাটীতে একটী দুগ্ধবতী

* "ঈশানঃ কাঞ্চনাধীশঃ কুলপতিঃ গোমতীশ্বরঃ।" (ধনঞ্জয়)

গাভী ছিল, প্রত্যহ ॥০ অৰ্দ্ধমণ দুগ্ধ দিত। উক্ত দুগ্ধে ৬লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের সেবা হইত। পূজারী ঠাকুর ৬লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম লইয়া রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলে গাভীটীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কালুহা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের এইরূপ প্রতিষ্ঠার পর হইতে ব্রজমোহনের অবস্থার ক্রমশঃই উন্নতি হয়। কালক্রমে ক্রমশঃই সম্পত্তি ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান বংশধর অশীতিপর মধুসূদন মিত্র।
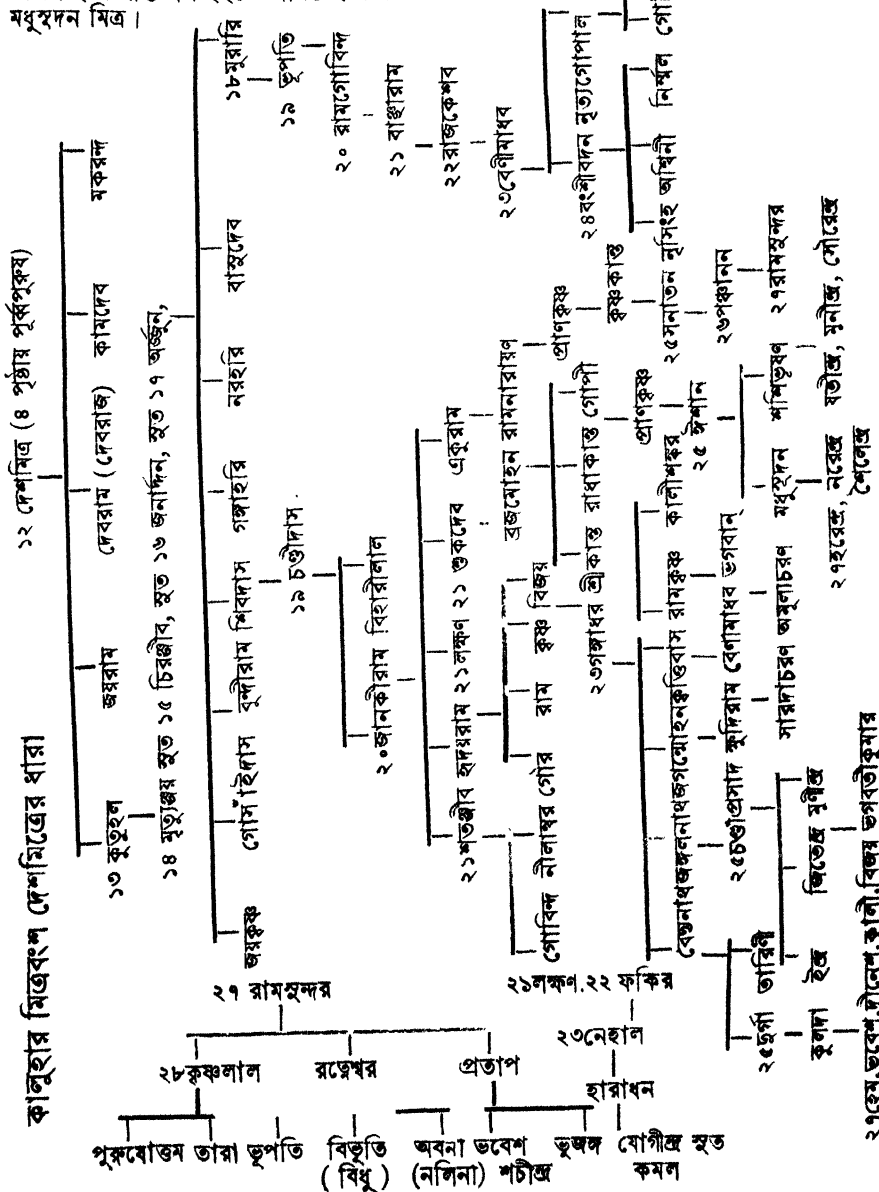
দেশমিত্রের ধারা ছুমকা ও খামরুয়ার মিত্রবংশ
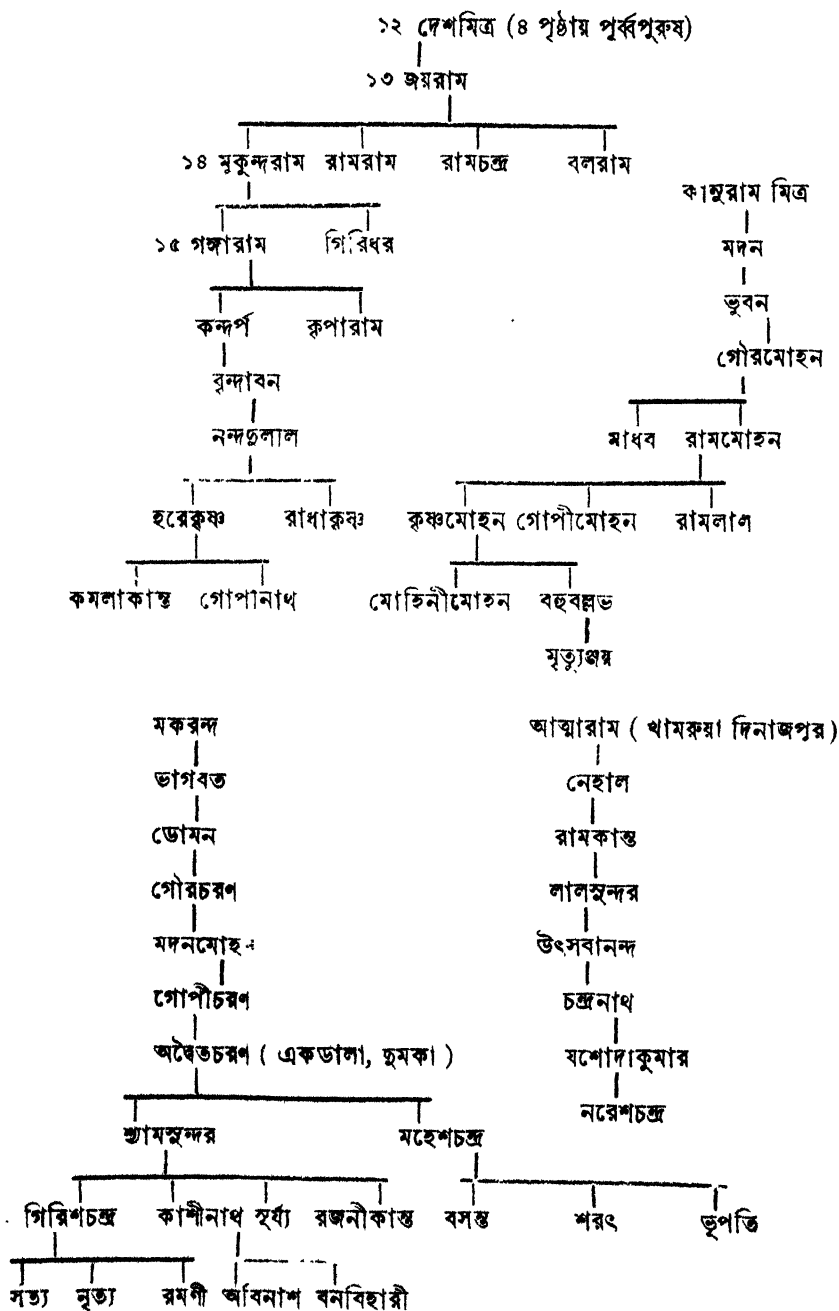
গোকর্ণের মিত্রবংশ

গোকর্ণ উত্তররাঢ়ের মধ্যে একটী গণ্ডগ্রাম, কান্দী হইতে বহরমপুর যাইবার পথে অবস্থিত। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ হইতে অধিক দূর নহে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে এখানে বাস করিয়াছিলেন। মিত্রবংশ মধ্যে পুরুষোত্তম মিত্রের তৃতীয় পুত্র এবং কোচমিত্র ও বটমিত্রের ভ্রাতা বাচস্পতি মিত্র প্রথম এখানে বাস করেন। কুলগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে—"গোকর্ণগ্রামমায়াতো বাচস্পতি রুদারধীঃ।" তাঁহার পুত্র বামনের বংশধরগণ কেহ কেহ গোকর্ণে রহিলেন এবং কেহ বা স্থানান্তরে গমন করিলেন। কেহ বলেন, রঙ্গমিত্রের পঞ্চম পুত্র গরুড় মিত্রও গোকর্ণে বাস করেন। এই দুই বংশই গোকর্ণের মিত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকে পরিচয়ে গোল করিয়াছেন। একই ধারা কোনও কাগজে বামনের বংশ এবং কোথাও বা গরুড়ের বংশ বলিয়া লিখিতেছেন। এই দুই বংশের অধিক কাগজ পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বংশলতা দেওয়া হইল। গরুড় মিত্র কুড়ুমগ্রামে বাস করিয়াছিলেন ও তাঁহার বংশধরগণ তথায় বাস করিতেছেন; সুতরাং গোকর্ণের মিত্রগণ সকলেই বাচস্পতি মিত্রের বংশধর এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না।

কানু (কিনু) রামের বংশধর নবকান্ত মিত্র কার্য্যোপলক্ষে পৈতৃক বাসস্থান গোকর্ণ হইতে মালদহ জেলায় আসিয়া বিষয়সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসাদের ৺গঙ্গার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সেকালে খরস্রোতা গঙ্গানদী বর্ষাকালে দুকূল ভাঙ্গিয়া গ্রামগুলি নিজগর্ভে নিমজ্জিত করিতেন, সেই সময় কালীপ্রসাদের পৈতৃক বাড়ী গঙ্গাগর্ভগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পুনঃ পুনঃ একাদিক্রমে সাত বার স্থান হইতে স্থানান্তরে, এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়াও গঙ্গাতীরেই বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সাতবারই তাঁহার বাড়ী গঙ্গাগর্ভগত হওয়ায় বহু অর্থ নষ্ট হইয়াছিল, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুঞ্জবিহারী পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গঙ্গাতীর হইতে ৭ ক্রোশ দূরে খিদিরপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া কতক আত্মীয়স্বজনকে আনাইয়া বাস করাইবার সুব্যবস্থা করায় বৃদ্ধ কালীপ্রসাদ পুত্রের বিষয়বুদ্ধির ও দূরদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া বরং অসন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তিনি নূতন বাড়ীতে বাস না করিয়া বৎসরাবধি গঙ্গাবক্ষে বজরাতে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাসবিহারী দিনাজপুর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, ইংরেজ রাজপুরুষেরা তাঁহার নিকট ফার্সি ও বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতেন। রাসবিহারী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র যাদবচন্দ্র দিনাজপুরে ওকালতী করিতেন, ইঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কালীপ্রসাদ দিনাজপুরে আসেন। কিন্তু হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় কুঞ্জবিহারী তাঁহাকে খিদিরপুর লইয়া গেলে পীড়াবৃদ্ধি হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে

গঙ্গাতীর পরিত্যাগই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। গঙ্গার প্রতি এরূপ অচলা ভক্তি খুব কমই দেখা যায়।

যাদবচন্দ্র বাৎস্য গোত্রীয় বেণীমাধব সিংহের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন। বেণীমাধব সিংহ তৎকালে একজন প্রতাপশালী লোক ছিলেন, নীলকুঠির সাহেবদের সহিত তাঁহার বিষয়সম্পত্তি লইয়া মনোমালিন্য থাকা কালে কুঠির সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, উভয় পক্ষের বিরোধ ক্রমশঃ অতি গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষের ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সিংহ মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বল প্রজাদের রক্ষার্থে জীবনপাত করিয়াও অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিবেন। এ কারণে কোন পক্ষই নিজ দলবল ছাড়া কখনও চলিতেন না। প্রবাদ আছে যে একদিন দৈবদুর্ব্বিপাকে সিংহ মহাশয় অনুচরবর্গের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া একাই অশ্বারোহণে বহির্গমন করেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে অসি সঞ্চালন করিতে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। সেদিনও তিনি অশ্বপৃষ্ঠেই বাহির হইয়াছিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গমনকালে কটিদেশে তাঁহার অসি ঝুলিত। একাকী বহির্গমনবার্ত্তা কুঠির সাহেবদের নিকট পঁহুছিতে বিলম্ব হয় নাই। প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে কুঠিয়াল ফৌজ ও সাহেব-কর্ত্তৃক সশস্ত্র আক্রান্ত হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও বীরদর্পে আত্মরক্ষার্থে অসি চালনা করিতে লাগিলেন। একাকী বহু লোকের সহিত সংঘর্ষে আহত হইলেও অশ্বারূঢ় কুঠির বড় সাহেব ভীষণ ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উভয়েরই জীবন বিপদাপন্ন হয়, কিন্তু সিংহ মহাশয় স্বীয় মস্তকোপরি উত্থিত সাহেবের তরবারির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সিংহ-বিক্রমে তরবারি সঞ্চালন করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে আক্রমণকারীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া ক্ষতবিক্ষত শোণিতাক্ত দেহে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এতদ্‌সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমায় নিজপক্ষ সমর্থন করিতে বহু অর্থব্যয় ঘটিয়াছিল। পরিণামে নীলকুঠির বড় সাহেবের মৃত্যুর পর কুঠি উঠিয়া যাওয়াতে তৎসঙ্গে সাহেবের অত্যাচার হইতে নিরীহ প্রজাবর্গের নিষ্কৃত-লাভই তিনি যথেষ্ট পুরস্কার মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার ৭ পুত্র ভূগর্ভপ্রোথিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে করিতে সাত ভ্রাতাই মৃত্যুমুখে পতিত হন, এমন কি, কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া ব্যতীত বংশে আর কেহ রহিল না।

যাদবচন্দ্র বহু বৎসর অতি সুখ্যাতির সহিত ওকালতি ব্যবসায় কাটাইয়া বৃদ্ধাবস্থায় পীড়িত হইলে গঙ্গাতীরে বাস করিলেই রোগমুক্ত হইবেন এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন সুচিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া গেলে তিনি হতাশ হইয়া পড়েন এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কায়স্থ জাতির উন্নতিকল্পে দিনাজপুরে যে সকল অনুষ্ঠান ছিল তিনি সকল গুলিতেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং স্বজাতিপ্রতিপালক ছিলেন; অনেক আত্মীয় কুটুম্বকে আনিয়া দিনাজপুরে বসবাস করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে বহু বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহারই প্রতিপালিত আত্মীয়েরা বিষয় সম্পত্তি লইয়া তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই একাদিক্রমে

৫। ৺যাদবচন্দ্র মিত্র

১৫ বৎসর ধরিয়া দেওয়ানী ফৌজদারী বহু মামলা মোকদ্দমা করেন। দুইবার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হয়, দ্বিতীয়বার মহামান্য হাইকোর্টে হিন্দু যৌথ পরিবারের যে কেহ স্বোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা বিষয়সম্পত্তি অর্জ্জন করিলে তাহাতে তাহার ওয়ারিসই উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইবে এরূপ একটী বর্ত্তমান সময়োপযোগী সুন্দর নজির হওয়াতে বাঙ্গালাদেশে দায়ভাগ হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত সম্প্রদায় মধ্যে বিষয় সম্পত্তি লইয়া অনর্থক মামলা মোকদ্দমা হওয়ার আশঙ্কা কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমিয়াছে।

যাদবচন্দ্রের এক পুত্র ও চারিটী কন্যা। যাদবচন্দ্রের মৃত্যু কালে তৎপুত্র গৌরাঙ্গসুন্দর রাজনীতি শাস্ত্রে অনার্স বি এ পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এম এ এবং তদানীন্তন নূতন প্রতিষ্ঠিত ইউনিভারসিটি কলেজে আইন পড়িতেছিলেন, এখন হাইকোর্টের এডভোকেট হইয়া দিনাজপুরে ওকালতি করিতেছেন। গৌরাঙ্গসুন্দর লর্ড সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র রাইপুরের জমিদার ৺সজনীকান্ত সিংহ হাইকোর্টের উকিল মহাশয়ের প্রথমা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

(২৫ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।)

বাচস্পতিমিত্রের বংশ বামনদেবের ধারা
৯ বাচস্পতি (৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১০বামনদেব
১১তনু আদিত্য কিনু শুক্লাম্বর
১২নরেন্দ্র গজেন্দ্র ১২শুভঙ্কর মধুসূদন ১২দেশ বলিনাথ রুদ্রনাথ
১৩ কানাই
পদ্মগর্ভ যদু শ্রীনাথ রত্ন সর্ব্বা রাম অনন্তপরমেশ্বর অম্বি চণ্ডী সূর্য্যবর জয়নাথ দয়ারাম
১৪শ্রীকান্ত
মথুরেশ রামকান্ত রামচন্দ্র
১৫শ্রীনিবাস
১৭ব্রহ্মানন্দ রামানন্দ শিবা ভবা ১৪হেরম্ববনমালী মহেশ বিপ্র লালচাঁদ মুলুক রামনাথ
১৬বংশীবদন
নিরঞ্জন জয়হরি বংশীবদন দেবকী কৃষ্ণরাম
ধ্রুবানন্দ নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ পুষ্পকেতন মাধব দ্বীপচন্দ্র নীলাম্বর বুলচন্দ্র বাবু
১৭ জনার্দ্দন
শ্রীকান্ত
পুরুষোত্তম রাজা শুক
১৮ভৃগুরাম
পুর জানকী বৈদ্য পরমা তেজনারায়ণ গরেশ
গোবিন্দ গোপাল
১৯ রাজকিশোর
ঘনশ্যাম মহেশ নন্দকিশোর রাম নিরঞ্জন পার্ব্বতী রামেশ্বর জগদ্দুর্লভ
মহেশ হরিদাস
২০গৌরীকান্ত
১৬শুকদেব ভিখারী ১৮ নবকান্ত ১৮কালীপ্রসাদ
২১উৎসবানন্দ
রাধাচরণ ১৯মথুরানাথ
১৯রুদ্রচরণ পরমানন্দ কালাচরণ বিদ্যাধর দুর্গা কালা
১৮চন্দ্রনারায়ণ গৌরীচরণ
তারিণীশঙ্কর উমাচরণ চণ্ডীদাস চৈতন্য গোবিন্দ হরিবল্লভ
ভোলানাথ বৈদ্যনাথ কৃপারাম ভৈরব কাশী
নিত্যগোপাল শরচ্চন্দ্র রামতনু মৃত্যুঞ্জয় নবাকিশোর
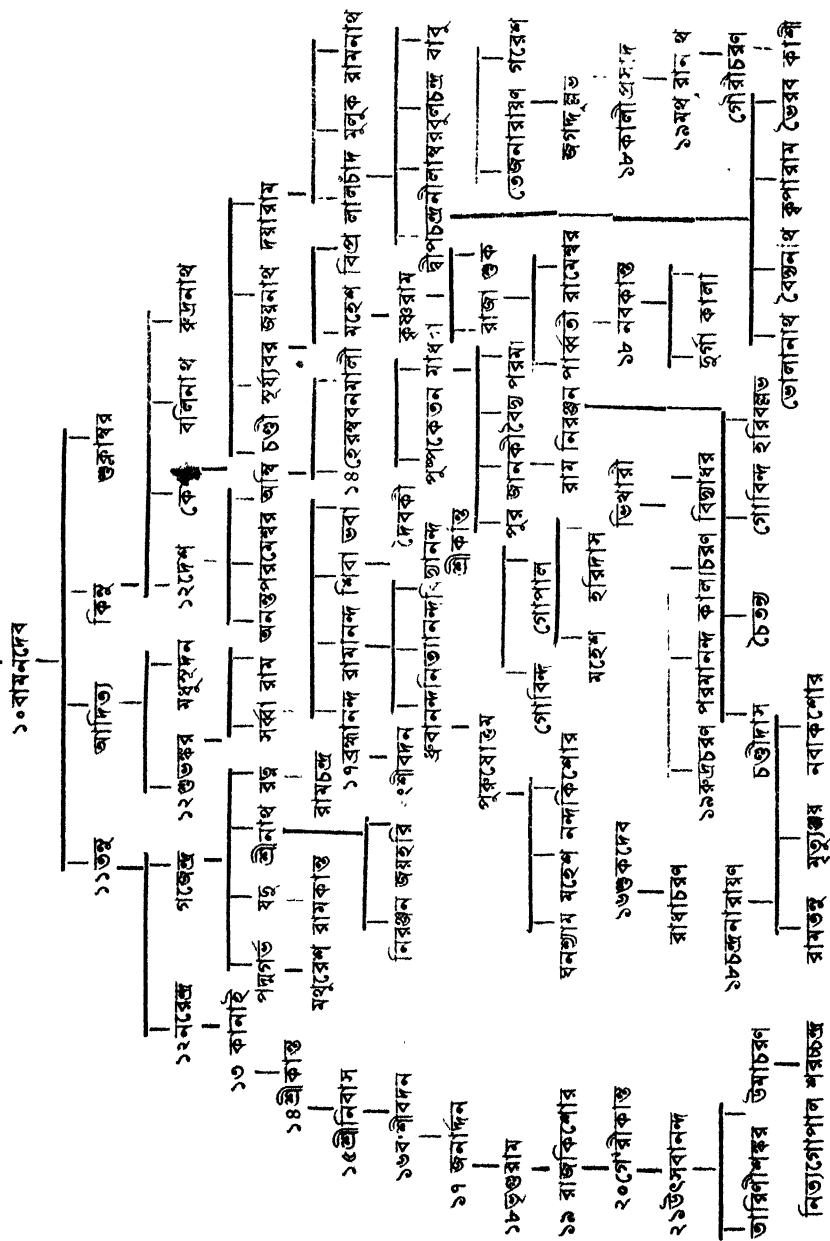
গোকর্ণের মিত্রবংশ
১৩ জয়নাথ (২৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৪ গোপীকান্ত
১৫সূর্য্যবর
১৬ মহেশচন্দ্র, সুত ১৭ কৃষ্ণরাম
১৬বিপ্রচরণ
শিবরাম
ঘনশ্যাম
শুকদেব
রাজারাম
নিত্যানন্দ
নন্দরূপ
শম্ভু
বৈদ্যনাথ
দেবীচরণ
১৯চন্দ্র
আনন্দরাম
পার্ব্বতীচরণ
১৯গুরুপ্রসাদ
পদ্মলোচন
গণেশ
বিশ্বনাথ
২০রাধাচরণ
২০নবকান্ত
সদানন্দ
হারাধন
নিত্যানন্দ
উৎসবানন্দ
২১রামতনু
মৃত্যুঞ্জয়
নবকিশোর
২১দুর্গাপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ
২২গুরুচরণ
রামযাদব
গৌরচন্দ্র
উমাশঙ্কর
বঙ্কবেহারী
রামকল্যাণ
কুঞ্জ
রাসবেহারী
যাদবচন্দ্র
ত্রৈলোক্য
ব্রজরমণ
কৃষ্ণচন্দ্র
যোগেন্দ্র
পঞ্চানন
ইন্দুভূষণ
রামেন্দ্র
মহেন্দ্র
গৌরাঙ্গসুন্দর
মন্মথনাথ
বিধুভূষণ
বিভূতি
হরেন্দ্র
খগেন্দ্র
দিগিন্দ্র
সত্যেন্দ্র
২৩ রমণী
শশিভূষণ
বিপিন
রামতারক
অরুণকুমার
বিনয়কুমার
ভূপতি
অবনি
সুধীর
ধীরেন্দ্র
চিত্রভূষণ
বিভূতি
ভুজঙ্গ
সুবলচন্দ্র
শান্তিকুমার

কুড়ুমগ্রামের মিত্রবংশ

রঙ্গমিত্রের সপ্তম পুত্র গরুড় কুড়ুম গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম বেলুন গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। প্রবাদ যে গরুড় বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসে ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে যথাশাস্ত্র তাঁহার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করা হয়। এই পিণ্ডদানের অল্প দিন পরেই গরুড় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তখন জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দিলেন। গরুড় স্বীয় পৈতৃক বাসভূমি হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে কুড়ুম গ্রামে বাস করিলেন এবং বেলুন ও মেহগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য গ্রামের কুটুম্বগণের সহিত সামাজিক ব্যবহারের অধিকার পাইলেন। 'পিণ্ড খাওয়া মিত্র' বলিয়া উক্ত দুই গ্রামের মিত্রগণ গরুড়ের বংশধরগণকে ঘৃণা করিতেন। উত্তরকালে কুড়মগ্রামের মিত্রগণ অবস্থার উন্নতি করিয়া সমাজে অনেক ভাল ভাল ঘরে আদান প্রদান করিয়াছিলেন। তথাপি মেহ-গ্রামের মিত্রগণ আজ পর্য্যন্ত কোনও সামাজিক ভোজে কুড়মগ্রামের মিত্রগণের বাড়ীতে আহার করেন না। গরুড় মিত্রের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে অর্জ্জুন মিত্র গৌড়ের বাদশাহের অধীনে উচ্চপদে কর্ম্ম করিতেন ও মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গৌড় হইতে উড়িষ্যা যাইবার একটী প্রশস্ত রাজপথ কুড়ুমগ্রামের ও বেলুন গ্রামের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ছিল। এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বৈলুন গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা (প্রায় ১২৫ কি ১৫০ বিঘা) উক্ত রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে রহিয়াছে।

অর্জ্জুন মিত্র স্বীয় বাসভূমি কুড়ুমগ্রামের উত্তরপূর্ব্বাংশে উক্ত রাজপথের পার্শ্বে একটী জলাশয় খনন করাইয়া অর্জ্জুনবাঁধ নাম রাখিলেন। পথিকগণের সুবিধার নিমিত্ত ঘাটের পার্শ্বে তাঁহার নিয়োজিত ভৃত্য স্নানের জন্য তৈল, গামছা ও জলপানের উপযোগী কিছু খাদ্য লইয়া উপস্থিত থাকিত। বেলুন ও মেহগ্রামের মিত্রগণ অর্জ্জুন মিত্রের এই সৎকীর্ত্তির জন্য প্রশংসা না করিয়া একখানি গামছায় বহুলোক স্নান করিবার ব্যবস্থা করা হেতু 'একগামছা কুড়ুমগ্রাম' বলিয়া উপহাস করিতেন। এখনও এই প্রবাদ চলিত রহিয়াছে।

অর্জ্জুন মিত্রের অপর কীর্ত্তি—তিনি গ্রামের সমস্ত পথ ইষ্টকমণ্ডিত করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে নষ্ট হইলেও এখনও উক্ত ইষ্টকমণ্ডিত পথ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অর্জ্জুন মিত্রের পৌত্র ভবানী দাসের দুই পুত্র কালিকানন্দ ও মাধবানন্দ। কালিকানন্দের পুত্র ভবানন্দের সহিত মাধবানন্দের পুত্রগণ যে সময়ে পৃথক্ হইয়াছিলেন তখন মাধবানন্দের ৮টি পুত্রের নামানুসারে তাঁহার বংশধরগণ ৮ তরফ ও ভবানন্দের ৫টি পৌত্র হইতে তাঁহার বংশধরগণ ৫ তরফ নামে খ্যাত হইলেন। সমস্ত সম্পত্তি এবং দেবসেবাদি এইরূপে বিভক্ত হইয়াছিল। এখন দেখা যায়, দক্ষিণদ্বারী অর্থাৎ পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে ৮ তরফের দুর্গোৎসব হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বদ্বারী অর্থাৎ নূতন চণ্ডীমণ্ডপে পাঁচ তরফের দুর্গোৎসব হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রাঙ্গণটী একই রহিয়াছে। মহানবমী পূজার দিনে এখানে একটী কুপ্রথা প্রচলিত আছে। বংশবৃদ্ধি অনুসারে সকলেই এক একটী বলি লইয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। ছাগ, মেষ ও মহিষ বলিদান লইয়া উভয় তরফে বহু বলিদান হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাঙ্গণ একটী সঙ্কীর্ণ স্থান। উভয় তরফের যূপকাষ্ঠ পৃথক্। পূর্ব্বে এই বলিদান ব্যাপার লইয়া বহুবার উভয় পক্ষে বিবাদ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে স্থির হইয়াছে, প্রথমে আট তরফের একটী বলি হইলে পরে পাঁচ তরফের একটী বলি হইবে। তৃতীয় বলিটি আট তরফের ও চতুর্থ বলিটি পাঁচতরফের যূপকাষ্ঠে হইবে। এইরূপে বলিদান কার্য্য শেষ হইতে কখনও কখনও সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রবিধি অনুসারে যথাকালে পূজা হয় না। বলিসংখ্যা হ্রাস করিতে কেহই সম্মত না হওয়ায় এই প্রথা রহিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে এই বংশে কেহ কেহ উচ্চশিক্ষিত হইয়াছেন। মিত্রভূমের সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে তাঁহারা কুড়্‌মগ্রামে একটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন।

এই বংশে ঠাকুরদাস মজুমদার একজন সাধক হইয়াছিলেন। তিনি হঠযোগ সাধন করিয়া বহু অগ্রসর হইয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার্ জন উড্‌রফ্ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং তন্ত্রপ্রকাশকালে তাঁহার নিকট হইতে বহু উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের স্থাপিত রাঁচিস্থিত যোগমহাবিদ্যালয় পরিদর্শন জন্য তাঁহাকে বৎসরে ৩।৪ বার তথায় যাইতে হইত। বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যা মধ্যে তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। ১৯২৭ সালের মাঘ মাসে পাটনায় জনৈক বেহারী শিষ্যের বাড়ী গিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। ঐ রোগেই তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার গুরুদত্ত নাম অলকানন্দ স্বামী।
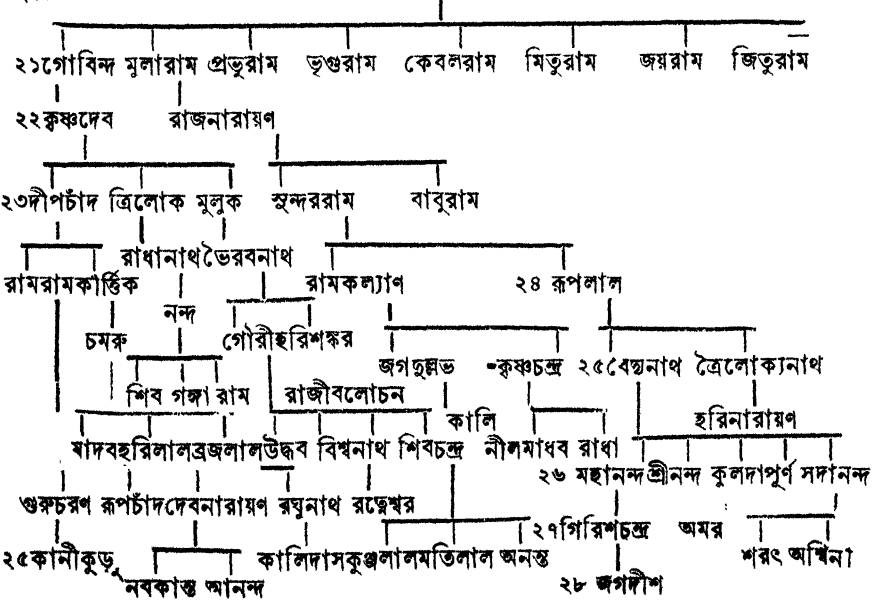
কুড়ুমগ্রাম মিত্রবংশ—পাঁচতরফ ও আটতরফ

কুড়ুমগ্রাম মিত্রবংশ ৫ তরফ
২২ রূপরাম
(২৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
রঘুনন্দন
লক্ষ্মীরাম
২৩ রাজীবলোচন
জনার্দ্দন
রমানাথ
কানুরাম
খোসাল
২৪ লোকনাথ
২৪ ভোলানাথ
জয়চন্দ্র
গোরাচাঁদ
রামহরি
২৫ রামপ্রসাদ
কৃপারাম
রামকান্ত
কৃষ্ণকিঙ্কর
২৫ কৃষ্ণদুলাল
রামদুলাল
পঞ্চানন
কমলাকান্ত
২৬ শিবশঙ্কর
রামমোহন
গৌরীশঙ্কর
ভবানীশঙ্কর
কালীশঙ্কর
পার্ব্বতীশঙ্কর
শ্যামশঙ্কর
২৬ বিশ্বেশ্বর
দুর্গাশঙ্কর
দুর্গাসুন্দর
২৭ বিশ্বনাথ
গয়ানাথ
কৈলাসনাথ
শ্রীনাথ
ভৈরবনাথ
(রুদ্রবাটী)
রামকিশোর
চাকরচন্দ্র
২৭ রত্নেশ্বর
পরমেশ্বর
ভুবনেশ্বর
হরিশ্চন্দ্র
(পাইকপাড়া)
মুকুন্দলাল
২৮ ভবেশচন্দ্র
বসন্ত
২৯ কৃষ্ণদাস
গোবিন্দদাস
বলরামদাস
২৮ দীনবন্ধু
মধুসূদন
২৮ আনন্দগোপাল
৩০ শঙ্কর
কিঙ্কর
কুলরাপ্রসাদ
২৯ যোগেন্দ্র
২৯ রজনীকান্ত
শৈলজাকান্ত
অনাথবন্ধু
হরিদাস
করুণাসিন্ধু
৩০ দ্বারিকানাথ
রমণীরঞ্জন
৩০ শরদিন্দু
কালীকুমার
৩১ সঞ্জয়
নগেন্দ্র
হরেন্দ্র

কুড়ুমগ্রাম মিত্রবংশ ৮ তরফ
২১ ভৃগুরাম
(২৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
২২ অকিঞ্চন
দীননাথ
২২ বেণীনাথ
শচীনন্দন
রক্ষাকর
ব ণেশ্বর
২৩ভগবতী
জগন্নাথ
ভুবন
হরেকৃষ্ণ
রামলোচন
রাধানাথ
গঙ্গাধর
চন্দ্র
রামরাম
সদানন্দ
ধনারাম
২৪ শ্রীকণ্ঠ
নীলকণ্ঠ
জন্মেজয়
রামতনু
রামদয়াল
জানকী
তারা
শ্যামাশঙ্কর
গতিনাথ
২৪ প্রাণনাথ
২৫রাম
ষষ্ঠীরাম
রামলাল
কৃষ্ণচন্দ্র
মধুসূদন
মুকুন্দলাল
কৃষ্ণমোহন
২৬ রামকিশোর
কৃষ্ণকিশোর
বিহারী
হরিশ
২৫লক্ষ্মীকান্ত
ভগবান
জ্ঞানেশ্বর
২৫উমেশচন্দ্র
তারেশচন্দ্র
২৫ গুরুব্রহ্ম
২৭ তারিণী
চণ্ডী
বিপন
কুলদা
তারক
২৬কৃষ্ণগোপাল
অশ্বিনাকুমার
বরদা
দিবাকর
মন্মথ
শশধর
গোপেশ্বর
বিভূতি
ভুজঙ্গ
গোপীকৃষ্ণ
২৮ভূপতি
ত্রিপুরেশ্বর
ত্রিদিবেশ্বর
২৭ জ্যোতির্ম্ময়
শ্যামা
ভগবতী
পার্ব্বতী
ফণী
বনয়
শঙ্কর
অজয়
জীবন
সন্তোষ
ব্রজেন্দ্র
অমলকান্তি
শান্তি
বোধন
২৮অরুণ
২৯সত্য
সুকুমার
হেমাংশু
বট
২৯অমিয়চাঁদ
গোরাচাঁদ
সরোজাক্ষ
কাশীশ্বর
রাধাবল্লভ
চন্দ্রশেখর
কেশব
২৫মহানন্দ
কৃষ্ণলাল
পূর্ণানন্দ
যোগানন্দ
২৬ঠাকুরদাস
বিষ্ণুপ্রসাদ
২৭ তারাকিঙ্কর
বীরেন্দ্র
জিতেন্দ্র
বামাপদ

মেহগ্রামের মিত্রবংশ

মেহগ্রামের মিত্রবংশ সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে ও মিত্রবংশীয়গণের প্রদত্ত বংশলতায় মূল পুরুষের সহিত মিল হয় না। কুলগ্রন্থানুসারে খেলান বা খেলারাম মিত্র মেহগ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয়দের প্রেরিত বংশলতায় দেখা যায় পুরুষোত্তম মিত্রের প্রথম পক্ষের চারি পুত্র কোচ, বট, বাচস্পতি ও নরসিংহ এবং শেষ পক্ষে গণপতি নামে এক পুত্র হয়; মেহগ্রামের মিত্রগণ তাঁহারই বংশধর। আবার কোন কোন কুলগ্রন্থে দেখা যাইতেছে কোচমিত্রের চারিটী পুত্র রঙ্গ, রুদ্র, খেলান ও মেলান। রঙ্গ মিত্রের বংশ বেলুন, কুড়ুমগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে, রুদ্র মিত্র হিলোড়ায় ও খেলান মিত্রের পুত্র গণপতি মিত্র মেহগ্রামে বাস করেন। মেলানের বংশ নাই। গণপতি খেলানের ভ্রাতা ও পুত্র দুই প্রকার কাগজ পাওয়া যাইতেছে। ঘনশ্যাম মিত্র লিখিয়াছেন,—

"ঈশানঃ কাঞ্চনাধীশো কুলপতিঃ গোমতীশ্বরঃ।
খেলানস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ গণসাধবশঙ্করাঃ॥"

এই কারিকা অনুসারে খেলানের তিন পুত্র হইতেছে। আবার অন্যত্র দেখা যায়—

"বেলুন মেহগ্রাম উত্তর সীমা চারি। উত্তরাস্থ নন্দী মহী তণে গণে বারি॥"
কাচনা গোমতী দুঘা দক্ষিণ কবাট। গোকর্ণ গহিত মূলে মিত্র মহী আট॥
মিত্র মহী একাদশ, নিরবস্থ কুলে কস।"

গণপতিকে খেলানের পুত্র ধরিয়াই উপস্থিত বংশলতা দেওয়া হইল। গণপতির পুত্র সম্বন্ধে দুই মত দেখা যায়। কেহ কেহ লিখিতেছেন, গণপতির চারিটি পুত্র—ত্রিপুরারি, শচীপতি, সভাপতি ও সর্ব্বেশ্বর। অন্য মতে সর্ব্বেশ্বর, সভাপতি, রুদ্রনাথ ও রামনাথ এই চারি পুত্র। ইহাদের বংশ রহিয়াছে। সুতরাং গণপতির ছয়টি পুত্র ছিল জানা যাইতেছে। যথা ত্রিপুরারি, শচীপতি, সভাপতি, সর্ব্বেশ্বর, রুদ্রনাথ ও রামনাথ। সভাপতি ও সর্ব্বেশ্বর মিত্রের বংশধরগণ মেহগ্রামে বাস করিতেছেন। সভাপতি মিত্র বাদশাহের যুদ্ধবিভাগে কর্ম্ম করিয়া হাজরা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর মিত্রের দুই পুত্র মধুসূদন ও বেদগর্ভ। কাহারও মতে বেদগর্ভ জ্যেষ্ঠ ও মধুসূদন কনিষ্ঠ। তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় দিল্লীতে কর্ম্ম করিয়া অবস্থার উন্নতি করিয়াছিলেন। মধুসূদনের বংশধরগণ রায় ও বেদগর্ভের বংশধরগণ চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। মধুসূদন চতুর্দ্দিকে একটী ক্ষুদ্রগড়বেষ্টিত বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। উক্ত বাড়ী এখনও গড়বাড়ী নামে খ্যাত। তথায় দুর্গোৎসব, শিবমন্দির ও শালগ্রাম সেবা রহিয়াছে। বেদগর্ভ চৌধুরী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। তাঁহার বাড়ীতেও দুর্গোৎসব, শিবমন্দির ও নারায়ণের নিত্যসেবা রহিয়াছে। বেদগর্ভ চৌধুরী মেহগ্রামে স্বজাতির একটি সভা করিয়াছিলেন, ঘটককারিকায় সভাবর্ণন-কালে লিখিত হইয়াছে—

"আদি সভা মেহগ্রাম বেলুন সভা পরে।"

অর্থাৎ বেলুনে আদি বাস হইলেও মেহগ্রামেই প্রথম সভা আহূত হইয়াছিল ও তৎপরে বেলুনে সভা হয়।

পুর্ব্বেই লিখিয়াছি বেদগর্ভ চৌধুরী দিল্লীর বাদশাহের দরবারে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন। তিনি বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। একদা তাঁহার একটী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে একটী হাতী ক্রয় করিবার জন্য দূর দেশে পাঠাইয়াছিলেন। যথাকালে উক্ত হাতী দান করিবার উদ্দেশ্য ছিল। কর্ম্মচারীটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেহগ্রামের বাটীতে পৌছিতে পারেন নাই। এদিকে কাল গত হয় দেখিয়া পথিমধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণকে হস্তীটী দান করিয়া মেহগ্রামের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে বেদগর্ভ তাঁহার মুখে যথাসময়ে হস্তিদানের সম্বাদ অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলেন ও উক্ত কর্ম্মচারীকে "বিশ্বাস" উপাধি সহ বহু অর্থ দান করেন এবং স্বীয় বাড়ীর নিকটে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া উক্ত কর্ম্মচারীর উপাধির স্মরণ জন্য তাহার নাম বিশ্বাস-পুষ্করিণী রাখা হয়। সোণারকুণ্ডের দাসবিশ্বাসগণ উক্ত কর্ম্মচারীর বংশধর।

বেদগর্ভের বংশে নবকান্ত চৌধুরী নশীপুরের রাজা উদমন্ত সিংহেরও তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার বংশধরের পক্ষে দেওয়ানের কর্ম্ম করিয়া অবস্থার উন্নতি করেন। তিনি অনেক জমিদারী ও পত্তনী সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র চৌধুরীর বিবাহ বালিয়ার রঘুনাথবংশে রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পিতামহের ভগিনীর সহিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার পত্নী মধুসূদনকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। মধুসূদন পরোপকারী ছিলেন। অন্নদান তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল। একবার দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে মধুসূদন স্বয়ং কয়েক সহস্র মুদ্রা ঋণ করিয়া দেশের বহু লোককে ঋণ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধুসূদন তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারিলেন না। এদিকে সুদ বৃদ্ধি হইয়া লক্ষাধিক টাকার জন্য মধুসূদনকে দায়ী হইতে হইল। অবশেষে ঋণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। মধুসূদন এই মনঃপীড়া সহ্য করিতে না পারিয়া সম্পত্তি নীলাম হইবার এক মাস পরে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে বহু কষ্টে দিনপাত করিতেছেন।

নবকান্তের পিতৃব্য লক্ষ্মীকান্তের পৌত্র ধনঞ্জয় নবকান্তের নিকট নশীপুররাজ এষ্টেটে কার্য্য করিতেন। পরে তিনি উন্নতি করিয়া অনেক জমিদারী ও পত্তনী সম্পত্তি করিয়াছিলেন এবং পৃথক্‌রূপে দেবসেবা ও দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ উক্ত সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট করিয়াছেন।

গেহগ্রামের মিত্রবংশ
১১ খেলারাম (খেলান) (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
১২ গণপতি
ত্রিপুরারি
শচীপতি
১৩সভাপতি হাজরা
১৩সর্ব্বেশ্বর
১৩ রুদ্রনাথ
রামনাথ
১৪ মধুসূদন রায়
১৪ বেদগর্ভ চৌধুরী
রঘুপতি
১৫ ভৃগুপতি
১৬ গঙ্গারাম
১৭ নারায়ণ
১৮ শ্যামরাম
১৯ চিরঞ্জীব
১৯ জীবনকৃষ্ণ
২০ লালচাঁদ
২০ ব্রজমোহন
২১ ধনসুখ
২১গুরুপ্রসাদ
২১লক্ষ্মীকান্ত
২১গোলকনাথ
২২ রামদুলাল
পঞ্চানন্দ
২২নবকান্ত
২২মদনগোপাল
ভজগোপাল
২৩ জগন্নাথ
রাজকুমার
২৩রামচন্দ্র
রসিকলাল
২৩ধনঞ্জয়
দামোদর
২৪মধুসূদন (দত্তক)
কুঞ্জবেহারী
বঙ্ক
দীনদয়াল
কিশোরী
ছকড়ি
২৫তারিণী
শশী
আশুতোষ
দেবেন্দ্র
পুত্র
মুকুন্দ
কুলদা
পুরুষোত্তম
নৃত্যগোপাল
২৫কৃষ্ণগোপাল
২৫ননীগোপাল
বসন্ত
শরৎ
২৬রামরঞ্জন
ভোলানাথ
শম্ভুনাথ
২৬বটগোবিন্দ

মেহগ্রামের মিত্রবংশ
১৩রুদ্রনাথ (৩৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ
অযোধ্যারাম রামনারায়ণ চিন্তামণি ১৪ প্রাণকৃষ্ণ
১৫বৈদ্যনাথ, সুত ১৬মহেন্দ্রনাথ, সুত ১৭বংশীবদন হরিনারায়ণ ঈশান
১৮ চক্রপাণি
১৯ নিধিরাম বিধিরাম ধৈর্য্যনারায়ণ
২০ নেহালচন্দ্র মনসারাম ২০কেবলরাম
২১ স্বরূপচন্দ্র
২১ গৌরকিশোর
২২ রূপচন্দ্র
২২ রাধাকান্ত
হরিনারায়ণ ২৩জটিলেশ্বর নি রণচন্দ্র ২৩ব্রজলাল বনওয়ারিলাল বেহারিলাল
২৪ ৪পুত্র
২৪ জ্যোতির্ম্ময় গোবিন্দলাল রমণী ভূতনাথ হিরণ্ময় ২৪প্রমথনাথ
১৩ সভাপতি হাজরা (৩৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
হরিহর হাজরা সনাতন
যজ্ঞেশ্বর প্রভুরাম
প্রীতলাল ভবানীশঙ্কর
কেবলকৃষ্ণ বিশ্বনাথ
রামলোচন অমর নারায়ণ
রামমোহন মাণিকলাল
কালীপ্রসাদ তারাপ্রসাদ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
নন্দলাল কৃষ্ণ কুঞ্জলাল বেহারী অনন্ত প্যারিলাল
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ব্রজলাল
রসরাজ মহেন্দ্রনাথ রাখাল অশ্বিনীকুমার
পুত্র
ললিত পঙ্কজাক্ষ

গুমতার মিত্রবংশ

রঙ্গ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুলপতি মিত্র বেলুন হইতে গিয়া গোমতী বা গুম্‌তা গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং কুণ্ডলা গ্রামের নিকটে অবস্থিত। এই বংশে সুবিখ্যাত কুলজ্ঞ ঘনশ্যাম মিত্রের জন্ম হয়। ঘনশ্যাম সম্বন্ধে প্রবাদ রহিয়াছে যে একদা মাড়কোলার চৌধুরীদের বাড়ীতে কোনও যজ্ঞ উপলক্ষে কান্দী, পাঁচথুপী প্রভৃতি স্থান হইতে বহু কুটুম্ব সমবেত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ঘনশ্যামও তথায় গিয়াছিলেন। কর্ম্মকর্ত্তা বিশ্বনাথ চৌধুরী ভোজনার্থ উপবিষ্ট স্বজাতিগণের প্রত্যেকের পরিচয় দিবার কালে দরিদ্র ঘনশ্যামকে দেখিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রিত কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিলেন ও অপমানিত করিয়া পংক্তি হইতে উঠাইয়া দিলেন। এই অপমান ঘনশ্যামের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি আর গৃহে ফিরিলেন না, বৈদ্যনাথধামে গিয়া এই অপমানের প্রতিকার কামনায় ধরণা দিলেন। স্বপ্নে তাঁহার প্রতি আদেশ হয় যে তিনি সমাজে যাহাকে বড় রাখিবেন তিনি বড় রহিবেন এবং যাঁহাকে ছোট করিবেন তিনি ছোট হইবেন।

নিজ পরিচয় সম্বন্ধে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন—

"মিত্রকুলে জন্ম আমার গোমতীতে বাস, ঘনশ্যাম নাম ধরি শ্রীকরণের দাস॥
নিরাবিলের প্রাণ আমি ভঙ্গ কুলের অরি। শ্রীকরণের করণ কারণ তুল্য মূল্য করি॥"

সর্ব্বপ্রথমে তিনি মাড়কোলার চৌধুরী বংশের সম্বন্ধে লিখিলেন —

"অমৃত পিয়াব বলি গেলাম মণ্ডলকুলার রস। কেনাই তাহাতে আছে কে তাহার সরস॥
কেনাই লইল ভেংজের মেলা, মোনাই লইল হাঁড়ি। মোটা পণে কুল খেচুড়ি মণ্ডকুলার বাড়ী॥
যখন মহাকুল-কুলোদ্ভব প্রবেশিলেন বাড়ী। তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় খড়্গাপুরে দাড়ী॥
যখন পূর্ণ দিতে পূর্ণ আইলা পূর্ণ হইল জয়। ঠাকুরসূত্র লেখকার ভাব কিছু নয়॥"

ইহার অর্থ এই যে বিশ্বনাথ চৌধুরী খড়গপুরের রাজবাড়ীতে কর্ম্ম করিতেন। উক্ত রাজবংশ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাঁহাদের লোকজন বিশ্বনাথের বাড়ী আসিতেন। মুসলমানের সংসর্গ জন্য 'ভঙ্গকুল' বলিয়া ঘনশ্যাম প্রথমেই বিশ্বনাথ চৌধুরীর প্রতি এই বাণ প্রয়োগ করিলেন। পরে তিনি অন্যান্য বংশের কারিকা লিখিয়াছিলেন এবং সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন। বালিয়া শ্রীধরবংশে বলভদ্র সিংহের ধারায় রাজারাম সিংহের সহিত ঘনশ্যামের একটি কন্যার বিবাহ হয়। রাজারামের পুত্র শুকদেব সিংহ মাতামহের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া বহু কারিকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থলে 'ঘনুর নাতি' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যশোর চাঁচড়ার রাজা ঘনশ্যামকে ও শুকদেবকে বিশেষ আদর করিতেন। যশোর জেলায় স্বীয় অধিকার মধ্যে শুকদেবকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী ভূসম্পত্তি দিয়া পুঁড়াপাড়া গ্রামে বাস করাইয়া-

ছিলেন। শুকদেবের বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-গণের সকল সমাজের বৃত্তিভোগী হইয়া বংশতালিকা লিখিতেছেন।
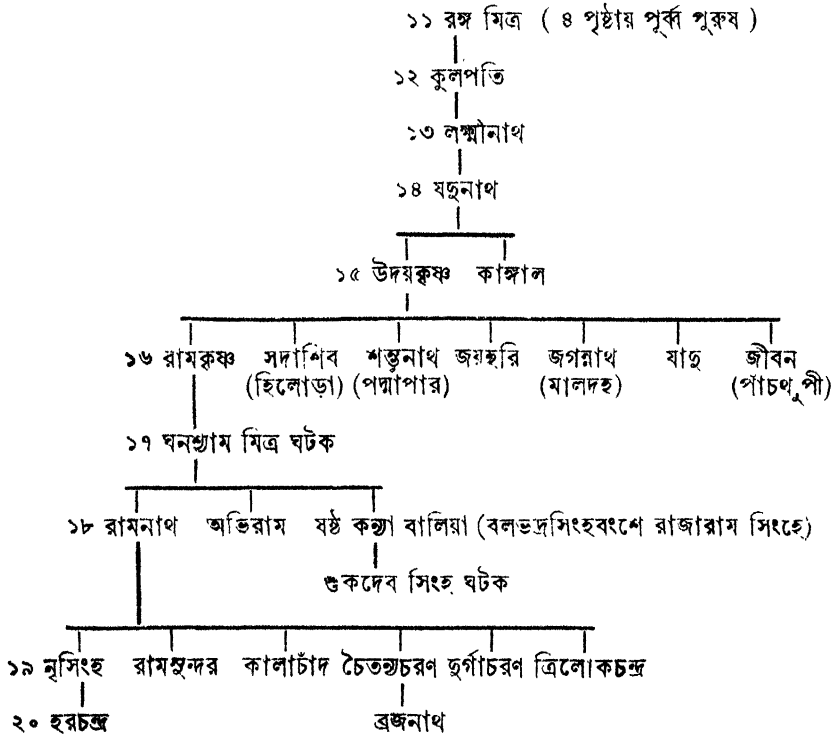
হিলোড়ার মিত্র-বংশ

রঙ্গ মিত্রের ভ্রাতা রুদ্র মিত্র প্রথমে হিলোড়ায় গমন করেন। তৎপরে রঙ্গ মিত্রের চতুর্থ পুত্র গদাধর ও ষষ্ঠপুত্র দ্বৈপায়ন তথায় গমন করেন। হিলোড়া এককালে উন্নতি-শীল স্থান ছিল। হিলোড়ার দক্ষিণে যাজিগ্রাম। হিলোড়ায় ৭০০ ও যাজিগ্রামে ১১০০ শত মোট ১৮০০ শত পুষ্করিণী প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে। এখনও শ্যামা-পূজার সময় এই দুই গ্রামে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। বিসর্জ্জন কালে শতাধিক

প্রতিমার একত্র সমাবেশ হয় ও তথায় মেলা হইয়া থাকে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজবন্ধনকালে হিলোড়া উক্ত সমাজের উত্তর সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। এই স্থানের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মিত্রবংশধরগণ তথায় বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার বারেন্দ্র কায়স্থগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিলে অন্যান্য সমাজের উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণ তাঁহাদিগকে সমাজমর্য্যাদায় হ্রাস করিলেন এবং ঘটকগণ তাঁহাদের কুলগ্রন্থে ত্রিকণ্টকী আকরগাঁই প্রভৃতি দোষের উল্লেখ করিলেন। তথাপি তাঁহারা সমাজের অনেক ভাল ভাল ঘরে আদান প্রদান করিয়াছিলেন ও বহু স্বজাতিকে তথায় বাস করাইয়াছিলেন। সম্প্রতি হিলোড়ার মিত্রগণ নানা স্থানে বাস করিতেছেন। অনেকে আদি স্থান বেলুন গ্রামের নামে স্বীয় পরিচয় দিয়া থাকেন, হিলোড়ার মিত্র বলেন না।

হিলোড়ার মিত্রবংশ
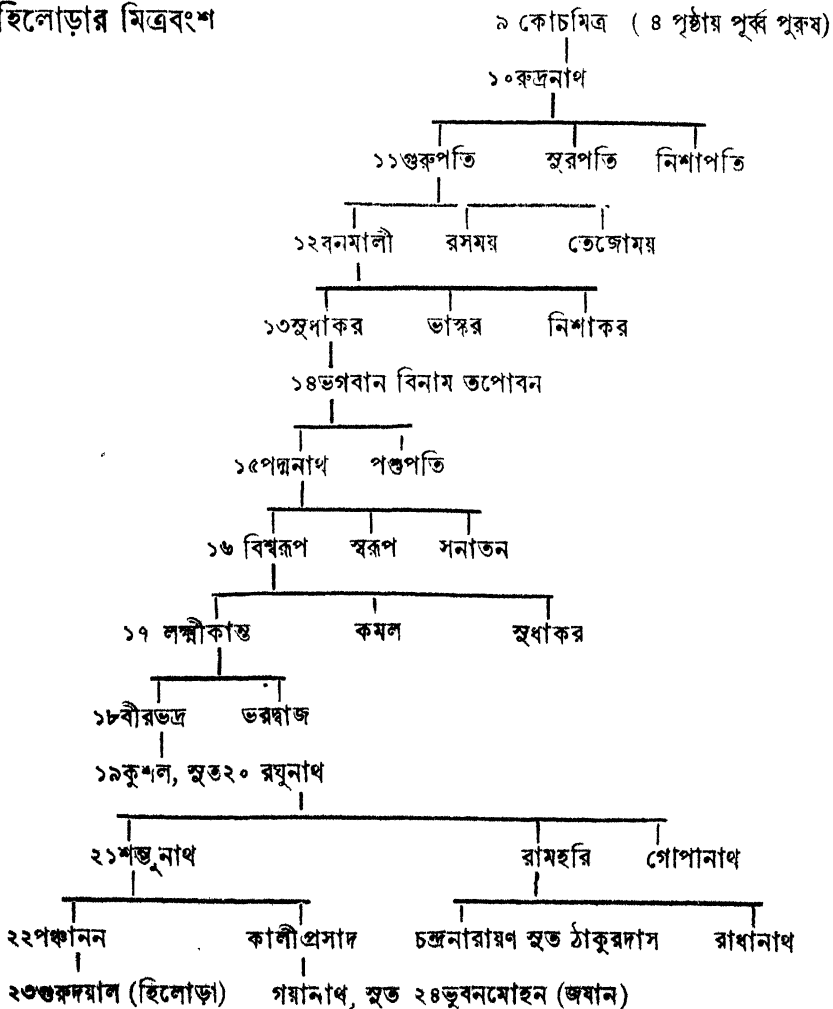
ঘটককারিকায় দেখা যায়, দ্বৈপায়ন মিত্রের বংশ নাই অথচ প্রাপ্ত বংশলতায় দ্বৈপায়নের বংশ দেখা যাইতেছে। রুদ্রমিত্র, গঙ্গাধর মিত্র, দ্বৈপায়ন মিত্র ও নারায়ণ মিত্র এই চারিজনের হিলোড়া গমনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অন্য সমাজে করণ করিয়াছিলেন।

'নন্দী জড়িত করণ পঞ্চ হিলোড়া নন্দন।
শূরে দেবে নন্দী জড়িত পঞ্চ করণ॥'

দ্বৈপায়ন সত্যই অপুত্রক ছিলেন কি উক্ত রূপ করণ হেতু তাঁহার বংশলতা না লিখিয়া ঘটকগণ তাঁহাকে অপুত্রক লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। প্রাপ্ত দ্বৈপায়ন মিত্রবংশ রুদ্র মিত্রের বংশ বা অপর কাহারও বংশ হওয়া অসম্ভব নহে। বংশলতা যেরূপ পাওয়া গিয়াছে সেই রূপেই দেওয়া হইল।
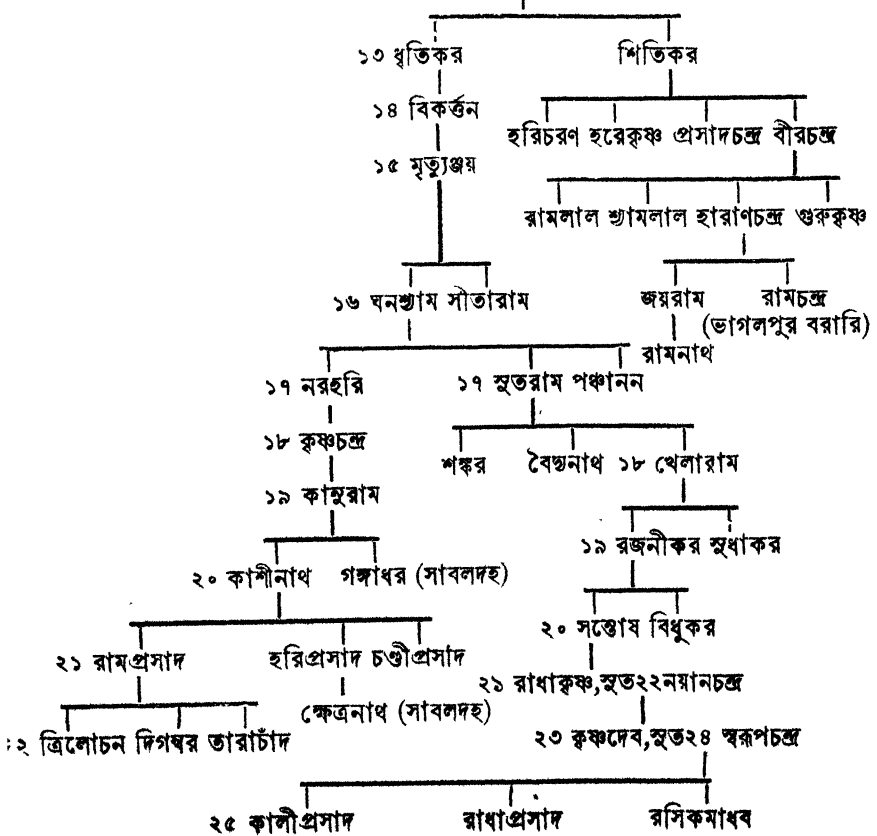
দ্বিতীয় অধ্যায়

বটমিত্রবংশ—রূপচন্দ্র ও শুকদেবের ধারা

(নন্দনপুর ও বড়রার মিত্রবংশ)

বটমিত্রের পরিচয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বটমিত্রের বংশ চৌদ্দখানি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বড়রা একটী। ময়নাডালের মিত্রঠাকুরদিগের বিবরণ মধ্যে শুকদেব মিত্রের ব্যাধি আরোগ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত শুকদেব মিত্র বড়রা গ্রামে বাস করিতেন ও রাজনগরের রাজার অধীনে কার্য্য করিতেন। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে যান, তথায় মহাপ্রভুর কৃপায় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। পুনরায় উপার্জ্জন করিয়া প্রথমে যাহা পাইবেন তাহা মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজনগরে ফিরিয়া যান ও তথায় গিয়া সৈন্যদের সুবাদারের হিসাব নিকাশ করিয়া ৭০০৲ টাকা প্রাপ্ত হন। উক্ত টাকায় ময়নাডালে মহাপ্রভুর মন্দির নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ তাহা সুসম্পন্ন হয়। উক্ত মন্দির প্রথমবারে গুরুপ্রসাদ মিত্র একক, দ্বিতীয়বারে শ্যামসুন্দর মিত্র সকল শরীকের সাহায্যে, ও তৃতীয়বারে বনওয়ারিলাল মিত্র শরীকগণ সহ সন ১৩১৯ সালে মেরামৎ করাইয়াছিলেন। (নিম্নে বংশলতা দেওয়া হইল)

নন্দনপুর ও বড়রার মিত্রবংশ মগধদেবের সন্তান

৯ বটমিত্র (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

১০ টিকায়ৎ মগধদেব মহাদেব

১১ কিনুমিত্র, সুত ১২ পরাশর, সুত ১৩ ভগবান্

১৪ রামকৃষ্ণ জয়কৃষ্ণ

১৫ রূপচন্দ্র মদনমোহন ১৫ শুকদেব ১৫ নীলাম্বর পুত্র পুত্র

১৬ সুন্দর ১৬ পঞ্চানন শঙ্কর

১৭ রুদ্রনাথ কৃষ্ণনাথ ১৭ ভাগবত

গঙ্গানারায়ণ গোবিন্দ ১৮ গণেশ গুণাকর গুরুদত্ত দিননাথ ১৮ বেণীমাধব

গোপানাথ গোপানাথ ১৯ ঈশ্বর রাজচন্দ্র

১৯ ব্রজনাথ ভোলনাথ মায়নাথ

(দত্তক, নন্দনপুর) ২০ শিবচন্দ্র

২০ ধনপতি রত্নপতি কমলপতি গোরাচাঁদ

(শন্তনিয়া পূর্ণিয়া) রাখালচন্দ্র মণীন্দ্র গোকুল শশী

২১ হরিশচন্দ্র কেবলকৃষ্ণ হরবল্লভ ধর্ম্মনারায়ণ
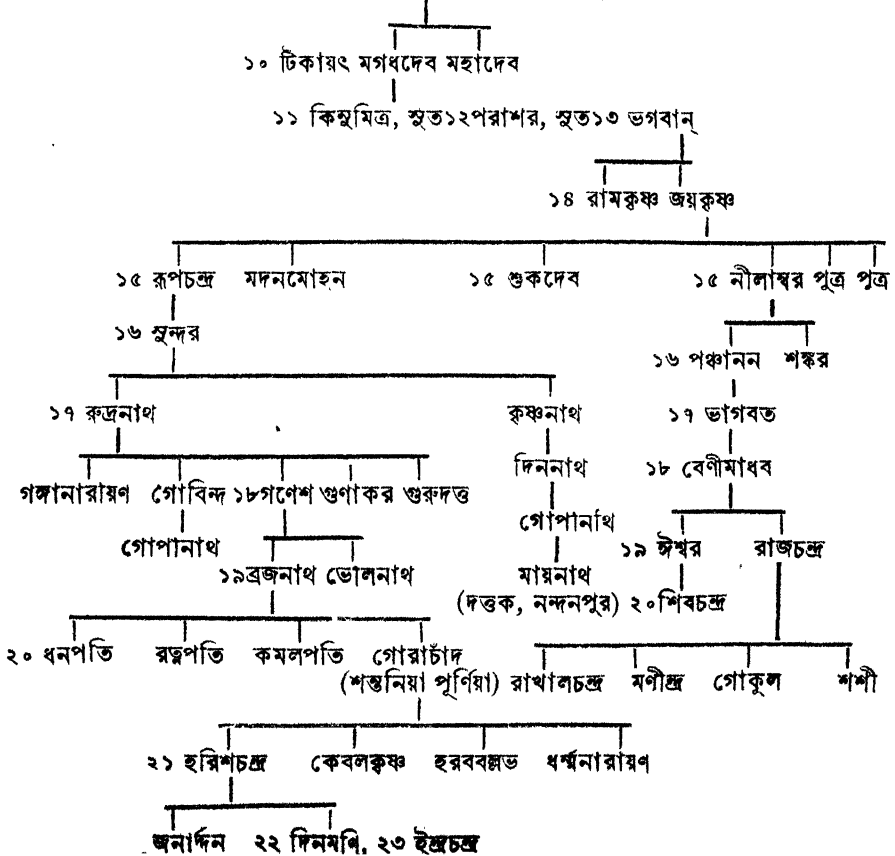
জনার্দ্দন ২২ দিনমণি, ২৩ ইন্দ্রচন্দ্র
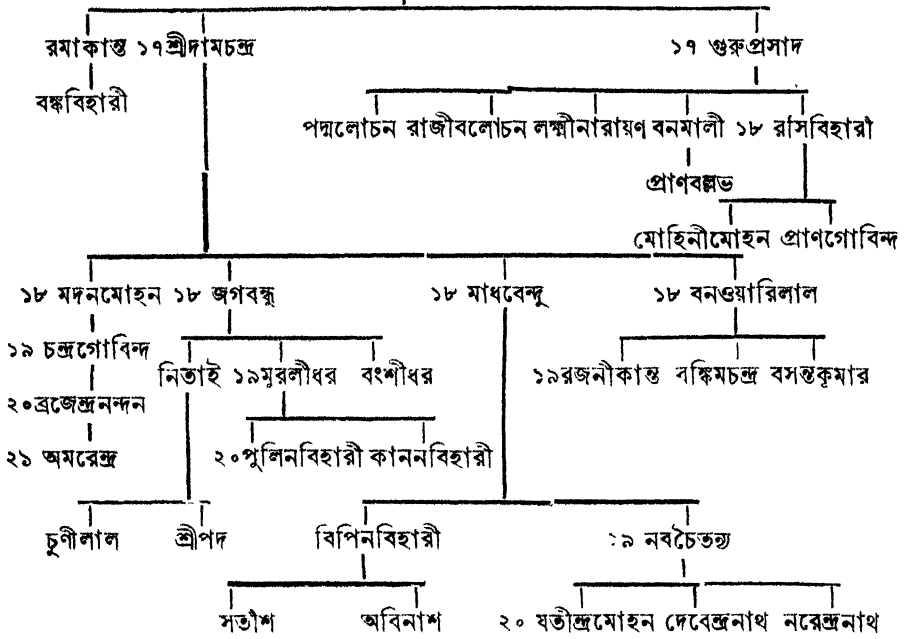
ভালকুঠীর মিত্রবংশ

বটমিত্রের বংশধরগণ যে সকল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ভালকুঠী একখানি। উক্ত গ্রামে তাঁহারা চামুণ্ডা দেবীর পূজা স্থাপন করেন। পরে দয়ারাম মিত্র ময়ূরাক্ষীনদীর তটে মানসারা গ্রাম জমিদারী অর্জ্জন করিয়া তথায় বাস করেন। তথায় সিংহবাহিনী ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। জগদ্দুর্ল্লভ মিত্রের সময়ে জমিদারী নষ্ট হইলেও উক্ত দেবসেবাদি এখনও চলিতেছে। পূর্ণচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র চাকরি উপলক্ষে মালদহ জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জে বাস করেন। (পর পৃষ্ঠায়বংশলতা দেওয়া হইল)

ভালকুটীর মিত্রবংশ
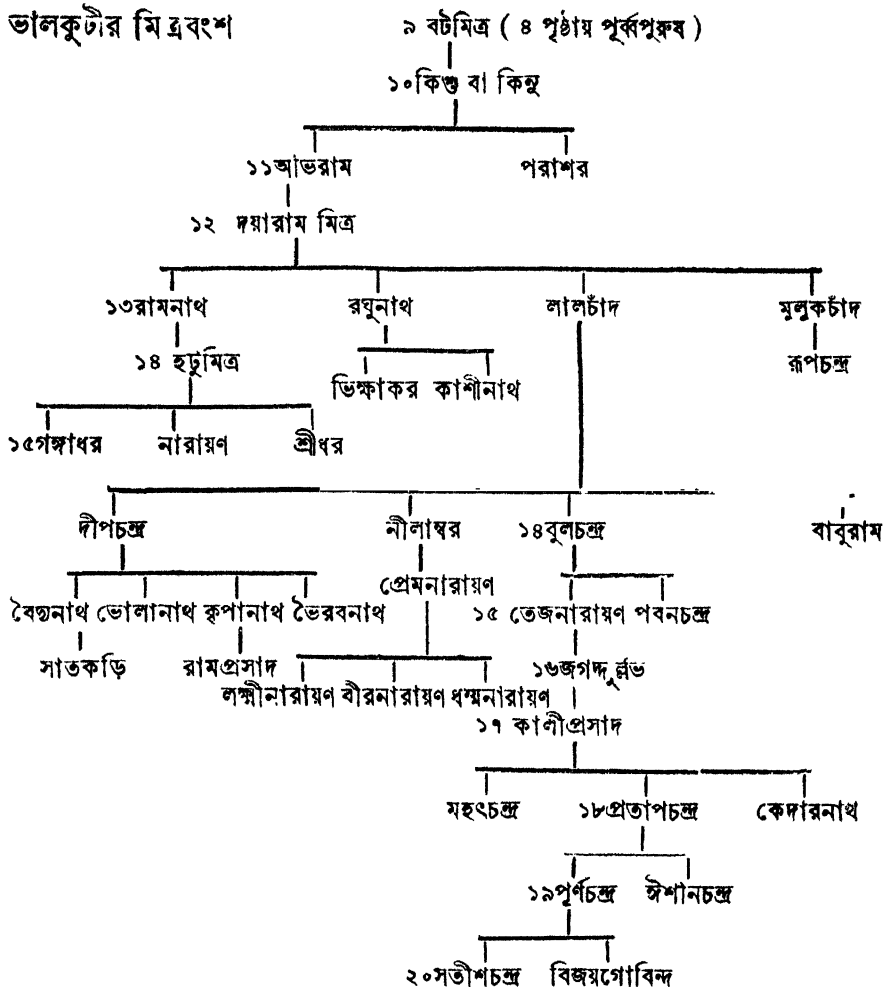
বটমিত্রবংশ—মহাদেবের ধারা

৯ বটমিত্র (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

১০ মহাদেব

বিভূতি   শিবানন্দ   জয়ানন্দ ১১উদয়ানন্দ সুত ১২ পরমানন্দ সুত ১৩ কানাইলাল সুত ১৪দানকর সুত ১৫গণপতি সুত ১৬নারায়ণ সুত ১৭হরিদাস সুত ১৮বলরাম সুত ১৯ চৈতন্যচরণ সুত ২০ রামকৃষ্ণ (বড়রা) সুত ২১ কেশবলাল সুত ২২ ভজকৃষ্ণ

২৩ জনার্দ্দন   শ্রীহরি   নন্দলাল

২৪ যুগলকিশোর

তৃতীয় অধ্যায়

খাজুরডিহির মিত্রবংশ (নরসিংহপুত্র শিবরামের ধারা)
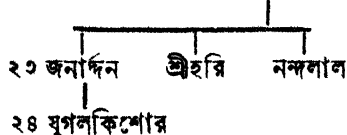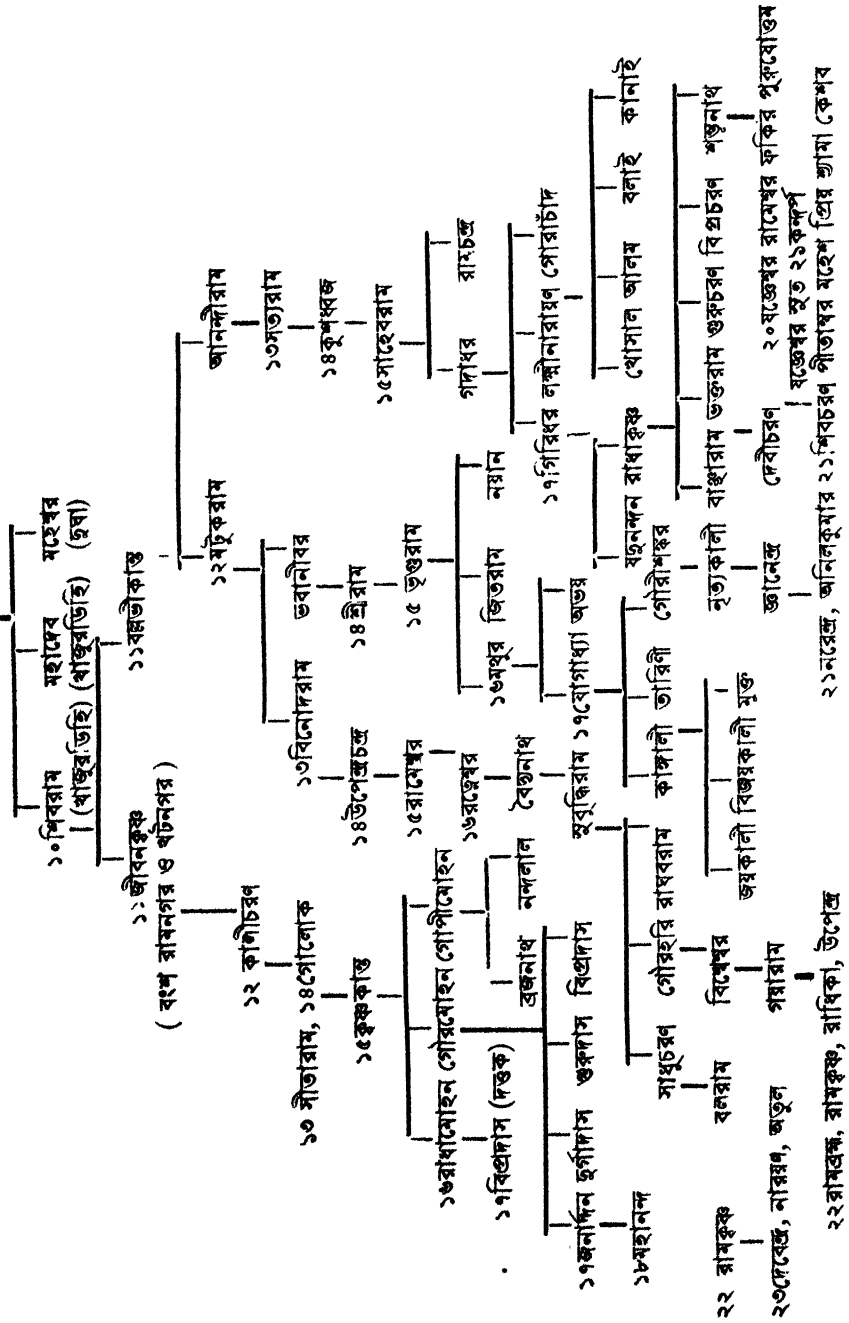
বঙ্গাধিকারিগণের বিবরণ

(খাজুরডিহির মিত্রবংশ)

সুদর্শন মিত্রবংশে পুরুষোত্তম মিত্রের চারি পুত্র মধ্যে নরসিংহ মিত্র কুড়ুমগ্রামে বাস করেন। নরসিংহের পুত্রগণ মধ্যে শিবরাম ও মহাদেব খাজুরডিহি গ্রামে ও মহেশ্বর মিত্র তুঘা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। শিবরামের বংশলতা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। মহাদেব মিত্রবংশে অমোঘ মিত্রের চারি পুত্র ভগবান্, বঙ্গবিনোদ, গঙ্গানারায়ণ ও রঘুনাথ। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-লেক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ভগবান্ রায়কেই বঙ্গের প্রথম কানুনগোই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারী বংশীয় কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণী হইতে জানা যায়, ভগবান্ প্রথমতঃ নদীয়ার রাজধানীতে নায়েবের পদে কর্ম্ম করিতেন। বঙ্গবিনোদই প্রথম কানুনগো হইয়াছিলেন এবং পরে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কানুনগোই পদে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করেন। বঙ্গবিনোদের এই কানুনগোই পদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কুমার প্রতাপনারায়ণ একটী আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন। বঙ্গবিনোদ যখন অল্প বয়স্ক তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ রায় তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। বাল্যকালে বঙ্গবিনোদ অত্যন্ত চঞ্চল, সাহসী ও দুর্দান্ত ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগ জন্য ভগবান্ একদিন বঙ্গবিনোদকে বিশেষরূপ তিরস্কার করিলেন। বঙ্গবিনোদ এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া রজনীযোগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাতীরে একজন সন্ন্যাসীর সহিত তাহার দেখা হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাকে জ্বালামুখী তীর্থে লইয়া যান ও তথায় গিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধনা করিতে করিতে একদিন দেবীর স্বপ্নাদেশ হইল, 'তুমি সংসার-সুখলিপ্সায় গৃহত্যাগ করিয়াছ, এজন্য প্রথমে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরে মুক্তিলাভ করিবে।' বঙ্গবিনোদ দেবীর নির্দ্দেশানুসারে দিল্লী গিয়া বাদশাহের সাক্ষাৎকার লাভ করেন ও অলৌকিক উপায়ে মোহর জোগাড় করিয়া বাদশাহকে তাহা নজর দিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার প্রধান কানুনগোইর পদ প্রাপ্ত হন। এইরূপ পদপ্রাপ্তির পর তিনি জ্বালামুখীতে স্বীয় গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গুরু তাঁহাকে একটী পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রদান করিলেন ও স্বীয় বাসস্থানের নিকট উক্ত মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্চ্চনা করিতে আদেশ দিলেন। বঙ্গবিনোদ উক্ত দেবীমূর্ত্তি সহ জেলা মালদহের অন্তঃপাতী থানা শিবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী পুখুরিয়া গ্রামে আসিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন এবং দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কালীসাগর নামে এক সরোবর খনন করাইলেন। পরে তথায় সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি ও উক্ত দেবীমূর্ত্তি জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। সম্প্রতি সেবাইৎগণ উক্ত সিদ্ধেশ্বরী দেবী বিগ্রহটিকে তাঁহাদের কাশীধামের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন।

বঙ্গবিনোদের বাসভূমি প্রায় ৪০/ চল্লিশ বিঘা, চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। তাহার ভগ্ন ভিত্তি ও পাতালঘর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কালীমন্দিরটি বর্ত্তমান আছে এবং তথায় কালীমাতার পূজা হইয়া থাকে।

বঙ্গবিনোদের এই পদপ্রাপ্তির পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয়ে একত্র রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। সেরেস্তার পূর্ব্ব আদায়ী কাগজে যে আয় ছিল তদপেক্ষা প্রায় দুই লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গবিনোদকে "রায়" ও "বঙ্গাধিকারী মহাশয়" উপাধি পুরুষানুক্রমে ব্যবহার জন্য সনন্দ প্রদান করিলেন।

বঙ্গবিনোদের নামে কথিত বিনোদনগর (কড়ুই) ও অরঙ্গাবাদ বঙ্গাধিকারীর জমিদারী। খাজুরডিহি ও দুর্গী বা দুঘা গ্রাম অরঙ্গাবাদ মধ্যে অবস্থিত।

বঙ্গবিনোদ পরলোক গমন করিলে হরিনারায়ণ রায় বাদশাহ অরঙ্গজেবের প্রদত্ত ১০৯০ হিজরি (১৬৭৯ খৃঃ অঃ) সালের সনন্দ অনুসারে কানুনগোই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সনন্দে হরিনারায়ণ বঙ্গবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। এদিকে বংশতালিকায় হরিনারায়ণকে বঙ্গবিনোদের পুত্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। আবার কোনও কোনও কাগজে বঙ্গবিনোদকে ভগবান্ রায়ের পুত্র বলা হইয়াছে। সনন্দের কথাই ইতিহাসগ্রাহ্য। সুতরাং হরিনারায়ণকে বঙ্গবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ বঙ্গবিনোদ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিনারায়ণকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ অরঙ্গজেব হরিনারায়ণকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার কানুনগোই পদের অর্দ্ধেক কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। সনন্দের পৃষ্ঠে লিখিত কৈফিয়তে জানা যায়, বঙ্গবিনোদের মৃত্যুর পর রঘুনাথ নামে একব্যক্তি ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে কানুনগোই ফার্ম্মান্ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী ভট্টবাটীর কানুনগোই-বংশের আদিপুরুষ দৈবকীনন্দনকে অর্দ্ধাংশ কানুনগোই ফর্ম্মান দিবার হুকুম হয়। রামজীবনের এত্তালায় প্রকাশ পায় যে দৈবকীনন্দন অর্দ্ধাংশ কানুনগোই পদ দখল পান নাই। এজন্য রামজীবনকে তাহার উত্তরাধিকারী কিনা জানিয়া উক্ত অর্দ্ধাংশ কানুনগোই পদ দিবার আদেশ হয়। শেষে সুবাদারের মধ্যস্থতায় তিনি ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারীকে ॥৵০ ও ভট্টবাটীর বঙ্গাধিকারীকে ।৵০ আনা কানুনগোই পদ বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

একদা হরিনারায়ণ স্বীয় পৈতৃক বাসভূমি খাজুরডিহি গ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর তথায় একটি কীর্ত্তি রাখিবার ইচ্ছা হইলে হরিনারায়ণ বলিলেন যে তাঁহার পত্নী যতদূর পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে পারিবেন ততদূর বিস্তীর্ণ একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিবেন। রাণী উক্ত বাক্যানুসারে যতদূর ভ্রমণ করিলেন হরিনারায়ণ তথায় একটি জলাশয় খনন করাইলেন ও স্বীয় নামানুসারে তাহার নাম 'হরি-সাগর' রাখিলেন। কথিত আছে, উক্ত দীর্ঘিকা-প্রতিষ্ঠাকালে ব্রাহ্মণভোজনে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়

হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় উক্ত পুষ্করিণীটি নিষ্কর হইলেও উক্ত গ্রামের পত্তনীদার উত্তরপাড়া-নিবাসী ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলপূর্ব্বক তাহা মালের সামিল করিয়া লইয়া বগচরের প্রায় ৩০০/ বিঘা জমি প্রজা বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং পুষ্করিণীটি ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কালে হরিনারায়ণের কীর্ত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

হরিনারায়ণের অপর কীর্ত্তি ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর সেবার নিমিত্ত লাখরাজ মহাল নন্দনপুর অর্পণ। উক্ত মহালে কয়েকটী মৌজায় বার্ষিক আয় ১৬০০৲ টাকা আদায়ের ভার তদীয় গুরুদেব মানকরনিবাসী শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গুরুদিগের প্রণামী জন্য বার্ষিক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি মানকর প্রভৃতি মৌজায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

হরিনারায়ণ রায়ের দুইটি কন্যা ছিল। প্রথমা কন্যার বিবাহ পাঁচথুপীর পুরাতনবাড়ীর হাজরাবংশে পার্ব্বতীচরণ রায়ের সহিত ও দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ রসড়া জয়দেববংশে দুর্গানারায়ণ রায়ের সহিত হইয়াছিল। খাজুরডিহির মিত্রগণ সামাজিক মর্য্যাদায় সমকক্ষ ছিলেন না, এজন্য হরিনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে জ্ঞাতিগণ পার্ব্বতীচরণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। হরিনারায়ণ তাহা জানিতে পারিয়া পাঁচথুপীবাসী কায়স্থগণকে পার্ব্বতীচরণের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন ও সকলকে যথোপযুক্ত অর্থাদি দিয়া সম্মান করিলেন এবং পাঁচথুপীর পার্শ্বস্থ মনিয়াডিহি মহাল পার্ব্বতীচরণকে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ও নবাব সরকারে পার্ব্বতীচরণকে একটী উচ্চপদে কর্ম্ম করিয়া দিলেন। তাহার পর জ্ঞাতিগণ পার্ব্বতীচরণকে সম্মান করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানকালে শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় উক্ত পার্ব্বতীচরণের বংশধর। হরিনারায়ণের দ্বিতীয় জামাতা দুর্গানারায়ণ রায় বহু সম্পত্তি এবং নবাব সরকারে উচ্চ পদে কর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। কোনও মতে পার্ব্বতীচরণ দর্পনারায়ণের জামাতা।

হরিনারায়ণের সময়ে ঢাকায় বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। তথায় বাড়ী নির্ম্মাণ জন্য বাদশাহের ফর্ম্মান অনুসারে দুইশত বিঘা লাখরাজ জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত মৌজার নাম হইয়াছিল গের্দ্দা হাবেলী। তথায় বাহিরবাটী, অন্দরবাটী, কাছারীবাটী, ঠাকুরবাটী ইত্যাদি লইয়া প্রায় ৪০/ চল্লিশ বিঘা জমিতে বাসবাটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এখনও তথায় পুরাতন রায়বাজারবাটী নামে ভগ্ন অট্টালিকা, গোবিন্দরায়ের মন্দির, পাতালঘরে নামিবার সিঁড়ি, পাতালঘর প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। কালীমন্দিরটী ভাল অবস্থায় আছে। গোবিন্দরায় বিগ্রহ ডাহাপাড়ার বাটীতে বর্ত্তমান আছেন। ঢাকার বাহিরবাটীতে এখন কতকগুলি প্রজা বাস করে। ঢাকার বাটীর কতক অংশ বেদখল হইয়াছে। বাকী অংশ দেবত্তররূপে এখনও বঙ্গাধিকারী বংশীয়দের দখলে রহিয়াছে।

হরিনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন, এজন্য দর্পনারায়ণ রায়কে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর সম্রাট অরঙ্গজেব তাঁহাকে পিতৃপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

দর্পনারায়ণ একজন সুচতুর ও কর্ম্মদক্ষ লোক ছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ তখন বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান এবং পরে সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই মুর্শিদকুলিখাঁ ও দর্পনারায়ণ রায়ের নাম চিরস্মরণীয় রহিয়াছে ও রহিবে। উভয়েই প্রতিভাসম্পন্ন ও সুচতুর ছিলেন। অপর দিকে বহুদর্শী বৃদ্ধ সম্রাট্ অরঙ্গজেব এই দুই জনের কার্য্যেই সন্তুষ্ট ছিলেন। দর্পনারায়ণ এই সময় 'মহারাজা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

নানা কারণে বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ঢাকা হইতে মুক্সুদাবাদে আনীত হইল এবং নবাবের নামানুসারে মুক্সুদাবাদ মুর্শিদাবাদে পরিণত হইল। প্রধান কানুনগোর সেরেস্তাও ঐ সঙ্গে মুর্শিদাবাদে আসিল। প্রথম কানুনগো দর্পনারায়ণ রায় গঙ্গার পশ্চিম পারে ডাহাপাড়ায় ও দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণ ভট্টবাটীতে স্ব স্ব বাসভূমি ও কার্য্যালয় নির্ম্মাণ করিলেন। দর্পনারায়ণ ডাহাপাড়ায় দুইশত পাঁচবিঘা ভূমির উপর প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ় বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। এই বাড়ীটিও গের্দা হাবেলী নামে খ্যাত। এই বাটীতে ৺ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ, ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম ও ৺গোবিন্দজীর মন্দির ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। বহির্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। পরিখা খনন করায় বাড়ীটি গড়বাড়ী নামে খ্যাত রহিয়াছে। ডাহাপাড়া হইতে কিছু উত্তরপশ্চিমে ৺কিরীটেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ ও তথায় ১০৮টি শিবমন্দির ও ভৈরবের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও কালীসাগর নামক বৃহৎ জলাশয় দর্পনারায়ণের কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত 'বড়সাঁকো' নামে একটী বৃহৎ সেতু একরাত্রি মধ্যে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত কীর্ত্তি স্থাপনে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে আসিবার প্রায় এক বৎসর পরে বাদশাহের নিকট দাখিল করিবার জন্য নিকাশী কাগজ প্রস্তুত করিয়া মুর্শিদকুলিখাঁ কানুনগোদ্বয়কে তাহা সহী করিতে অনুরোধ করেন। বাদশাহের আদেশানুসারে সদর রাজস্বের উপর শতকরা আট আনা কানুনগোদিগের রসুম ধার্য্য ছিল। রসুমের দশ আনা দর্পনারায়ণের ও ছয় আনা জয়নারায়ণের প্রাপ্য ছিল। অরঙ্গজেবের দরবারে এই দস্তুরির ত্রুটি হইবার উপায় ছিল না। দর্পনারায়ণ রসুম বাবদ প্রাপ্য তিন লক্ষ টাকা না পাইলে নিকাশী কাগজে সহী করিতে সম্মত হইলেন না। মুর্শিদকুলিখাঁ বলিলেন, এখন টাকা নাই, বাদশাহের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া রসুমের একলক্ষ টাকা দিব। কিন্তু দর্পনারায়ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণ কোনরূপ প্রতিশ্রুতি না করাইয়া নিকাশী কাগজে দস্তখৎ করিলেন। সুচতুর মুর্শিদকুলিখাঁ তখন দর্পনারায়ণ রায়ের দেওয়ান বা নায়েব কানুনগো নাটোর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রঘুনন্দনকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া নিকাশী কাগজে কানুনগোর মোহর দিয়া লইলেন।

দর্পনারায়ণ নিকাশী কাগজ দস্তখৎ করিতে অসম্মত হওয়ায় মুর্শিদকুলিখাঁ তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। অপর দিকে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া এক কোটি ত্রিশ লক্ষ হইতে এক কোটি পঞ্চাশ

লক্ষ আদায় করিলেন। সম্রাট এজন্য দর্পনারায়ণের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মুর্শিদ-কুলিখাঁ পূর্ব্ব হইতেই দর্পনারায়ণের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহস বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্য কূটজাল বিস্তার করিতে লাগলেন। বাদশাহনিয়োজিত উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী সুবাদারের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। কোনরূপ দোষ প্রদর্শন না করিয়া এরূপ ব্যক্তিকে বিনাশ করা নিরাপদ নহে জানিয়া মুর্শিদকুলিখাঁ এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রাজস্ব সম্বন্ধে দোষ দেখানই উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। খাল্সা দেওয়ান ভূপতি রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গোলাপ রায় রাজস্ব কার্য্যে অনভিজ্ঞ বলিয়া মুর্শিদকুলিখাঁ দর্পনারায়ণকে উক্ত পদ গ্রহণ নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। দর্পনারায়ণ নিঃসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ করিলেন ও আয় বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। এই সময় নানকর বন্ধ হওয়ায় কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলিখাঁ এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া তহবিল তছরূপ অছিলায় দর্পনারায়ণকে কারারুদ্ধ করিলেন। তথায় আহার না দেওয়ায় দর্পনারায়ণের মৃত্যু ঘটে। রিয়াজ-উস্-সালাতিন বলেন, সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সুখ হইতে বঞ্চিত করায় ক্রমশঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণ কানুনগো পদ ও রসুমের দশ আনা অংশ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। হিজরি সন ১১৩৭ অব্দে ইং ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ শার রাজত্বের সপ্তমবর্ষে শিবনারায়ণ কানুনগো সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবনারায়ণের কীর্ত্তি —

১ম—তাঁহার ধাত্রীর নামে চম্পাসাগর পুষ্করিণী ও চম্পা-বাগান।

২য়—পদ্মপুষ্করিণী নামে বৃহৎ জলাশয়।

৩য়—দীপান্বিতা অমাবস্যা উপলক্ষে তাঁহার অধিকারভুক্ত পরগণে সেরসাবাদ (জেলা মালদহ), পরগণে রুকুনপুর (জেলা মুর্শিদাবাদ); পরগণে ভুলুয়া ও পরগণে সন্দ্বীপ (জেলা নোয়াখালি) এবং ঢাকা পাবনা প্রভৃতি জেলায় প্রত্যেক মৌজায় কালী প্রতিমা করিয়া পূজার ব্যবস্থা ও উক্ত পূজা নির্ব্বাহ জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি অর্পণ।

শিবনারায়ণের পরে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের সময় পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কানুনগো বা বঙ্গাধিকারী পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি একবার তিনি তাঁহার অধিকৃত মহাল সমূহের প্রত্যেক মৌজায় ১০টি করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। এইরূপে একদিনে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ ভোজন যাহাতে প্রতি বৎসর নির্ব্বাহ হয় তজ্জন্য মোট বার্ষিক একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ডাহাপাড়ার রাজবাড়ীতে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি বহুদিন রক্ষিত ছিল। তৎকালে আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধকালে লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীতে ছিলেন। উক্ত

যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে নবাবের সহিত ইংরাজের যে সন্ধিপত্র হয় সেই সময়ে প্রথম কানুনগো লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ও দ্বিতীয় কানুনগো মহেন্দ্রনারায়ণ রায় উভয়েই সন্ধিপত্রের শিরোভাগে সহী করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণই বঙ্গাধিকারী বংশের শেষ কানুনগো। কান্দীর ইতিহাস-বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের সেরেস্তায় কার্য্য শিক্ষা করিতেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং সেরেস্তার সকল প্রকার কার্য্য উত্তমরূপে শিখাইয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের শরীর রুগ্ন হইলে স্বীয় নাবালক পুত্র সূর্য্যনারায়ণকে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হস্তে সমর্পণ করিয়া একটি উইল করিয়া তাঁহাকে নাবালকের ও যাবতীয় সম্পত্তির অলি বা ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে বাঙ্গলা-বেহার-উড়িষ্যার জমি জমা সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র বঙ্গাধিকারী কানুনগো মহাশয়দের ঘরে ছিল গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাহা বাহির করিয়া লইয়া যান। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সুযোগে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। গঙ্গাগোবিন্দ পূর্ব্বোক্ত কাগজের সাহায্যে প্রথমে দশশালা বন্দোবস্ত করেন, পরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত বন্দোবস্ত কালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বঙ্গাধিকারী বংশের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছিলেন। বার্ষিক আঠার লক্ষ টাকার অধিক আয়ের সম্পত্তি মধ্যে ভাল ভাল সম্পত্তিগুলি গঙ্গাগোবিন্দ নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, বাকী সম্পত্তি মধ্যে অধিকাংশই অর্থলোভে অন্যান্য জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ সাবালক হইয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়া এক দরখাস্ত দাখিল করিলে গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে জানাইলেন, "দেওয়ান গঙ্গাবিন্দ সিংহ দ্বারা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার আয় ব্যয়ের অনেক কাগজপত্র প্রাপ্ত হওয়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং তাঁহাকে বঙ্গাধিকারী কানুনগো বংশীয় বিবেচনা করিয়া কতক সম্পত্তি তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার পৈতৃক সম্পত্তি মধ্যে যে সকল সম্পত্তি এখনও বন্দোবস্ত হয় নাই তাহার সদর মালগুজারি কিছু কম করিয়া আপনার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে। কানুনগো সেরেস্তার অন্য যে সকল কাগজপত্র আপনার নিকট আছে তাহা দাখিল করিবেন।" এইরূপে সূর্য্যনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়দিগের অবশিষ্ট সমুদয় কাগজপত্র গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়া কিছু সম্পত্তি তাঁহাকে কমমূল্যে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কানুনগো পদ উঠিয়া যাওয়ায় সূর্য্যনারায়ণের জন্য পুরুষানুক্রমে চৌদ্দশত টাকা মাসহারা মঞ্জুর করিলেন। সূর্য্যনারায়ণের মৃত্যুর সময় তৎপুত্র চন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালক ছিলেন। তিনি উক্ত সম্পত্তির ও মাসহারার উত্তরাধিকারী হইলেন। এই সময়ে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। চন্দ্রনারায়ণের জনৈক জ্ঞাতি ভ্রাতা বক্রনাথ রায় পূর্ব্ব হইতে এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং সাধ্যমত এষ্টেটের অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনারায়ণের মাতুল রায় রাধামাধব ঘোষ ম্যানেজার হইবার

জন্য চেষ্টা করেন। রাধামাধব বিলাসী ও অপরিমিতব্যয়ী বলিয়া কমিশনর সাহেব সূর্য্য-নারায়ণের পত্নীকে পূর্ব্ব ম্যানেজারকে নিযুক্ত রাখিতে অনুরোধ করিলে তিনিই ম্যানেজার রহিলেন। এই গৃহবিবাদের সময় তিন বৎসর কালেক্টরী হইতে মাসহারার টাকা না লওয়ায় মুর্শিদাবাদের কালেক্টর সাহেব মাসহারার টাকা লইবার কেহ মালিক নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠান ও এইরূপে মাসহারা বন্ধ হয়। চন্দ্রনারায়ণ যখন সাবালক হইলেন তখন তাঁহার বার্ষিক আয় তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা। এই সময় দেওয়ান বক্রনাথ রায় পরলোকগমন করেন। বৈষ্ণবচরণ মজুমদার নামে জনৈক স্বার্থপর কর্ম্মচারী দেওয়ানের পদ পাইলেন। তিনি চন্দ্রনারায়ণকে বিলাসিতায় প্রলোভিত রাখিয়া অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ রায় কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া তাঁহার পত্নীকে সেবায়ৎ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি উচ্ছেদ করিয়া মাল করিবার জন্য চন্দ্রনারায়ণ মাতার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ফলে ইহাতেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। অপর দিকে মাসহারা বন্ধের পরে তাহা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আর কোনও চেষ্টা হইল না। চন্দ্রনারায়ণ ক্রমান্বয়ে ছয়টি বিবাহ করিয়াছিলেন। চতুর্থ পত্নীর গর্ভে ব্রজেন্দ্রনারায়ণের ও ষষ্ঠ পত্নীর গর্ভে যোগেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। চন্দ্রনারায়ণের চতুর্থ পত্নী রাণী দিগম্বরী স্বীয় পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণকে লইয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতেন ও দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ভোগ করিতেন ; চন্দ্রনারায়ণ কনিষ্ঠা রাণী ও তৎপুত্র যোগেন্দ্র-নারায়ণকে লইয়া পৃথক্ ভাবে বাস করিতেন এবং যোগেন্দ্রনারায়ণের নাম কালেক্টরীতে জারী করাইয়া নিজে নাবালকের অলিঅছিরূপে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠা রাণীর দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়া প্রত্যেকের মাসহারা একশত টাকা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া চন্দ্রনারায়ণ কন্যা ও জামাতাগণকে নিজালয়ে রাখিলেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা কুলাইনিবাসী রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ ও কনিষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদ ঘোষ। রাধিকাপ্রসাদের একটি পৌত্রীর সহিত কান্দীর রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের ও অপর পৌত্রীর সহিত যশোর চাঁচড়ার কুমার নৃপতীশকণ্ঠ রায়ের বিবাহ হয়। চন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর কুলাইবাসী ঘোষ মহাশয়েরা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চন্দ্রনারায়ণের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া নামজারীর দরখাস্ত করাইলেন। অপর দিকে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাহাতে আপত্তি দিলেন। কন্যাগণও প্রাপ্য বাকী মাসহারার জন্য মোকদ্দমা স্থাপন করিলেন। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমায় বহু টাকা ব্যয় হয়। সম্পত্তির অধিকাংশই ঋণ দায়ে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে বঙ্গাধিকারীগণের বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার পত্নীকে সেবায়ৎ করিয়া কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাই মাত্র অবলম্বন রহিয়াছে। বলাবাহুল্য যোগেন্দ্রনারায়ণ অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র প্রতাপনারায়ণ বঙ্গাধিকারী-গণের একমাত্র বংশধর রহিয়া যান। অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় প্রতাপনারায়ণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পর্ব্ব মাসহারা পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসহারা দিতে অস্বীকার

করিয়া সবরেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত করেন। প্রতাপনারায়ণ যাবজ্জীবন উক্ত পদে কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

প্রতাপনারায়ণ রায়পুরের সিংহবংশ কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর রায়বাহাদুর চন্দ্রনারায়ণ সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় এক্ষণে ডাহাপাড়ার রাজবাড়ীতে বাস করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র কুমারেন্দ্র-রায়।

ডাহাপাড়ার বাটীর সীমানা মধ্যে সম্প্রতি অধিকাংশই মালের সামিল হইয়া কালেক্টরী মালগুজারি ধার্য্য হইয়াছে। অল্পই (৩৫/০ বিঘা) নিষ্কর রহিয়াছে। কুমার প্রতাপনারায়ণ উক্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন।

কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের বর্ত্তমান আয়—(১) ডাহাপাড়ার বাড়ীর সীমানা ভূমির উৎপন্ন।

(২) ভাওয়ালের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্য লাট গোবিন্দ রায় নিষ্কর মহালের পত্তনীর মালগুজারি ৭৬/১০ শালিয়ানা।

(৩) জেলা মালদহ পরগণে সেরসাবাদ মধ্যে মৌজা কাঞ্চনবাগ, গৌরীনাথপুর ও গৌরীশঙ্করপুর মহাল ও নিষ্কর ভূমি দেবোত্তর রহিয়াছে। শিবগঞ্জ পুখুরিয়া গ্রামে বঙ্গাধিকারী-দিগের পূর্ব্ব বাসস্থানের যে ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, ভারতের কীর্ত্তিরক্ষক বড়লাট লর্ড কর্জ্জন সাহেব তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে।

ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারীদের বাড়ী সম্প্রতি ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সদর দেউড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী পুরাতন ঘর ছিল। উক্ত ঘরে এককালে বর্দ্ধমানের মহারাজ রাজস্বদায়ে কয়েকদিন আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ রহিয়াছে। কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় এক্ষণে উক্ত ঘরটি বাসোপযোগী করিয়া লইয়া কোনও রূপে দিনপাত করিতেছেন।

খাজুরডিহির মিত্রবংশ
বঙ্গাধিকার
৯ নরসিংহ (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
শিবরাম ১০ মহাদেব মহেশ্বর
১১ গোলোকেশ্বর
১২ বিশ্বম্ভর (খাজুরডিহি)
ত্রিভুবন (হুগা)
১৩ অমোঘ সানন্দ কল্যাণ
জিতমিত্র
রাধাবিনোদ মদনমোহন রামমোহন শুকদেব
ভগবান রায় মহাশয়
১৪ বঙ্গবিনোদ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়
গঙ্গানারায়ণ (কড়ুই)
১৪ রঘুনাথ
১৫ হরিনারায়ণ রায়
১৫ রূপনারায়ণ
১৬ মহারাজ দর্পনারায়ণ রায়
১৬ সন্তোষ
১৬ শ্যামসুন্দর
১৬ কৃষ্ণচন্দ্র
১৭ রাজা শিবনারায়ণ রায়
১৭ নরেন্দ্র
১৮ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
মনোহর ১৭ রামচন্দ্র ১৭রামভদ্র ১৭প্রতাপনারায়ণ
১৮ নরনারায়ণ
১৯ রাজা সূর্য্যনারায়ণ রায়
১৮ ইন্দ্রনারায়ণ ১৮কৃষ্ণদেব
২০ রাজা চন্দ্রনারায়ণ রায়
১৯অযোধ্যা নারায়ণ রুদ্রনারায়ণ
২১ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়
শম্ভুনাথ ১৯ গঙ্গানারায়ণ
২২ কুমার প্রতাপনারায়ণ রায়
২৩ কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়
২০ ভৈরব রামমোহন রামতনু
২৪ কুমার কুমারেন্দ্রনারায়ণ রায়
১৯কাশীনাথ রামচন্দ্র দিগম্বর রামনারায়ণ
২০ কালীপ্রসাদ রামসুন্দর দুর্গাসুন্দর ২০ চন্দ্রশেখর গিরিশ হরিশ্চন্দ্র
২১ অম্বিকা
১৮ রামগোবিন্দ
১৮ গৌরীশঙ্কর কালীশঙ্কর
শম্ভুনাথ ১৯গোপানাথ ১৯পার্ব্বতীচরণ ১৯দেবনারায়ণ মুলুকচন্দ্র
২০ দুর্গাপ্রসাদ গুরুপ্রসাদ কমলাকান্ত বিজয়রাম পরশুরাম
২০তারাপ্রসাদ রাজাকিশোর বক্রনাথ হরিপ্রসাদ জীবনপ্রসাদ (দত্তকগত)
জানকীনাথ

খাজুরডির মিত্রবংশ

২০ তারাপ্রসাদ (৫১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
গিরিশচন্দ্র
২১শিবচন্দ্র
২২নৃত্যকালী
দিগিন্দ্র
রামচন্দ্র
যতীন্দ্রনাথ
২৩সতীশ
ক্ষিতীশ
২৩ খগেন্দ্র
২৩ভূপেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
নরেন্দ্র
সুধীর
প্রমথনাথ
রবীন্দ্র

১৬ কৃষ্ণচন্দ্র, ৫১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৭শুকদেব
দর্পনারায়ণ
রামদেব
১৮বৈষ্ণবচরণ
রুদ্রদেব
দুর্গাপ্রসাদ
নীলকণ্ঠ
১৯গৌরীশঙ্কর
নরনারায়ণ
২০ দেবীপ্রসাদ
২১চন্দ্রশেখর
পার্ব্বতী
কালী
রামকৃষ্ণ
২২ঈশ্বরচন্দ্র
রামদেব
২৩রামজীবন
পরমানন্দ

খাজুরডির মিত্রবংশ

১২ বিশ্বম্ভর (৫১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
১৩অমোঘ সানন্দ কল্যাণ
১৪চণ্ডীদাস, সুত ১৫ রাধাকৃষ্ণ গদাধর
১৬শ্যামদাস মোহন রাজবল্লভ জগদ্বল্লভ
গোরীচরণ
১৭বিজয়রাম কাশীরাম
(বংশ ডুঘা ও বহড়ান)
১৭রামদুর্লভ অনন্ত
১৮শুকদেব শোভাচাঁদ লালচাঁদ নারায়ণ
জয়নারায়ণ রাম ১৮অনূপ ১৮গোকুল উদয়নারায়ণ
শিবনাথ শম্ভুনাথ ভোলা দেবনাথ স্বরূপ দেব জীব উমা হর আমীর মোহন কিশোর গোরাকৃষ্ণ
১৯রামকান্ত রামকানাই
১৩ কল্যাণ
২০ত্রিলোচন
নীলকণ্ঠ বৈকুণ্ঠ বীর শ্রীনারাণ লক্ষ্মী
২১শ্বেতরাম
মহানন্দ
মহেন্দ্র
শ্যাম ভগবতী
দুর্গা কালী গুরু বিষ্ণুদাস রাধামাধব
১৮ অনূপনারায়ণ
হরিনারায়ণ রূপনারায়ণ উদয় হৃদয় সীতা কৃষ্ণ আনন্দী রাম রাম
কেশবরাম
সিতিকণ্ঠ শ্যামাকণ্ঠ রাজনাথ (ভাগলপুর)
মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জয় গোবিন্দ মাধব
গোপাল কৃষ্ণগোবিন্দ
নেহাল, গঙ্গা হরিশঙ্কর
যাদব
হীরালাল ব্রজ চৈতন্য
২০দোলগোবিন্দ দাসগোবিন্দ
গুরুচরণ
শিব (ভূমিহর)
দুর্গারাম ও রামচরণ
(ভূমিহর)
রঙ্গলাল সুত শ্যামপ্রসাদ

পুখুরিয়ার মিত্রবংশ

জেলা মালদহের অন্তঃপাতী পুখুরিয়া গ্রামে এখনও খাজুরডির মিত্রবংশ বাস করিতেছেন। তাঁহারা বঙ্গাধিকারীর জ্ঞাতি বলিয়া থাকেন। বঙ্গবিনোদের খনিত কালীসাগর পুষ্করিণীর নিকটে তাঁহাদের বাড়ী রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে বংশলতা পাঠাইয়াছেন তাহার সহিত কুমার প্রতাপনারায়ণের প্রেরিত বংশলতার মিল নাই। সন্দেহজনক হইলেও যেরূপ বংশ-তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই দেওয়া হইল।
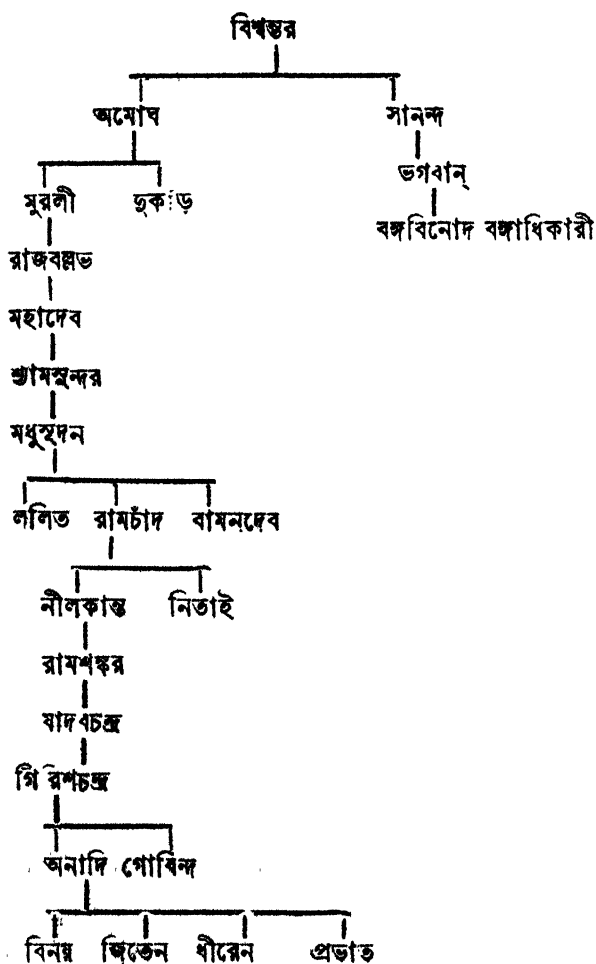
ময়নাডালের মিত্র-ঠাকুর-বংশ।

প্রায় সাড়ে তিনশত বর্ষ অতীত হইল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁটোয়ার সন্নিকটস্থ রাজুর গ্রামে কালীচরণ মিত্র নামে এক মহাত্মা বাস করিতেন। তিনি দুষার মিত্র-বংশসম্ভূত ছিলেন ও নবাব সরকারে উচ্চপদে কর্ম্ম করিতেন। ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির অভাব না থাকিলেও পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মনঃকষ্টে থাকিতেন। একদা তাঁহার পত্নী স্নানার্থ পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া স্বীয় অনপত্যতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বড় কান্দরা পাটের শ্রীমঙ্গল ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে দুঃখের কারণ বলিলেন। শ্রীমঙ্গল ঠাকুর মহাশয় মিত্রপত্নীর কথা শুনিয়া বলিলেন, এইবার তোমার পুত্র হইবে, কিন্তু তোমার সেই পুত্রটি যেন আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে। যথাকালে মিত্রপত্নী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পিতৃমাতৃস্নেহে পালিত হইয়া বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কালীচরণ পুত্রকে দীক্ষাপ্রদান জন্য কুলগুরুকে নিজ বাটীতে আনাইলেন। শুভদিনে দীক্ষার আয়োজন হইল। কালীচরণের পত্নীর পূর্ব্বকথা স্মরণ ছিল না। কালীচরণ যখন পুত্রকে কুল-গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ জন্য বলিলেন, তখন বালক বলিল, "আমার গুরুদেব কোথায়?" কালীচরণ উপস্থিত কুলগুরুকে দেখাইয়া দিলে বালক বলিল, "ইনি আমার গুরুদেব নহে।" পরে মাতাকে বলিলেন, "মা তুমি পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া গিয়াছ।" মাতা তখন স্বীয় স্বামীর নিকট পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। কালীচরণ তখন বহু অর্থ ও বিনয় বাক্যে কুলগুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। এমন সময়ে বড়কান্দরা হইতে শ্রীমঙ্গল ঠাকুর রাজুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ মাত্র মিত্রনন্দন ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চরণের ধুলি লইয়া তাঁহাকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। যাঁহার কৃপায় পুত্রমুখ দর্শন করিয়াছেন, তিনি কৃপা করিয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া মিত্রদম্পতী আহ্লাদিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় যথাকালে বালককে দীক্ষা প্রদান করিলেন ও তাঁহার নাম রাখিলেন নৃসিংহবল্লভ। দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্তি মাত্র নৃসিংহবল্লভ আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মঙ্গল আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। এদিকে নৃসিংহবল্লভ উন্মাদের ন্যায় বেড়াইতে লাগিলেন। নৃসিংহবল্লভের এইরূপ বিষয়বৈরাগ্যভাব দেখিয়া পিতামাতার মনে পুনর্ব্বার নিরানন্দের আবির্ভাব হইল। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে তাঁহারা উভয়েই পরলোকগমন করিলেন। নৃসিংহবল্লভ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া অতি যত্ন সহকারে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন ও স্বীয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রেমোন্মত্ত ভাবে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা বীরভূম জিলার অন্তর্গত ময়নাডাল গ্রামের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়া একটী বৃক্ষমূলে বিশ্রামকালে স্বপ্নে দেখিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন যে, 'এই ময়না-

ডাল গ্রাম মধ্যে আমার সেবা প্রতিষ্ঠিত কর, আর তোমাকে এরূপ ভাবে কান্দিয়া বেড়াইতে হইবে না।' নৃসিংহবল্লভ বলিলেন, আমি সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি কেমন করিয়া আপনার সেবা স্থাপন করিব এবং কি উপায়েই বা সেবা চালাইব। মহাপ্রভু আদেশ করিলেন, তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা আনিবে তাহার দ্বারা আমার ভোগ হইবে, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট রহিব। শ্রীমুখের এই আদেশবাণী শ্রবণ মাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন নৃসিংহবল্লভ গ্রামমধ্যে গিয়া গ্রামের লোকদিগকে স্বপ্নাদেশের বিষয় জানাইলেন। গ্রামবাসীরা যাহাতে সেবা প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য উদ্যোগী হইলেন এবং একটী উত্তম স্থান নির্ণয় করিয়া তথায় একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। কি প্রকারে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইবে নৃসিংহবল্লভ সেজন্য চিন্তিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইলেন, সুগড় গ্রাম হইতে স্বরূপ মিস্ত্রিকে আনাইয়া ময়নাডাল গ্রামের একটী নিম্ববৃক্ষের দারু হইতে শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। নৃসিংহ-বল্লভ সুগড় গ্রামে উক্ত মিস্ত্রির নিকট গমন করিয়া স্বপ্নাদেশের কথা জানাইলে স্বরূপ মিস্ত্রি বলিল, আমার দুই চক্ষু অন্ধ কেমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিব। নৃসিংহবল্লভ পুনরায় ময়নাডালে ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে প্রভুর নিকট মিস্ত্রির অবস্থা জানাইলেন; মহাপ্রভুর কৃপায় উক্ত ভাস্কর চক্ষু পাইয়া ময়নাডাল গ্রামে উপস্থিত হইল এবং নৃসিংহবল্লভের সহিত দেখা করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিম্ববৃক্ষ হইতে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিলেন। নৃসিংহবল্লভ পূর্ব্বনির্ম্মিত কুটীরে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভিক্ষাদ্বারা সেবা পূজা চালাইতে লাগিলেন। বিষয়বৈরাগ্য হইলেও মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে নৃসিংহবল্লভ দার পরিগ্রহ করিলেন এবং যথা সময়ে তাঁহার একটী পুত্র হইল। পুত্রটীর নাম রাখা হইল হরেকৃষ্ণবল্লভ। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নৃসিংহবল্লভ পরলোক গমন করিলেন। হরে-কৃষ্ণবল্লভ অত্যধিক স্থূলদেহ হেতু ভিক্ষার্থ গ্রামান্তরে যাইতে পারিতেন না। এজন্য তিনি ৪জন শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া ভিক্ষার্থ বাহির হইতেন। কিছু কাল পরে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

একদা রাজনগরাধিপতি রাজা আশজ্‌জমান্‌খাঁ বাহাদুর মৃগয়ার্থ সৈসঙ্গে ময়নাডালের নিকটস্থ জঙ্গলে শিবির সংস্থাপন করেন। তাঁহার সঙ্গে একটি শিকারী পক্ষী ছিল, সেটি কোনও সুযোগে পিঞ্জর হইতে পলাইয়া যায়। হরেকৃষ্ণবল্লভের জনৈক শিবিকা-বাহক মাংসাহার উদ্দেশ্যে উক্ত পক্ষীটিকে মারিয়া গোপন করিয়া রাখে। রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা জানিতে পারিয়া হরেকৃষ্ণবল্লভের বাসগৃহ, দেবালয় ও ভৃত্যের গৃহ আক্রমণ করিল। হরেকৃষ্ণবল্লভ স্নানান্তে আহ্নিকে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিলেন ও ব্যাপার জানিয়া মৃত পক্ষীটি আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। পক্ষীটী আনীত হইলে নৃসিংহবল্লভ মন্দিরপ্রাঙ্গণের ধূলা মাখাইয়া পক্ষীটিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন। কর্ম্মচারিগণ পক্ষীসহ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই অলৌকিক

ব্যাপারের বিষয় বর্ণন করিলে রাজা মোহিত হইয়া মহাপ্রভুর সেবা পরিচালন জন্য যথেষ্ট ভূমি সম্পত্তি দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ভজনসাধনের অসুবিধা হইবে বলিয়া হরেকৃষ্ণবল্লভ বিষয় গ্রহণে অসম্মতি জানাইলেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধের পর হরেকৃষ্ণবল্লভ সম্মতি দান করিলে রাজা ১০০ বিঘা নিষ্কর দেবত্র দান করিলেন। এই ঘটনার পর তাঁহার ২।৪ জন করিয়া শিষ্য হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকল জাতিই তাঁহার শিষ্য হইল এবং তখন হইতে তাঁহার নাম হইল মিত্র-ঠাকুর। এখনও মিত্র ঠাকুরের বংশধরগণের অনেক শিষ্য রহিয়াছে। তবে তাঁহারা এখন আর ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন না। মহাপ্রভুর সেবাপূজা ও ভোগাদি এক্ষণে ব্রাহ্মণ দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

কায়স্থজাতির নিকট ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি সকল বর্ণই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং মহাপ্রভু প্রেমে এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে ডাকিবামাত্র একজন কায়স্থসন্তানকে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে দেখা দিতেন। একথা সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে। কিন্তু মিত্র-ঠাকুরগণের এখনও বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য রহিয়াছে এবং নগরের রাজা যে ১০০ বিঘা দেবত্র ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহাও মিত্রঠাকুরগণ এখনও সেবায়ৎরূপে ভোগ করিতেছেন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। মহাপ্রভুর পার্ষদ কুলাই ঘোষবংশীয় বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ অসাধারণ সাধক ছিলেন। তৎপরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও বড় কান্দরার শ্রীজয়গোপালদাসঠাকুর বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শিষ্য করিয়াছিলেন। বগুড়া জেলার মেলা গোপীনাথপুরে সিংহপ্রিয়াবংশ ও খাঁদরার বকশীবংশ ইহাঁদের সকলেরই ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তুল্য ত্যাগী সাধক কয়জন হইতে পারিয়াছেন? ইহাঁরা সকলেই কায়স্থ ছিলেন ও সাধনার ফলে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র-ঠাকুর ১৫৫৫ শকাব্দে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র-ঠাকুরের অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা প্রবাদরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। একটি অলৌকিক ঘটনার পরে হরেকৃষ্ণ ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করেন ও তাঁহার বংশধর-গণকে ধূমপান করিতে নিষেধ করিয়া যান।

ময়নাডালের মিত্রঠাকুরদের বিশেষত্ব হরিনামসঙ্কীর্ত্তন। একদা হরেকৃষ্ণবল্লভ মিত্র-ঠাকুরের প্রতি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ হয় যে নামসঙ্কীর্ত্তনে আমার যেরূপ প্রীতি হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। অতএব তোমার পাঁচটী পুত্রের সহিত তুমি নামসঙ্কীর্ত্তন ও খোল বাদ্য শিক্ষা কর। এজন্য তোমাদিগকে কোথাও যাইতে হইবে না। আমি গোপনে তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। বাস্তবিক মিত্রঠাকুর ও তাঁহার বংশধরগণ মহাপ্রভুর কৃপায় এরূপ সুন্দর সংকীর্ত্তন ও খোলবাদ্য শিক্ষা করিলেন যে বাঙ্গলা দেশের সকল

স্থান হইতে কীর্ত্তনীয়াগণ সঙ্কীর্ত্তন ও বাদ্য শিক্ষার জন্য শ্রীপাট ময়নাডালে আসিতে লাগিলেন। এখনও তাঁহারা এরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকেন।

হরেকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরের দেহান্তের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজবল্লভ ঠাকুর অধিক সময় নির্জ্জনে বসিয়া মহাপ্রভুকে ডাকিতেন ও প্রবাদ যে মহাপ্রভু তাঁহাকে গান শিক্ষা দিতেন। ব্রজবল্লভ দৈনিক ভোগের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া যান। দিবসে ভোগের জন্য চাউল ১২ সের ও তদুপযোগী ডাল দুই প্রকার, শাক, ভাজা, ২।৩ প্রকার, শুক্তা, রসা বা নিরামিষ ঝোল, মোটা ঝাল, পোস্তদানার বড়া, অম্বল ও পায়স। রাত্রে আধসের ময়দার লুচী, দুগ্ধ ১ সের, মিষ্টান্ন সম্ভবমত। প্রাতঃকালে দুগ্ধ বা দধি সংযুক্ত চিড়া ও চিনি, ছোলা ভিজা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি এখনও ঐ নিয়মে সেবা চলিতেছে। পর্ব্বাদি উপলক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। গীতবাদ্যশিক্ষার জন্য বহুদূর হইতে ছাত্র আসিয়া থাকে। তাহাদিগকে আহার ও থাকিবার স্থান দিতে হয়। অতিথিদিগের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা আছে।

ময়নাডাল হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিম স্থিত বড়রা গ্রামের শুকদেবমিত্র রাজনগর রাজধানীতে কর্ম্ম করিতেন। কুষ্ঠব্যাধি হওয়ায় তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাড়ী আসেন। কিন্তু কুৎসিত পীড়া হওয়ায় তাঁহার আত্মীয়বর্গ এমন কি স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ময়নাডালে আসিয়া রাত্রিকালে মহাপ্রভুর প্রাঙ্গণে পড়িয়া থাকেন। ব্রজবল্লভ ঠাকুরের উপদেশানুসারে তিনি কিছু কাল তথায় থাকিয়া মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত গ্রহণ ও প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিবার পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন; নীরোগ হইয়া শুকদেব নিজ বাড়ী বড়রা গ্রামে না গিয়া রাজনগরে গমন করিলেন ও পূর্ব্ব পদে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের আয় হইতে তিনি ময়নাডাল গ্রামে গৌরাঙ্গসাগর নামে একটি পুষ্করিণী খনন ও পূর্ব্বদ্বারী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্র তখন ময়নাডালে আসিয়া তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। পরে ব্রজবল্লভ ঠাকুরের আদেশানুসারে তাঁহাকে বাড়ী যাইতে হইল। শুকদেব মিত্রের বংশধরগণ এক্ষণে উক্ত বড়রা গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সঙ্গতিপন্ন পত্তনীদার এবং মহাপ্রভুর সেবার জন্য অনেক সাহায্য করেন।

সন ১১৭২ সালে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাপুর, বড়জুরি প্রভৃতি গ্রামে ২০০/ বিঘা জমি দেবত্র দান করেন।

ব্রজবল্লভের জীবনকালে এতদঞ্চলে একবার সাঁওতালদিগের হাঙ্গামা হয়। তখন সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। ব্রজবল্লভ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ একখানি ডুলি করিয়া মহাপ্রভুকে লইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত যে স্থানে শ্যামারূপা দেবীর মন্দির ও লাউসেনের গড় ও জঙ্গলের নিকট ইছাই ঘোষের মন্দির আছে তথায় উপস্থিত হন। ঐ স্থানের নাম হইয়াছে গৌরাঙ্গপুর। উক্ত গ্রামের তালুকদার টিকরবেতাগ্রামবাসী গুরুপ্রসাদ ঘোষ

ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি তথায় মহাপ্রভু দর্শন করিয়া উক্ত মৌজা দেবত্র দান করেন। তথায় ২।৪ দিন অবস্থানের পর মানকর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরপশ্চিমদিকে অবস্থিত পদুমা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে নিমাইচরণ বাবাজীর আখড়া ছিল। তিনি মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ মাত্র আনন্দিত হইয়া মিত্রঠাকুর মহাশয়দিগের নিকট গমন করিলেন ও স্বীয় আশ্রমে মহাপ্রভুকে লইয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। মিত্র ঠাকুরগণ সম্মত হইলে বাবাজী মহাপ্রভুকে ও সেবায়েৎগণকে স্বীয় আখড়ায় লইয়া গিয়া ১ মাস রাখিলেন। বাবাজীর ৫৯/ বিঘা জমি ও কিছু বনভূমি জমিদারী স্বত্ব ছিল। ঐ সমস্ত সম্পত্তি তিনি মহাপ্রভুর দেবত্র করিয়া দান করিলেন। এখন উক্ত সম্পত্তি মিত্রঠাকুরদের অধিকারে রহিয়াছে। সাঁওতাল হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে মহাপ্রভু পুনরায় ময়নাডালে আসেন।

মিত্র ঠাকুরবংশীয় বিখ্যাত গায়ক ও বাদকগণের নাম

৺গৌরমিত্র ঠাকুর, ৺রামানন্দ মিত্র ঠাকুর ও ৺রসিকানন্দ মিত্র ঠাকুর উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। ৺বৈকুণ্ঠ মিত্রঠাকুর গায়ক ও বাদক ছিলেন। ৺নিকুঞ্জ মিত্রঠাকুর অদ্বিতীয় বাদক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকলেই কিছু কিছু গীত বাদ্য জানিতেন।

বর্ত্তমান গায়কগণের নাম—কিশোরীমোহন মিত্রঠাকুর, রাসবিহারী মিত্রঠাকুর, নবনীধর মিত্রঠাকুর, নবগোপাল মিত্রঠাকুর, হরিদাস মিত্রঠাকুর, বংশীধর মিত্রঠাকুর ও অন্যান্য সকলেই গীত জানেন।

বর্ত্তমান বাদকগণ—নকড়ি মিত্রঠাকুর, কৃষ্ণকিঙ্কর মিত্রঠাকুর, গোবর্দ্ধন মিত্রঠাকুর, ধরণীধর মিত্রঠাকুর, সংকেতবিহারী মিত্রঠাকুর, শশধর মিত্রঠাকুর, অদ্বৈত মিত্রঠাকুর, নিত্যগোপাল মিত্রঠাকুর, নাগরীমোহন মিত্রঠাকুর ও হরিদাস মিত্রঠাকুর আসল অঙ্গের গায়ক এবং অদ্বিতীয় মৃদঙ্গ-বাদক।

মিত্রঠাকুর-বংশে কেহই এ পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন নাই ও চাকরি করেন নাই। এখনও কেহ ইংরাজী পড়েন না বা চাকরি করেন না। সকলেই কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন।

ভুষার মিত্র—ময়নাডাল মিত্রঠাকুরবংশ
১৭ নিধিরাম (৬২ পৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ)
১৮ কালাচরণ
১৯ নৃসিংহবল্লভ
২০ হরেকৃষ্ণ
২৪ সুধাকৃষ্ণ
২৪ কিশোরী
খুদিরাম
রাধারমণ (ছোট)
বৈষ্ণবচরণ
করুণাময়
২৫মনোহর
বনবিহারী
কামিনী মোহন
নাগরী মোহন
মদন মোহন
অদ্বৈত
ভজহরি
২১ ব্রজবল্লভ
গোপীবল্লভ
২১ ভুবনবল্লভ
শ্রীবল্লভ
জগৎবল্লভ
২২ আনন্দবল্লভ
গোপালবল্লভ
২২নবল্লভ
২২অচ্যুতানন্দ
ভজনানন্দ
নয়নানন্দ
২৩ লোচনানন্দ
২৩বিশ্বম্ভর
২৩ নবদ্বীপ
২৪ সুধাকৃষ্ণ
প্রবোধানন্দ
রামকিশোর
কেনারাম
২৪রামানন্দ
২৩শ্রীনিবাস
রসিকানন্দ
জয়নারায়ণ
২৫নিমাইচরণ
২৫অটলবিহারী
নটবর
নরহরি
২৬ কন্দর্প
২৬ রাসবিহারী
নবনী
শশধর
ধরণী
হলধর
ভাগবত
২৩যশোদানন্দন
রোহিণীনন্দন
কালাচাঁদ
নন্দনন্দন
গৌরকিশোর
২৭নবগোপাল
নিত্যানন্দ
গোবিন্দ গোপাল
গৌরগোপাল
২৩রাধানাথ
২৩রাধাগোবিন্দ
নিত্যানন্দ
রাধাবিনোদ
২৩রাধাসুন্দর
রাম সুন্দর
সীতানাথ
নদেরচাঁদ
উদয় চাঁদ
গোরাচাঁদ
যাদবানন্দ
২৪দানবন্ধু
চন্দ্রমোহন
২৪চন্দ্রশেখর
২৪বৈকুণ্ঠ
ধনকৃষ্ণ
২৪ নিকুঞ্জবিহারী
২৫ বংশীধর
২৫নকড়ি
কৃষ্ণ
গোবর্দ্ধন
ললিত
২৫মুরলা, সুত
প্রাণগোবিন্দ
২৫বঙ্কবিহারী
রাধারমণ (বড়)
২৫হরিদাস
রসরাজ
কৃষ্ণচৈতন্য

ভুঘার মিত্রবংশ
৯ নরসিংহ সুত ১০ মহেশ্বর মিত্র (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১১ আখণ্ডল
শুক্রাম্বর (খাজুরডি)
১১ গুণাকর (কাচনা)
১২ কেশব
১২ হলধর
শ্রীরঙ্গ
উষাপতি (উমাপতি)
১৩ বীণাকর
১৪ সৃষ্টিধর
১৫ জীবধর
১৬ যদুনন্দন
১৭ কালিদাস
২৫ রামসুন্দর
২৬ প্রাণবল্লভ
২৬রাধাবল্লভ (বাস মোল্লা)
২৭শরচ্চন্দ্র
জ্যোতিষচন্দ্র
গোপেশ্বর
বিভূতিভূষণ (বেণুকর)
পুত্র
২৮ জিতেন
জয়গোপাল
১৮ রূপরাম (প্রসাদপুর), সনাতন
১৮ মদন
মুরারি
মুনিরাম
১৯ মাধব
কেশব
২০ গোরাকান্ত
২১ লক্ষ্মণ
২২ সীতারাম
২৩ গোপানাথ
২৩ জগন্নাথ
২৪ গদাধর
নবকিশোর
২৪ নরসিংহ
নফর
২৫ ব্রজকিশোর
২৫ কৃষ্ণমোহন
২৫কৃষ্ণচন্দ্র
২৫রামসুন্দর
২৬ মহেন্দ্রনারায়ণ (বাস প্রসাদপুর)
২৬ হরিনারায়ণ (জুবুটিয়া)
২৭যোগেশ
দীনেশ
রসরাজ
দ্বিজবর
২৮কংসারি
বাদল
২৮হলধর
সতীশ
২৭সুরেশ
২৭ক্ষুদ্রনারায়ণ
২৮উমাপতি
কমলাপতি
বিমলাপতি
ত্রিশাম্পতি
জগৎপতি
১৯ কৃষ্ণবল্লভ (বাস লাখুরিয়া)
২০ হরিহর
২১ রামানন্দ
২১ রামজীবন
২২ বারাণসী
২৩ রামসন্তোষ
২৪ রামগোপাল
২৫ গৌরচরণ
২৬ দীননাথ
২৭যাদবচন্দ্র
২৭কেনারাম
২৮শিবপ্রসাদ
২৯নিতাইসুন্দর
২৯রাধাসুন্দর
কৃষ্ণ
৩০নীলরতন
২৮জিতেন
ধীরেন
খগেন
৩০ তিনকড়ি
কিরণচন্দ্র
কালিদাস
সুরেন্দ্র
মণীন্দ্র

দুধার মিত্রবংশ

৯ নরসিংহ, সুত ১০ মহেশ্বর মিত্র (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

১১ আখণ্ডল শুক্লাম্বর ১১ গুণাকর (কাচনা)

১২ কেশব ১২ হলধার শ্রীরঙ্গ উষাপতি

১৩ রমানাথ

১৪ যোগানন্দ — ১৫ রতিকান্ত — ১৬ শ্যামসুন্দর — ১৭ নিধিরাম

১৪ রামেশ্বর — ১৫ রাধকৃষ্ণ — ১৬ গৌরাঙ্গ — ১৭ গোবিন্দ (মারুড়া রুদ্রবাটী)

১৮ রামলোচন রাধাকান্ত জগন্মোহণ শিবনারায়ণ শ্যামসুন্দর কমলাকান্ত

১৯ রামগোপাল

১৯ নীলমাধব রাধামাধব হরিমাধব

নন্দন

১৮ গোপাল হটেশ্বর ১৮ কালীচরণ গোবর্দ্ধন

১৯ ত্রিলোকচন্দ্র

১৯ কৃষ্ণকিঙ্কর ব্রজকিশোর আনন্দীরাম রাধনাথ কেবলরাম বালকরাম (ছিনপাই)

২০ ভুবনেশ্বর মাধবানন্দ

দিগম্বর ২০ কার্ত্তিক

২১ মনোহর

২০ নন্দ সুদাম নবনীধর রাজ্যধর হলধর

২১ কৃষ্ণচন্দ্র

২২ কমললোচন

২২ রাঘব আনন্দীরাম কৃষ্ণদুলাল

রাম জয়

২৩ বৈদ্যনাথ ২৩ গোলোকনাথ

২৪ রামতনু ২৪ রামকানাই রামজি

২৫ রাধামাধব (চুরপুনা)

রাধাকৃষ্ণ মিত্র বিবাহসূত্রে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গুস্করা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী চাণক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। উক্ত বংশে রাজকিশোর মিত্র একজন উদারপ্রকৃতি ভগবদ্ভক্ত লোক ছিলেন। রাজকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র সাধারণহিতকরকার্য্যে কাল কাটাইতেন। বহু জমিদারের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া তিনি অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের পুত্র রসময় অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অভিভাবকবিহীন হইলেও বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহাতিশয্যবশতঃ ও স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসার গুণে মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বি, এ, পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে সরকারী বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্বীয় অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অবশেষে এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। উক্ত বিভাগে দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া শেষকালে হিন্দুস্কুলের হেড মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। দীর্ঘকাল উক্তপদে কার্য্য করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অবসরগ্রহণকালে কলিকাতার গণ্যমান্য ভদ্রলোকগণ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের "মার্ব্বেল প্যালেস" গৃহে রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু কৃতী ছাত্র ভারতের নানা স্থানে উচ্চপদে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার অনুরক্ত ছাত্রগণ হিন্দু স্কুলে তাঁহার এক ধাতুময়ী (ব্রোঞ্জ) প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। ইনি আজীবন ভক্ত বৈষ্ণব, একজন সুকণ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক। কীর্ত্তনকালে অনেক সময় তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য বলিয়া বোধ হয়। সিউড়ি গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলে অধ্যয়নকালে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের (লর্ডসিংহ) সহিত তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয় হয়। উভয়েই একসঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। লর্ডসিংহের মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রসময়ের সহিত প্রণয় সমভাবে ছিল।

রসময়ের দুইটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ করুণাময় সম্প্রতি খুলনা জেলায় সাতক্ষীরা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিতেছেন। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে তিনি উক্ত মহকুমার লোকদিগের সাহায্যার্থ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এজন্য তত্রত্য লোকগণ সাতক্ষীরায় 'করুণাময়' ইনষ্টিটিউশন নামে একটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া করুণাময়ের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন। রসময় মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র মহিমাময় M. A. B. L. কলিকাতা হাইকোর্টের

কাচনার মিত্রবংশ
৯ নরসিংহ (নরোত্তম) মিত্র (৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১০ মহেশ্বর, সুত ১১ গুণাকর (বাঘাম্বর)
১২নারায়ণ
১২গঙ্গাধর
১৩পরশুরাম
১৩ শ্রীধর, সুত ১৪তিলকরাম
১৪ কৃষ্ণচরণ(বাস ঘোড়শালা)
কৃষ্ণপ্রসাদ
১৫ বৈকুণ্ঠনাথ
১৫নয়ানচন্দ্র
মনসুখ
চন্দন
১৫মাণিক
১৬গোবিন্দ
গোপাল
১৬ইন্দ্রনারায়ণ
অমরচন্দ্র
১৬ক্ষুদিরাম
১৭চন্দ্রশেখর
বাণীনাথ (সাতকড়ি)
তিলকচন্দ্র
বিশ্বেশ্বর
১৭ স্বরূপ
১৮ফকিরচাঁদ
জগমোহন
১৭ হরিশঙ্কর
রাম
কালীশঙ্কর
১৮ মোহন
১৮ভুবনেশ্বর
সর্ব্বানন্দ
গুরুদাস
ক্ষুদিরাম
গুরুপ্রসাদ
রামপ্রসাদ
মনোহর
১৮কমললোচন
উৎসবানন্দ
রাজীব
১৯কাঙ্গালী
প্রেমচাঁদ
গৌরকিশোর
নবকিশোর
কৃষ্ণ
হরনারায়ণ
রামহরি
আনন্দীরাম
কৃষ্ণদুলাল
১৯ কৃষ্ণধন
প্রাণধন
কৃষ্ণজীবন
২০প্রতাপ
গিরিশ
ত্রৈলোক্য
২০সতীশচন্দ্র
২৪বিশ্বেশ্বর
২৬রামকান্ত
হরিদাস
২১বৈদ্যনাথ
গোলোকনাথ
২৫ আনন্দীরাম
মধমন (ঘনশ্যাম)
গৌর
কৃষ্ণমোহন
শ্যাম
নন্দমোহন
রামতনু
রামকানাই
রামজী
২৬রামকান্ত
ত্রৈলোক্য
রাধামাধব
মথুরা
দীননাথ
দয়ানাথ

চতুর্থ অধ্যায়

মিত্রবংশের ভাব

(মিত্রবংশের ভাব প্রধান অপেক্ষা ।৶০ আনা হানি)

সমাজ	মহাআর্ত্তি	তথার্ত্তি	সুমধ্যম	মধ্যম	সৎক্ষেম্য	ক্ষেম্য
মেহগ্রাম	১	০	০	০	০	০
বেলুন	১	০	০	০	০	০
তুম্বা	১	০	০	০	০	০
নৈহাটী	০	০	০	০	০	০
খাজুরডিহি	০	০	০	০	০	০
কাচনা	০	০	০	০	০	০

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী সভার গণনানুসারে বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্রগণের বর্ত্তমান বাসস্থান

ধারা	আদি বাসস্থান	বর্ত্তমান বাসস্থান
কেশমিত্র	বেলুন	জেলা বীরভূম—বেলুন, বোস্তা, গয়তা, জগধরী, লক্ষ্মীবাটী, মিত্রপুর, রতনপুর, যাজিগ্রাম, কলহপুর, আমডোল, পুরাণগ্রাম, কানাচি, বেগুণে, মাড়কোলা, সিউড়ি, সীতারামপুর, হেতমপুর, ময়নাডাল, কেঁদগড়ে, রসা, বড়রা, রাণীগ্রাম, রাধানগর, রাইপুর, সুগর, টিকরবেতা, পরোটা, গোপালপুর, রাধাকৃষ্ণপুর, ওলকুণ্ডা, মহুলা, দত্তবগতোর। জেলা মুর্শিদাবাদ—জয়যান, গুরুলিয়া, পুন্যে, সাবলদহ, ছোট কাপসা, হিলোড়া, বংশবাটী, কৈয়র, মণিগ্রাম, খৈরাটী, তাঁতিবিরোল, ঘোরশালা, কালমেখা, কেন্দুয়া, বেওয়া খাসপুর ও ঝিল্লি। জেলা ভাগলপুর—কৈরী, বনিয়াডিহি ও বরারি। জেলা বর্দ্ধমান—বহড়ান, পাণ্ডুগ্রাম, মোস্তফাপুর, কৈতন, পান্নুহাট, মাহাতা, ভিন্‌ ভিন্‌ গোপালপুর, এরুয়ার, রতনপুর, বিশরে শিলাকোট ও হস্তিবাটী। জেলা

সাঁওতাল পরগণা—মাথাকেশ, জালালপুর, গোয়ালখোর ও বারহেট। জেলা মুঙ্গের—লক্ষ্মণপুর। জেলা পূর্ণিয়া—শাগুনিয়া ও চাঁপি। জেলা দিনাজপুর—শঙ্করপুর ও আমিনপুর। জেলা মালদহ—আইচ, গোপালপুর ও নিমাসরাই। জেলা বাঁকুড়া—রাজগ্রাম ও কলাবেড়ে বিক্রমপুর।

সর্ব্বেশ্বর মিত্র মেহগ্রাম জেলা বীরভূম - মেহগ্রাম, পাইকপাড়া, লক্ষ্মীবাটী, সোণার কুণ্ড, বরবাটী ও পরোটা। জেলা মুর্শিদাবাদ—কালমেঘা, মাঠখাগড়া, বোখারা, হিলোড়া ও বরার। জেলা সাঁওতাল পরগণা—গোয়ালখোর। জেলা পূর্ণিয়া—ডাটিয়ান। জেলা যশোহর—হরিহর নগর। জেলা ২৪ পরগণা—কলিকাতা ফরেপুকুর ষ্ট্রীট, ন্যায়রত্ন লেন ও শ্যামবাজার। জেলা মালদহ—গিলাহবাটী, বাচামারি, বাথরা ও যদুপুর।

মহেশ্বর মিত্র ডুঘা জেলা বর্দ্ধমান—ডুঘা, গোমাই, কাঁটোয়া, কল্যাণপুর, মৌগ্রাম, চাণক ও সেঁরো। জেলা মুর্শিদাবাদ—বনওয়ারিবাদ, জাঙলিয়া, মোল্লা, বরঞা, বংশবাটী ও প্রসাদপুর। জেলা বীরভূম—কুড়ূমগ্রাম, জেরুলিয়া, তালঞা, ছাউতরা, দুর্গাপুর, ভুতুরা, মৌবুনা, ছিনপাই, ময়নাডাল, রঘুনাথপুর মামুদবাজার, রাইপুর, কাঁকুটিয়া, ধল্লা, মুন্দিরে, জুবুটিয়া ও কুসুমযাত্রা। জেলা সাঁওতাল পরগণা—কুমারদহ। জেলা মেদিনীপুর—তমলুক, কাঁথি, আধিনাগরী, চন্দ্রকোণা, মানপুর ও চন্দ্রকোণা নূতনহাট। জেলা হাবড়া—বসন্তপুর। জেলা মালদহ—বাথরা, শিবগঞ্জ, শ্রীরামপুর ও ভবানীপুর। জেলা বাঁকুড়া—চাঁদগ্রাম। জেলা নদীয়া—মাগুরা ও কেচুয়াডাঙ্গা।

বাগেশ্বর কাচনা জেলা মুর্শিদাবাদ—ঘোরশালা, জেলা বীরভূম—ঝিকড্ডা, মদীয়ান, রঘুনাথপুর মামুদপুর ও মিত্রপলসা। জেলা সাঁওতাল পরগণা—সুখজোড়া।

বামন গোকর্ণ জেলা মুর্শিদাবাদ—খোসবাসপুর, পাঁচথুপী দক্ষিণপাড়া, কালমেঘা ও সাপলদহ। জেলা বর্দ্ধমান—কোমরপুর, পাণ্ডুগ্রাম, চাণক ও নূতনগ্রাম। জেলা বীরভূম—আমডোল, মালঞ্চি, মাড়কোলা, হরিপুর, কুণ্ডিরা, জুবুটে, ধ্রুববাটী ও বরা। জেলা ভাগলপুর—বরারি, কলাপুর, মনোহরপুর, দাণ্ডাবাজার, খয়রা, মহীমন্তকপুর, বাঁকা, কুনৌনী, গোলাহাট কাখিয়া, রতনপুরা,

ও বিহিপুর। জেলা সাঁওতাল পরগণা—মাথাকেশ ও ধনবৈ। জেলা যশোর—মবারকপুর ও ভাটপাড়া। জেলা পূর্ণিয়া—বিজৌলী ও রামপুর। জেলা মেদিনীপুর - নারিট। জেলা মালদহ—নাজিরপুর, খাসকোল, যদুপুর ও খিদিরপুর। জেলা দিনাজপুর—ঘাসিপাড়া ও করুইবাড়ী। জেলা বাঁকুড়া—বৈতল। জেলা নদীয়া—গড়গাড়ী।

রঙ্গ মিত্র — কুড়ুমগ্রাম — জেলা বীরভূম - কুড়ুমগ্রাম, জগধরী, পাইকপাড়া ও যাজিগ্রাম। জেলা পূর্ণিয়া—আজিমনগর।

মহাদেব মিত্র — খাজুরডিহি — জেলা বর্দ্ধমান—কড়ুই, তুঘা, মুস্তল, রামনগর, গোস্বামীখণ্ড ও চুরপুনী। জেলা মুর্শিদাবাদ—পাহাড়পুর, ডাহাপাড়া ও বেওয়া। জেলা বীরভূম—সীতারামপুর হেতমপুর, রাইপুর, রূপপুর, সুঁদিপুর ও কুড়ুমসা। জেলা ভাগলপুর—মস্কন বরারিপুর। জেলা হাবড়া—রামেশ্বরপুর। জেলা মুঙ্গের—পিপরা, গৌরীপুর ও লক্ষ্মণপুর। জেলা মালদহ—বাচামারা ও পুখুরিয়া। জেলা বাঁকুড়া—চোঞানল।

দেশ মিত্র — কালুহা — জেলা বীরভূম—কালুহা, সোণারকুণ্ড, ধলাশীন, মাড়কোলা, টিকরবেতা, কুড়ুমসা ও কুসুমযাত্রা। জেলা মুর্শিদাবাদ—ঘোড়শালা ও খৈরাটী। জেলা সাঁওতাল পরগণা—গোয়ালখোর ও একতালা। জেলা দিনাজপুর—আলিগড়া ও খামরুয়া। জেলা মালদহ—আহৈ, গোপালপুর, নিমাসরাই ও যদুপুর।

রুদ্র মিত্র — হিলোড়া — জেলা মুর্শিদাবাদ—হিলোড়া।

পঞ্চম অধ্যায়

কাশ্যপ গোত্র দত্তবংশ

যে পঞ্চ কায়স্থের পশ্চিম হইতে গৌড়ে আসিবার কথা কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, তাঁহাদিগের অন্যতম 'কাশ্যপো দেবনামা চ' অর্থাৎ কাশ্যপগোত্রীয় দেবদত্ত। সুদর্শন মিত্র এবং এই দেবদত্ত মায়াপুরী হইতে আসিয়াছিলেন। এই মায়াপুরী হরিদ্বার কিম্বা তৎসমীপ-বর্ত্তী কোনও স্থান বলিয়া অনুমান হয়। গৌড়ে আসিবার পরে তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে শ্যামদাসের ঢাকুরীতে লিখিত রহিয়াছে—

"হরিহর গ্রামে রৈল কাশ্যপনন্দন।"

সুতরাং দেবদত্ত প্রথমে এদেশে আসিয়া হরিহর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তটে বর্ত্তমানকালে হরিহর নামে কোনও গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় না। বহরমপুরের কয়েক ক্রোশ পূর্ব্বে ভৈরব নদের পশ্চিম তটে হরিহরপাড়া নামে একটি গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে। তথায় একটী চৌকী অর্থাৎ মুনসেফী আদালত ছিল। সন ১৮৯৪ সালে তথা হইতে মুনসেফী উঠিয়া গিয়াছে। উত্তর কালে দত্তবংশের গ্রাম তালিকা বর্ণনকালে দেখা যায়—

"হরিহরপাড়া না পাই দেশে দেখি সকল রাঢ়।"

সুতরাং হরিহরপাড়া ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারেই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক দেবদত্ত অধিককাল হরিহরপাড়ায় বাস করেন নাই। কান্দী-রাজবাটীর কারিকায় দেখা যায়, রাজমন্ত্রী যেমন অনাদিবর সিংহ, সোমঘোষ, পুরুষোত্তম দত্ত ও সুদর্শন মিত্রকে বাসস্থান ও অধিকার ভূমি দিয়াছিলেন, সেইরূপ বরুটিয়া গ্রামে গিয়া দেবদত্তকে উক্ত গ্রামে বাসস্থান ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।(১) সকলেই যখন গঙ্গার পশ্চিম পারে রাঢ়দেশে স্থান গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি একাকী গঙ্গার অপর পারে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

সদানন্দ ঘটকের কুলকারিকায় হরিহরপাড়ার উল্লেখ দেখা যায় না। তিনি দেবদত্তকে একেবারে বরুটিয়া বা 'দত্তবড়্যা' গ্রামে আনিয়াছেন।

"খ্যাতি মহাত্মা দেউদত্ত। ছিল মায়া মহাতীর্থ॥
বার বরেট্টা কৈল স্থিতি। দত্তবড়্যা হৈল খ্যাতি॥"

উত্তরকালে যে কুল-মর্য্যাদা নির্ণয় করা হয় তদনুসারে দেবদত্তের বংশধরগণের স্থান উক্ত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণের স্থান মধ্যে সকলের শেষে। কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

(১) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, ১ম খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

"বাৎস্য সৌকালীন কুলযুগলং। পৃথ্বীবিখ্যাত কক্ষা বিমলং ॥
তদনুজ মৌদ্গল্য কুলভাবঃ। কুল করণাদপি কুলগত লাভঃ ॥
তদনুজ বিশ্বামিত্র দত্ত। ত্রিকুলী করণে কর্ম্ম মহত্ত্ব ॥"

কুলমর্য্যাদায় ন্যূন হইলেও শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিতে দত্তবংশ এক সময়ে বাঙ্গলা দেশের সকল কায়স্থের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই দত্তবংশ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সমগ্র গৌড়দেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রভুত্ব অনেকের ঈর্ষার কারণ হওয়ায় তৎকালীন সমাজ সম্ভবতঃ বিনয়ের অভাব হেতু সমাজের কিছু নিম্নস্তরে তাঁহাদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। যাহাই হউক চিরতেজস্বী দত্তবংশ স্বীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তিবলে সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সম্মান আদায় করিয়াছিলেন। দেবদত্তের প্রপৌত্র তপনদত্ত 'মণ্ডল' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি স্বীয় ক্ষমতায় অন্যূন ৪০০ শত গ্রামের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

'বিংশতি খণ্ডেতে ডিহি এক হয়। বিংশতি ডিহিতে এক মণ্ডল নিশ্চয় ॥"

কাপ ও তপন দুই ভ্রাতার মধ্যে তপনের বংশই বিশেষ বিখ্যাত। তপনের প্রপৌত্র যাদবের সময়ে গৌড়েশ্বর বল্লালসেন সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বল্লালমন্ত্রী ব্যাস সিংহ বল্লালের এই সমাজসংস্কার স্বীকার করিতে সম্মত না হওয়ায় করাত দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল। দত্তবংশতিলক যাদবের পুত্রগণও বল্লালের এইরূপ সমাজবন্ধন স্বীকার না করায় বল্লাল প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া যাদবের ১০ পুত্র ও ৭ পৌত্রকে বিনাশ করিলেন।(২) যাদবের তৃতীয় পুত্র মহেশ্বরের গর্ভবতী পত্নী এইরূপে পতিপুত্রহীনা হইয়া প্রাণভয়ে জনৈক আগুরীর বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় তাঁহার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। উক্ত পুত্রের নাম উবারু। কোন কোন কাগজে উভারু নাম দেখা যায়।

এই উবারু দত্ত হইতেই দত্তবংশ-ধারা রক্ষিত হইল। উবারু দত্তের বংশ সম্বন্ধে এইরূপ সদানন্দের কুলকারিকা পাওয়া যায়—

"উবারুসুত কুলপতি। সেই হইল কুলে কৃতী ॥
তার পুত্র কবিদত্ত। সবে গায় যার মহত্ত্ব ॥
কবির হইল নয় নন্দন। রবি দামু ব্যাস বামন ॥
রুদ্র শ্রীধর ঈশ্বর পরে। বিশ্বেশ্বর ভূধর ধরে ॥
রবি হইল দত্তখান্। রণে গণে কীর্ত্তিমান্ ॥
যে পাইল গুয়া বাটা। তার হইল তিন বেটা ॥
বিভাকর দত্তখান্। জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান্ ॥
প্রভাকর অনুজ তার। দিবাকর ছোট সভার ॥
প্রভাকর উত্তরে গেলা। বহু ভূমি লাভ কৈলা ॥

(২) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠায় প্রাচীন কুলকারিকা দ্রষ্টব্য।

বাদশাহের দক্ষিণ হস্ত। অসি মসি উভয় তুরন্ত ॥
সোমদত্ত তার সুত। তেজ ধরে অদ্ভুত ॥
তার বেটা শিব নাম। অশ্বঘাটে কৈলা ধাম ॥
তার পুত্র পুণ্যবান্। শ্রীগণেশ দত্ত খান ॥
রঘুপতি মল্লিকে কন্যা। বিভা দিয়া হৈলা ধন্যা ॥
নিজ তেজে গৌড়ের রাজা। সভে যারে কৈল পূজা ॥
তস্য সুত যদুনাথ। অকাল কুষ্মাণ্ড হইল জাত ॥
হইল তার জাতিপাত। পৈতৃক ধর্ম্ম কূপোকাত ॥
বিভাকর সুত সৃষ্টিধর। যুধিষ্ঠির হেন খ্যাতি যার ॥
তার জন্মিল চারি আনন্দ। বিদ্যা মাধো কৃপা আর ব্রহ্মানন্দ ॥
বিদ্যানন্দ খ্যাতি সর্ব্বেশ্বর। দত্তকুলের প্রধান ঘর ॥
ঈশান পরমেশ্বর দুই। পুত্র ধন্য লিখে থুই ॥”

অর্থাৎ উবারুর পুত্র কুলপতি, কুলপতির পুত্র কবিদত্ত। কবিদত্তের ৯টি পুত্র—রবি,দামোদর, বামন,ব্যাস,রুদ্র,শ্রীধর,ঈশ্বর, বিশ্বেশ্বর ও ভূধর। রবিদত্ত গৌড়েশ্বরের অধীনে ফৌজদার ও সেনাপতির পদে কার্য্য করিয়া 'দত্তখান্' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি পুত্র—বিভাকর, প্রভাকর ও দিবাকর। তাঁহারা কয়েক পুরুষ যাবৎ সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিয়া দত্তখান উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রভাকরের গুণপণা সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে—'অসি মসি উভয় তুরন্ত।' অর্থাৎ লেখাপড়া এবং অস্ত্রচালনা উভয় বিদ্যায় তিনি উপযুক্ত ছিলেন। প্রভাকর দত্তখানের পুত্র সোমদত্ত খান, তৎপুত্র শিবদত্ত খান ও তৎপুত্র সুবিখ্যাত গৌড়াধিপতি রাজা গণেশ দত্ত খাঁ। তৎপুত্র যদুনাথ জাতিধর্ম্ম ত্যাগ করায় তৎপরবর্ত্তী বংশধারা কুলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

সদানন্দ রবিদত্ত খানের অনুজ দামোদরের এইরূপ কুলকারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

“রবির অনুজ দামোদর। অস্ত্রে শাস্ত্রে মহা ধনুর্ধর ॥
হরিহর তার কোঙর। খ্যাত পুত্র যার ঈশ্বর ॥
কেশু বিশু পুত্র যার। মহামান্য কুলের সার ॥
অশ্বঘাটে বিষ্ণু দত্ত। উচ্চপদে সুপ্রতিষ্ঠিত ॥
মহামান্য রাজখ্যাতি। উত্তরে হইল সভাপতি ॥
আত্মীয় কুটুম্ব কত শত। বিশু দত্তের হইল শরণাগত ॥
কান্দী পাঁচথুপী জাম্বা কুলাই। মহাকুলীন লেখা জোখা নাই ॥
সভে করিতে চায় দত্ত সঙ্গ। মধুচক্রে যেমন কুল ভৃঙ্গ ॥
বিষ্ণুর সুত জগদীশ। মহাদাতা দনুজাধীশ ॥
তস্য সুত রামনাথ। করণ কারণে অবদাত ॥

প্রাণনাথ ভগবান্। দুই পুত্র গুণবান্॥
দুহে দুই রাজ্যপাট। উত্তর দক্ষিণে হইল সাট॥
প্রাণনাথ গৌড়ে গেলা। ভগবান্ উত্তরে রহিলা॥
প্রাণনাথের উভয় নন্দ। পুরুষোত্তম আর কৃষ্ণানন্দ॥
গৌড়েশের প্রধান মন্ত্রী। পুরুষোত্তম বিষম তন্ত্রী॥
তাহার পুত্র ধন্য সন্তোষ। সদাই যার পরিতোষ॥
কৃষ্ণপুত্র কানু নরু। ধনে দানে কল্পতরু॥
কানুরামে বংশ পাই। নরোত্তমে বংশ নাই॥
কানুরামে রাজ্য নাশ। ভগবানে সুপ্রকাশ॥
অশ্বঘাটের অধিকারী। রাজা ভগবান নামধারী॥
তার পুত্র রূপরাম। সকল গুণের ধাম॥
তস্য পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্রে সমাপ্ত॥
শ্রীমন্তের কন্যা বিভা করি। ঘোষবংশ দণ্ডধারী॥
ধন্য রাজা শুকদেব রায়। দেশ বিদেশে মহিমা গায়॥"

রবিদত্তের অনুজ দামোদর, তৎপুত্র হরিহর ও তৎপুত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর দত্তের দুই পুত্র কেশব (কৃষ্ণ) দত্ত এবং বিশু (বিষ্ণু) দত্ত। ঘটকের কাগজে তাঁহাদিগের নাম কিশু বা কেশ ও বিশু বলিয়া একাধিক স্থানে লিখিত দেখা যায়। এই কেশ দত্ত হইতে সুবিখ্যাত পাটুলি-রাজবংশ উদ্ভব। কালে এই কেশ দত্তের বংশ পৃথক্ হইয়া বাঁশবেড়িয়া, সেওড়াফুলী, বালি, শিবপুর ও রাজহাটবাসী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুদত্ত হইতে দিনাজপুর-রাজবংশের উৎপত্তি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র করিয়াছিলেন।

কবি দত্তের তৃতীয় পুত্র বামনের জ্যেষ্ঠ পুত্র থাক দত্ত ভাগলপুর প্রদেশের কানুনগো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে থাক সেরেস্তার কর্ম্ম করিয়া থাক দত্ত মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ থাক দত্ত ছিলেন লস্কর দত্ত। তাঁহার জামাতা শ্রীরাম ঘোষ উক্ত পদ লাভ করিবার পর হইতে শ্রীরামের বংশধরগণ 'মহাশয়' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

এক দিকে ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্যে, অপর দিকে ত্যাগ ও ভক্তি শিক্ষায় যে দত্তবংশ এক কালে দেশের অগ্রণী হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের কীর্ত্তি এখনও দেশের বহু স্থানে বিরাজমান রহিয়া অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে, যাঁহাদিগের প্রদত্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহত্তর ভূমি লাভ করিয়া এদেশের বহু শত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পুরুষানুক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন এবং কেহ কেহ এখনও দিনপাত করিতেছেন, সেই পুণ্যশ্লোক দত্তবংশের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও লেখনী সম্বরণ করিতে হইল। যথাসম্ভব স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইবে মাত্র।

কাশ্যপ গোত্রে দত্ত বংশ ১ দেব দত্ত, তৎসুত ২ আদিত্য দত্ত, তৎসু
৩ তপনদত্ত (মণ্ডল)
৫ বুচান, সুত ৬মধুসূদন
হন
১৪ সৃষ্টিধর (বিনাম যুধিষ্ঠির)
১৫সর্ব্বেশ্বর মাধবানন্দ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দ হরিশ্চন্দ্র রামেশ্বর ৮মহেশ্বর
(বিদ্যানন্দ)
১৬পরমেশ্বর ঈশান
রামকিশোর যুগল মণিরাম মোহনচন্দ্র
১৭কাশী ভুবন কীর্ত্তি বাণেশ্বর
১০ রবিদত্তখান্ দামোদর বামন
হরিহর
১৩ বিভাকর প্রভাকর দিবাকর
থাক ভৃগু ভাগনাথ বিভাগ
২০ রাজা শ্রীমন্ত দত্ত
১৪ঈশ্বর
১৪সৃষ্টিধর
১৪জানকীনাথ
১৫রাজা বিষ্ণুদত্ত (বিশু)
২১ হরিশ্চন্দ্র কন্যা = রাজা শুকদেব
১৪মুকুন্দানন্দ মহেশ্বর সোমদত্ত
১৫ কেশব(কৃষ্ণ)বিশু (বিষ্ণু)
১৫রামকৃষ্ণ
১৬ জগদীশ
১৫ রামকৃষ্ণ
১৫ শিবদত্তখান
১৬ দেবীচরণ
১৭ রামনাথ
১৬ রাজা গণেশদত্তখান্
১৭ কৃষ্ণবল্লভ
১৭ যদুনাথ (জাত্যন্তর)
১৮প্রাণনাথ
রাজা ভগবান্
১৮ নিধিরাম
১৪ মহেশ্বর
১৯ রাজাকৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম
১৯রূপরাম
কৃষ্ণপ্রসাদ ১৯লস্করদত্ত ভরত
সন্তোষ
২০ রাজা শ্রীমন্ত
শ্রীনাথ ১৭ রামানন্দ বিশ্বেশ্বর ২০ঠাকুর নরোত্তম কানু
কন্যা = মহাশয় শ্রীরাম ঘোষ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরামপুরের দত্তবংশ বিভাকরের ধারা

বিভাকর দত্তখাঁ দত্তবড্যা বা বরুটিয়া হইতে গিয়া ঠেঙ্গাপুর বা বিরামপুরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অনেকে এখনও তথায় বাস করিতেছেন। এই বিরামপুর বা বিরহিমপুর গ্রামে বাস করিবার বিষয়ে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা রহিয়াছে। একদা বরুটিয়া গ্রামে সংক্রামক ব্যাধি হইয়া লোকক্ষয় আরম্ভ হইলে প্রবলপ্রতাপান্বিত দত্তখাঁগণ উক্ত গ্রাম ত্যাগ করিয়া ৩ মাইল দক্ষিণে একটি গ্রামে বাস করিতে ইচ্ছা করেন ও নবাবের নিকট হইতে অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে দত্তখাঁ স্বীয় সৈন্যদিগের সাহায্যে উক্ত মনোনীত স্থানটী বলপূর্ব্বক অধিকার করেন এবং অধিবাসিগণকে ঠেঙ্গাইয়া তাড়াইয়া দেন। এজন্য উক্ত গ্রামের নাম সাধারণ লোকে ঠেঙ্গাপুর বলিত, কিন্তু সেরেস্তায় লেখা হইল বে-রহমপুর (রহম্=দয়া, বে=হীন) অর্থাৎ নিষ্ঠুর পুরী। এই বেরহমপুর কালে বিরহিমপুর ও বিরামপুরে পরিণত হইয়াছে।

এখানে আসিয়া দত্তখাঁগণ ৺রাধাকান্তজিউ বিগ্রহের সেবা স্থাপন করেন এবং দিনে অন্ন ও রাত্রে লুচি ভোগের ব্যবস্থা করেন। উক্ত সেবা পরিচালন জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে সালঙ্কারা ধাতুময়ী রাধামূর্ত্তিটি চুরি হইলে দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে একটি পুষ্করিণীর মধ্যে পূর্ব্ব মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়। এক্ষণে ঠাকুরের দুই পার্শ্বে দুইটি রাধা মূর্ত্তির সেবা হইয়া থাকে। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর হইতে গ্রামে কোনও মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা হয় না। বিভাকর দত্ত বংশীয় ব্যতীত এই গ্রামে আরও অনেক দত্তবংশ রহিয়াছেন; তাঁহাদেরও দেবসেবা রহিয়াছে। এই দত্তবংশের দৌহিত্র এবং মল্লিক প্রয়াগ ঘোষ বংশীয় সুজন মল্লিক একজন ভক্ত বৈষ্ণব ও সুগায়ক ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া রসিক দাস সুজন মল্লিকের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই গ্রামে বৎসরে একবার করিয়া চব্বিশ প্রহর কীর্ত্তনের ও তৎসহ বহু বৈষ্ণব ও দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিরামপুর দত্তবংশ
বিভাকরের জ্যেষ্ঠপুত্র
বিদ্যানন্দের ধারা
১৩ বিভাকর দত্তখাঁ সুত ১৪সৃষ্টিধর (বিঃ যুধিষ্ঠির)
(৭২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৫ সর্ব্বেশ্বর (বিদ্যানন্দ)
মাধবানন্দ ১৫কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দ
১৬ গোবিন্দ
১৬ পরমেশ্বর ১৬ ঈশান
১৭ রাঘবরাম
১৭ বৈকুণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ
১৮ জগদানন্দ
১৯ গিরিরাম
১৮ ভগবান্ গঙ্গারাম
২০ শ্রীনাথ
১৯ শ্রীরাম কৃষ্ণরাম কানুরাম কল্যাণ)
২০ নন্দরাম
২১ ব্রজকিশোর যুগলকিশোর ভুবনমোহন (বিঃ ভূধর)
২২ রাধামাধব রাধাকৃষ্ণ
২২ রাধারমণ (বিঃ রাজীবলোচন)
২২ গোপীচরণ কৃষ্ণবিহারী
২৩ রাজারাম
২৩ হরগোবিন্দ
২৪ গোপালচরণ দত্ত মজুমদার
২৪ প্রাণবল্লভ জীবনবল্লভ গোরবল্লভ
২৫ রাধাপ্রসাদ
২৫ প্রতাপচন্দ্র (চাণক, মুর্শিদাবাদ)
২৬ হরিপ্রসাদ
২৬ পূর্ণানন্দ ত্বরিতানন্দ জগদানন্দ বগলানন্দ
২৭নবকিশোর ২৭ রামধন ২৭ কৃষ্ণমোহন
২৭ সৌরেন্দ্র
২৮ জগবন্ধু কৃষ্ণলাল
২৮ চন্দ্র কিশোরী
২৭জ্যোতিরিন্দ্র বীরেন্দ্র অর্দ্ধেন্দু
২৯ নিবারণ
২৭শৈলেন্দ্র শিশির অনিল
২৮ ভুবন মধু নিতাই
২৯ পূর্ণ শরৎ হেম কৃষ্ণ ২৯গোবিন্দ ধরণী
৩০ সত্যেন্দ্র গিরিজা
জিতেন্দ্র
৩০ নন্দিনী সুধীর যোগনাথ মনোরঞ্জন

বিরামপুর দত্তবংশ
বিভাকরের ধারা
১৯ কানুরাম (কল্যাণ) (৭৪পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
২০ নন্দকুমার
২১ রামপ্রসাদ
২২ লোকনাথ
২৩ শ্রীনাথ
২৪ শ্রীকৃষ্ণ
লক্ষ্মীনারায়ণ
২৫ রাজবল্লভ
২৫ প্রাণবল্লভ
পরমানন্দ
২৬ নব
কুশল
ভজরাম
সান্তারাম
২৬ রামপ্রসাদ
২৭ রাধাকৃষ্ণ
বংশীবদন
বৈষ্ণবচরণ
কৃষ্ণলাল
২৮ বৈদ্যনাথ
২৯ রাজকিশোর
নবকিশোর
গদাধর
২৭ জগ
রাধা
চাঁদ
দর্পনারায়ণ
ব্রজ
লক্ষ্মীকান্ত
শিবরাম
(সহস্ররাম)
২৮ শম্ভুনাথ
২৮ বলরাম
চাঁদগোবিন্দ
(বিঃ কৃষ্ণগোবিন্দ)
২৯ দোলগোবিন্দ
২৯ গুরুচরণ
দীনদয়াল
২৮ মদনমোহন
২৮ হরিমোহন
২৯ রামনারায়ণ
২৮ ভাইমোহন
ভুবন
শ্যাম
স্বরূপ
রূপ
(বিঃ নারায়ণ)
২৯ বৈকুণ্ঠ
রাধাকান্ত

বিরামপুর দত্তবংশ

বিভাকরের ধারা

১৫ সর্ব্বেশ্বর দত্তখাঁ (৭৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

১৬ ঈশান

১৭ ভুবনেশ্বর (বাস চিরোল) ১৭ কাশী (বাস সিরুড়) ১৭ কীর্ত্তিশ্বর (খাজুরডি) ১৭বাণীশ্বর (সিরুড়ি)

১৮ চণ্ডীচরণ

১৯ শ্রীচন্দ্র

২০ হরিরাম ২০ আভরাম রঘুরাম

২১ প্রাণবল্লভ

২২ অযোধ্যারাম

২৩ নিমাইচাঁদ (দক্ষিণখণ্ড)

২১ রামদত্ত সরকার হরানন্দ রামশরণ রাজবল্লভ বৃন্দাবন

২২ গঙ্গানারায়ণ ২২ রাধাকৃষ্ণ দত্ত (বিঃ ভিখারী)

২৩রাম রাঘব কেশী দেবী ২৩রাজবল্লভ

২৪ কিশোর ২৪নন্দরাম

২৫ চণ্ডীচরণ

২৬ কমলাকান্ত

২৭ কৃষ্ণকান্ত (পাঁচথুপী)

বিভাকরের ধারা

☞৭৭ পৃষ্ঠায় নিম্ন ব্যক্তিগণের পূর্ব্বপুরুষের নাম দ্রষ্টব্য

বিরামপুর দত্তবংশ বিভাকরের ধারা

১৯ হরিনারায়ণ (৭৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
২০শ্যামসুন্দর
২০ গৌরচরণ
২০ ব্রজকিশোর
২০ গুরুপ্রসাদ
২০ শুকদেব
২১রামকৃষ্ণ
হরেকৃষ্ণ
জগন্নাথ
প্রাণকৃষ্ণ
২১নিতাই
২১গোকুল
২১ বিশ্বম্ভর
২১চৈতন্যচরণ
২১রাধাকান্ত
গোপীকান্ত
জগন্নাথ
২১বলরাম
ব্রজকৃষ্ণ
২২রামলোচন
(বিঃ নকড়ি)
দীননাথ
বৈদ্যনাথ
মুলুকচাঁদ
২২ বিনোদ
২২ কৃষ্ণমঙ্গল
২২উৎসবানন্দ
২২অনূপ
ফকির
২৩ হরগোবিন্দ
২৩কৃষ্ণপ্রসাদ
২৩শ্রীকণ্ঠ
গদাধর
নদীয়াচাঁদ
কুঞ্জবিহারী
লালবিহারী
২৩ শিবচন্দ্র
২৩বেণীমাধব
রামচরণ
গোবিন্দ
২৪কাশীনাথ
২৪গৌরসুন্দর
২৪বিশ্বম্ভর
২২ স্বরূপ
চাঁদ
রাজকিশোর
জাবন
বামনহরি
২৪শ্রীনাথ
গয়ানাথ
২৪ বংশধর
হীরালাল
২৫কালীপ্রসাদ
নিতাইসুন্দর
২৪নীলমাধব
রামধন
(দত্তকগত)
২৩কালীচরণ
১৭ জানকীনাথ
২৫ইন্দুভূষণ
ফণী
২৬ গোপীমোহন
২৫ শ্যামসুন্দর
২৪ রতিকান্ত
২৬রাখালদাস
১৮ কালিদাস
১৮ গৌরীনাথ
ক্ষেত্রনাথ
২৫শ্রীনিবাস
পরাণ
২৫দ্বারিকানাথ
১৯ রাম
১৯লক্ষ্মণ
১৯ভগবত
১৯ শত্রুঘ্ন
২৬ ঈশ্বরচন্দ্র
গিরিশ
উমেশ
২৬সারদা
২৬নবীন
২০ রামগোপাল
নন্দলাল
হরিশ্চন্দ্র
২৭ বগলা
২৭ পূর্ণচন্দ্র
২৭ অক্ষয়
রামকানাই দরকার
২১ নিতাইসুন্দর সরকার
চৈতন্যচরণ সরকার

বিরামপুর দত্তবংশ প্রভাকরের ধারা মহেশ্বর দত্তের বংশলতা

১৩ প্রভাকর দত্তখাঁ (৭২পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

মুকুন্দানন্দ ১৪ মহেশ্বরদত্তখাঁ সোমদত্তখান্

শ্রীনাথ ১৫ রামানন্দ বিশ্বেশ্বর শিবদত্তখান্

রাজা গণেশদত্ত খান্

১৬ বিনায়ক, সুত ১৭ কৃত্তিবাস

১৮ মুকুন্দানন্দ

১৯কনক নয়নচাঁদ জয়ানন্দ পদ্মলোচন রত্নেশ্বর

২০ লালজি দত্ত খাঁ

২১ পারশনাথ কানাইলাল পঞ্চানন বলরাম

২২ হরনাথ রাধানাথ

২২ হীরালাল মাধব কেশব রঙ্গলাল ২৩ জয়ানন্দ

২৪ লক্ষ্মীনাথ

২৫ মদন ভীমচাঁদ বসন্ত

২৬ বৈদ্যনাথ

২৭ উদয় গোকুল

২৮ জয়নারায়ণ

২৮ মুলুকচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ফতেচন্দ্র

২৯ বলরাম দীপচাঁদ জ্ঞানচাঁদ ২৯ বালচন্দ্র বসন্ত

২৯প্রীতিচন্দ্র গম্ভীরচন্দ্র হুলাষচন্দ্র তর্পণচন্দ্র

৩০ খড়্গসেন চণ্ডীচরণ

৩০ রাধাকান্ত

আত্মারাম খেলারাম

৩১শিবলাল

৩১ সীতারাম উমানাথ শ্যামলাল

গৌড়েশ্বর গণেশ দত্ত খান্

(প্রভাকর দত্ত-পুত্র সোমদত্ত খানের ধারা)

যে সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানপ্রভাব, যে সময়ে সমস্ত গৌড়বঙ্গে অপ্রতিহত মুসলমান শাসন, যে সময়ে মুসলমান রাজপুরুষগণ হিন্দুর প্রভাব ধ্বংস ও হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য লোলুপদৃষ্টি করিতেছিলেন, দীর্ঘকাল মুসলমান-শাসনে হিন্দুগণ নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইয়া মুসলমানদিগের মুখাপেক্ষী হইয়াছিল, যে সময়ে সম্ভ্রান্ত, নিষ্ঠাবান্, ধনশালী হিন্দুমাত্রেই মুসলমানের নিগ্রহ ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত ছিলেন, হিন্দুর সেই দুর্দ্দিনে একজন মহাপুরুষ হিন্দুসমাজরক্ষার জন্য, হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন। হিন্দুকুলতিলক ছত্রপতি শিবাজী যাহা করিতে পারেন নাই, হিন্দুকুলগৌরব মহারাজ প্রতাপাদিত্য বা রাজা সীতারাম রায় যাহা করিতে পারেন নাই, রাজা গণেশ সেই অসাধ্য-সাধন করিয়া গৌড়দেশে হিন্দুসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যে মহাপুরুষ নিজ ভুজবলে অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রভাবের পরিচয় দিয়া মুসলমানের করাল কবল হইতে গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া স্বাধীন বাদসাহরূপে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রিয়াজ্-উস্-সলাতীন্, ফেরিস্তা, লাউরিয়া কৃষ্ণদাস রচিত সংস্কৃত বাল্যলীলাসূত্রে ও ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশে সেই মহাবীর গণেশের রাজ্যাধিকারের কথা উল্লিখিত থাকিলেও এই মহাপুরুষের আভিজাত্য ও কুলশীলের পরিচয় উক্ত গ্রন্থসমূহে বিবৃত হয় নাই। কেবলমাত্র নাম লক্ষ্য করিয়া নানা ব্যক্তির লেখনীতে নানাপ্রকার কবিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে।

রাজা গণেশ সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত মত প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এখানে দুই একটির উল্লেখ করিতেছি।

ভ্রান্ত মত

১। রিয়াজ্-উস্-সলাতিন্ গ্রন্থে পারসী লেখার দোষে রাজা গণেশ 'কাঁস' বা 'কানিস' নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া কেহ কেহ রাজা গণেশ ও তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

২। রিয়াজ্ হইতে জানা যায়, রাজা গণেশ প্রথমতঃ ভাতুরিয়ার জমিদার ছিলেন। ভাতুরিয়া শব্দের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ভাতুরিয়ার প্রকৃত নাম ভাদুড়িয়া বা চাক্লা ভাদুড়িয়া। তাঁহাদের মতে ভাদুড়ীবংশীয় জমিদারের নাম হইতে ভাদুড়িয়া নাম হইয়াছে। এই ভাদুড়িয়া মত সমর্থক কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ইলিয়াস্ শাহ যখন দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গৌড়াধিপ বঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমিদারদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তৎকালে উত্তরবঙ্গে কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভাদুড়ী ও সান্ন্যাল বংশ বিশেষ

সম্মানিত ছিলেন। সেই সময়ে শিকাই সান্ন্যাল ও সুবুদ্ধি ভাতুড়ী গৌড়েশ্বরের পক্ষে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিকাই সান্ন্যালের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যবান্ ওরফে প্রিয়দেব এবং সুবুদ্ধি ও তাঁহার দুই ভ্রাতা ফৌজদার পদে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইলিয়াস্ বজ্র-যোগিনীর ফুলমতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফুলমতীর গর্ভে মৈজুদ্দীনের জন্ম। মৃত্যুকালে ইলিয়াস্ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। কিন্তু ইলিয়সের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াস্-উদ্দীন বহু সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সত্যবান্ সান্যালের পুত্র কংসরাম মৈজুদ্দীনের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কংসরাম সান্যাল ও মধু খাঁ ভাতুড়ী মৈজুদ্দীনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে গিয়াস্-উদ্দীন্ নিহত হন। কংসরাম অভিভাবকরূপে ? বৎসর কাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। পরে মৈজুদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কংসরাম রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে মৈজুদ্দীন বিষপ্রয়োগে কংসরামকে বিনাশ করিয়া সেকেন্দর-শাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি সান্যালদিগের সাঁতোর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। সেকেন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্-উদ্দীন বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। ভাতুড়ীবংশের প্র তি তাঁহার বিশেষ সুদৃষ্টি ছিল। কিন্তু শেষে ভাতুড়ীদের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। ভাতুড়ীরা তৎপুত্র সৈফ্-উদ্দীন্‌কে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। সৈফ্-উদ্দীন রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না, ভাতুড়ীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সৈফ্-উদ্দীনের দুই পুত্র নসরিত ও আজিম। নসরিত বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত আজিম আপনাকেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। ভাতুড়ীরা আজিমের পক্ষ ও মুসলমানেরা নসরিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভাতুড়ীবংশে গণেশনারায়ণ ও সান্যালবংশে অবনীনাথ প্রধান ছিলেন। অবনীনাথের কন্যার সহিত গণেশের পুত্র যদুনারায়ণের বিবাহ হয়। নসরিত মুসলমান আমীরগণের সাহায্যে দ্বিতীয় সাম্‌সুদ্দীন্ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আজিম সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া ভাতুড়ী ও সান্যালগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গণেশ তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি আসিয়া সসৈন্যে যোগদান করিবার পূর্ব্বেই নসরিত আসিয়া আজিমকে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে আজিম পরাজিত ও অবশেষে নিহত হন। এদিকে গণেশ দ্রুতবেগে গৌড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন নগর রক্ষা করিবার কেহ ছিল না। গণেশ সহজেই নগর দখল করিলেন। এদিকে বিজেতা নসরিতও গণেশের গৌড়াধিকারের সংবাদ পাইয়া দ্রুতবেগে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গণেশের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে নসরিত নিহত হইলেন। আজিমের আস্‌মান্‌তারা নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত উত্তরাধি-কারী বলিয়া স্বীকার করা হইল না। গণেশই বঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন ও ৭ বৎসরকাল রাজত্ব করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে যদু বাঙ্গলার রাজা হইলেন। তিনি

আজিমের কন্যা আস্মান্‌তারাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র অনুপনারায়ণ ভাতুরিয়া জমিদারীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। *

রাজা গণেশ সম্বন্ধে আরও অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কাহিনী অনেকে বিশ্বাস করেন বলিয়াই উপরে লিপিবদ্ধ হইল। উক্ত কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাতুড়িয়া হইতে ভাতুরিয়া কিছুতেই হইতে পারে না। যে স্থান লইয়া প্রধানতঃ ভাতুরিয়া ধরা হয়, সেই বারেন্দ্র বা রাজশাহী অঞ্চলে কোথাও 'দ' স্থানে 'ত' উচ্চারিত হয় না।

সমসাময়িক ঘটনা লক্ষ্য করিলে এবং বারেন্দ্রব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকা আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে,—ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ ও তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দুই জনে ভিন্ন ব্যক্তি। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থানুসারে রাজা গণেশ দত্তখান রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক মহেশ্বর দত্ত হইতে অধস্তন ৯ম পুরুষ এবং রাজা কংসনারায়ণ বল্লালসেনের সমসাময়িক মৌনভট্ট হইতে অধস্তন ২১শ পুরুষ হইতেছেন। শিকাই সান্ন্যাল ও সুবুদ্ধি ভাদুড়ীকে ইলিয়াস্‌শাহের সমসাময়িক এবং সত্যবান্‌কে শিকাই সান্যালের পুত্র ও সত্যবানের প্রপৌত্র অবনীনাথকে রাজা গণেশের পুত্র যদুর শ্বশুর বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে' মনগড়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পনা-প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। একান্ত দুঃখের বিষয় যে, কোন কোন ঐতিহাসিক মূল কুল-গ্রন্থের অনুবর্ত্তী না হইয়া কল্পিত বিবরণের অনুসরণ করিয়াছেন। শিকাই সান্যাল ইলি-য়াস শাহের সমসাময়িক বটে এবং সত্যবান্ তাঁহার বংশধর হইলেও তাঁহার পুত্র নয়, তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষ হইতেছেন। অর্থাৎ শিকাই সান্যাল বল্লালসেনের সমসাময়িক লক্ষ্মীধর সান্যালের ৯ম পুরুষ অধস্তন এবং সত্যবান্ ১৭শ পুরুষ অধস্তন হইতেছেন। ইরূপে সুবুদ্ধি ভাদুড়ী শিকাই সান্যালের সমসাময়িক না হইয়া শিকাই সান্যালের সমসাময়িক উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর ৯ম পুরুষ অধস্তন হইতেছেন অর্থাৎ বল্লালসেনের সমসাময়িক ক্রতু ভাদুড়ী হইতে সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ী ১৮শ পুরুষ অধস্তন হইতেছেন। †

☞ তুলনায় আলোচনার সুবিধা হইবে ভাবিয়া পরপৃষ্ঠায় বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা অনুসারে বংশলতা প্রদত্ত হইল—

* দুর্গাচন্দ্র সান্যালের বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—এবং Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, by Nalinikanta Bhattasali, p. 81—86.

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, ২৮, ৪৯, ৬২, ৬৩ ও ৯৩পাতায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।

১ লক্ষ্মীধর সান্যাল
(বল্লালসেনের সমসাময়িক)
২ বর্দ্ধমান মিশ্র
৩ বাসুদেব আচার্য্য
৪ মেধাতিথি
৫ নরসিংহ
৬ মহেশ্বর
৭ বাপী
৮ ভূতনাথ
৯ শিকাই সান্যাল
১০কানাই বলাই পিয়াই
১১ আনাই
১২ চামরাই
১৩ শ্রীপতি
১৪দেবাই কামাই সত্যবান
১ কৈতে বা ক্রতু ভাহুড়ী
(বল্লালসেনের সমসাময়িক)
২ সঙ্কর্ষণ
৩ ভৃগু বা ভল্লুকাচার্য্য
৪ যোগেশ্বর
৫ পুণ্ডরীক বা পুণ্ডরীকাক্ষ
৬ বিশ্বম্ভর আচার্য্য
৭ লক্ষ্মীপতি আচার্য্য
৮ বৃহস্পতি আচার্য্য
৯ উদয়নাচার্য্য ভাহুড়ী
১০ পশুপতি
১১ খগাই
১২ কাথাই
১৩ বলভদ্র
১৪পিথাই
১৫ অংশুমান
১৬ মুকুন্দ
১৭ শ্রীকৃষ্ণ
১৮ সুবুদ্ধিখাঁ কেশবখাঁ জগদানন্দ রায়
১৯ জনার্দ্দনচাঁদরায়দুর্গাদাসশ্রীদাস দেবীবিষ্ণুহেমাঙ্গ
১ মৌনভট্ট
(বল্লালসেনের সমসাময়িক)
২ জ্ঞানানন্দ
৩ ভুবনানন্দ
৪ কনকদণ্ডী
৫ যদুওঝা
৬ বেদওঝা
৭ ত্রিলোক বা ত্রিকালাচার্য্য
৮ গঙ্গাদাস
৯ দিবাকর
জগদ্‌গুরু
১০ পুরুষোত্তম
বেদান্তী
কুল্লুকভট্ট
১১ নাভভট্ট
১২ শশীকুলীন
১৩ সঙ্কর্ষণ
১৪ নন্দন
১৫ বামন
১৬ কন্দর্প
১৭ কামদেব
১৮ বিজয় লস্কর
১৯ রাজা উদয়নারায়ণ
২০ হৃদয়নারায়ণ
(বড় ঠাকুর)
বিজয়নারায়ণ
হরিনারায়ণ
(ছোট ঠাকুর)
২১ রাজা কংসনারায়ণ

রাজা গণেশের প্রকৃত পরিচয়

রিয়াজ-উস্-সলাতিন হইতে জানা যায়, রাজা গণেশ সমস্ত ভাতুরিয়ার জমিদার ছিলেন। আইন-ই-আক্‌বরীতে ভাতুরিয়া সরকার বাজুহার অন্তর্গত একটি পরগণা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রেনেল্ সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে ভাতুরিয়া ভূভাগের যে সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের অধিকাংশ স্থান বলিয়া মনে হয়। উক্ত মানচিত্র অনুসারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নদীয়া জেলার উত্তরাংশ হইতে মালদহ জেলার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত ধরিয়া লইতে হয়। দিনাজপুর জেলা ইহার বাহিরে পড়ে। এ অবস্থায় ভাতুরিয়ার কোন স্থানে অথবা দিনাজপুরের কোন স্থানে গণেশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাই এখন বিবেচ্য। পূর্ব্বেই সদানন্দের কারিকা হইতে লিখিত হইয়াছে —

"রবি হৈল দত্ত-খান্। রণে গণে কীর্ত্তিমান্॥
সে পাইল গুয়া বাটা। তার হইল তিন বেটা॥
বিভাকর দত্ত-খান্। জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান্॥
প্রভাকর অনুজ তার। দিবাকর ছোট সভার॥
প্রভাকর উত্তরে গেলা। বহু ভূমি লাভ কৈলা॥
বাদশাহের দক্ষিণ হস্ত। অসি মসি উভয় দুরস্ত॥
সোম দত্ত তার সুত। তেজ ধরে অদ্‌ভুত॥
তার বেটা শিব নাম। অশ্বঘাটে কৈলা ধাম॥
তার পুত্র পুণ্যবান্। শ্রীগণেশ দত্ত খান্॥
রঘুপতি মল্লিকে কন্যা। বিভা দিয়া হৈল ধন্যা॥
নিজ তেজে গৌড়ের রাজা। সভে যারে কৈলা পূজা॥"

উদ্ধৃত কুলকারিকার প্রমাণে জানিতে পারিতেছি, রাজা গণেশের পূর্ব্বপুরুষ রবিদত্ত মুসলমান রাজসরকারে ফৌজদার বা সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া 'খান্' উপাধি লাভ করেন এবং 'দত্তখান্' বলিয়া পরিচিত হন। রণক্ষেত্রে এবং নিজ সমাজে তিনি কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য 'গুয়াবাটা' পাইয়াছিলেন অর্থাৎ সমাজপতিস্বরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র প্রভাকর দত্তখান্ গৌড়ের বাদশাহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় ও লেখনী-পরিচালনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যে সময়ে ইলিয়াস্ শাহ দিল্লীশ্বরকে অমান্য করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তৎকালে প্রভাকর দত্ত তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উত্তরাঞ্চলে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই দিনাজপুর অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তাঁহার পুত্র সোমদত্ত ও পৌত্র শিবদত্ত উত্তরাঞ্চলে বহু স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া অশ্বঘাটে বাসস্থাপন করিয়া-

ছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল অশ্বঘাট নামে পরিচিত হইয়াছে। শিবদত্তের পুত্র হইতেছেন মহাবীর গণেশ দত্তখান্। প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে ইনি 'রাজা গণেশ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। এক্ষণে কুলকারিকার প্রমাণে বুঝিতেছি, রাজা গণেশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রবিদত্ত খানের সময় হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের সহিত ভাতুরিয়া বা বর্ত্তমান বরেন্দ্রভূমির প্রধান স্থানগুলি ক্রমে ক্রমে তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তিনি ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। পুরুষপরম্পরায় শক্তিসামর্থ্য ও সম্পত্তি বৃদ্ধির সহিত তিনি রাজদরবারে ও সমাজে রাজতুল্য সম্মানিত হইয়াছিলেন। রবিদত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভাকর দত্ত খান্ পৈতৃক অধিকারে অর্থাৎ ভাতুরিয়া জনপদে বাদশাহের প্রধান সামন্ত বা সেনাপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই অনুজ প্রভাকর দত্তখান্। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে সুলতান্ ইলিয়াস্ শাহ দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহের প্রাধান্য অমান্য করিয়া সর্ব্ববঙ্গের একচ্ছত্র স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রভাকর দত্তখাঁ তৎকর্তৃক উত্তর-বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে তিনি গৌড়ের বাদশাহের দক্ষিণহস্ত এবং অসি ও মসি উভয় কার্য্যে অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন; তৎকর্ত্তৃক উত্তরবঙ্গে বহু ভূমিলাভের কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রভাকর দত্তখান্ হইতেই দিনাজপুর অঞ্চলে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। তৎপুত্র সোমদত্ত অদ্ভুত তেজস্বী বলিয়া কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছেন। পিতার ন্যায় সোমদত্তও নিজ তেজোবীর্য্যপ্রভাবে উত্তর-বরেন্দ্রভূমে স্বীয় বিষয়-বৈভব ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোমদত্তের পুত্র শিবদত্তখান পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিয়া অশ্বঘাটে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

শিবদত্ত খানের সময়ে গৌড়ের সিংহাসন লইয়া বহু যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ইলিয়াস্‌শাহ সাম্সুদ্দীন্ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরারাজ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া রাজকর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি দত্তখানের উপর গৌড়ের শাসনভার অর্পণ করিয়া পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাতে দিল্লীশ্বর ৩য় ফিরোজশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে ইলিয়াসের পুত্র বন্দী হন, সম্রাট্ পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। এই সময়ে সাম্সুদ্দীন পাণ্ডুয়া হইতে ১১ ক্রোশ দূরে একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে দত্তখানেরা সদলবলে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৌশলে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন। দিল্লীশ্বরের পক্ষীয় গৌড়ের মুসলমান আমীর ওমরাহগণ অনেকে ইলিয়াসের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। কিন্তু দত্তখান্‌দিগের প্রভাবে তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহাদের চেষ্টায় ও শাসনকর্ত্তৃত্বপ্রভাবে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বাঙ্গলার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়েশ্বর মালদহের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরে নূতন রাজধানী পত্তন করিয়াছিলেন। উত্তর বিহারে গণ্ডকনদ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত

হইয়াছিল। ৭৬০ হিজরীতে বা ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ আবার বাঙ্গলা আক্রমণ করেন। সেকন্দরশাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। অবশেষে কয়েকটী হস্তী ও কিছু উপঢৌকন দিয়া দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দেন। সেকেন্দরের দুইটী বেগম ছিল। একের গর্ভে গিয়াসুদ্দীন্ ও অপরের গর্ভে ১৬টি সন্তান জন্মে। গিয়াসুদ্দীন্ বিমাতার চক্রান্তে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা করিয়া সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া যান। তথায় তিনি দলবল সংগ্রহ করিয়া রাজবিদ্রোহী হইলেন। এখানে হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। সেকন্দর শাহ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হন। পিতাপুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সেকন্দর গুরুতররূপে আহত হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গিয়াসুদ্দীন্ রাজা হইয়া আপনার রাজপদ নিরাপদ করিবার জন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে অন্ধ করেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধ, মুসলমান আমীর ওম্‌রাহগণের বিরুদ্ধাচরণ, পিতাপুত্রে অসদ্ভাব এবং ভ্রাতৃগণ মধ্যে পরস্পর জিঘাংসা গৌড়ের সুলতানদিগকে অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। পূর্ব্বে যে হিন্দু জমিদার-দিগকে মুসলমান নৃপতিগণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, ঘটনাচক্রে মুসলমান গৌড়াধিপ তাঁহাদেরই নিকট সাহায্য আশা করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বরের অনুকূলদৃষ্টি পতিত হইবার কারণ, হিন্দু জমিদারগণ স্ব স্ব শক্তি ও সম্পদ্ বৃদ্ধির সহিত অর্দ্ধস্বাধীন নৃপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই সুযোগে দত্তখানেরা যেরূপ পদমর্য্যাদা ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। শিবদত্তখানের পুত্র হইতেছেন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা গণেশ দত্তখান্। শিবদত্ত অশ্বঘাট বা দিনাজপুরে রাজধানী করিয়াছিলেন। এই দিনাজপুর অঞ্চলেই রাজা গণেশের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই মুসলমান সুলতানদিগের গৃহবিবাদ ও শাসনবৈলক্ষণ্যহেতু পদে পদে বলক্ষয় দর্শন করিয়া আসিতে-ছিলেন। পিতৃপুরুষগণের অনুবর্ত্তী হইয়া রণনীতির সহিত উপযুক্ত শাসননীতি শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। উপযুক্ত মৌলবীগণের নিকট মুসলমানী প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন, শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলেই দরবারী ছিলেন, তাঁহাদের নিকট গণেশ দরবারের আদবকায়দা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমানী শিক্ষায় ও আদবকায়দায় এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, মুসলমান রাজপুরুষগণ তাঁহাকে আপনাদের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দু মুসলমান সকলেরই তিনি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সময়োপযোগী বাহ্যাড়ম্বরে সকলকে মুগ্ধ করিলেও অন্তরে অন্তরে তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ হরিভক্ত ছিলেন। মুসলমানেরা হিন্দু সমাজের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, মুসলমানপ্রধান স্থানে হিন্দুগণ কিরূপ সশঙ্কিতভাবে কালযাপন করিতেছে, পদমর্য্যাদার খাতিরে বা স্বকার্য্যসিদ্ধির

জন্য গৌড়ের সুলতান বা মুসলমান রাজপুরুষগণ কয়েকজন হিন্দু জমিদারকে অথবা তাঁহাদের কয়েকজন হিন্দু রাজকর্ম্মচারীকে প্রকাশ্যে আদর বা সম্মান প্রদর্শন করিলেও মনে মনে যে তাঁহারা সকলেই হিন্দুগণকে হীনভাবে দেখিয়া থাকেন ও 'কাফের' বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহা গণেশ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিসে আবার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, হিন্দুগণ স্বাধীনতার বিমল আনন্দ আবার কবে উপভোগ করিবে, যৌবনারম্ভ হইতেই সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি পিতৃপুরুষার্জ্জিত শক্তিসামর্থ্য ও বিত্ত লইয়া ধীরে ধীরে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, যে গৌড়বঙ্গ দ্বিশতাধিক বর্ষ মুসলমান অধিকারভুক্ত রহিয়াছে, মুসলমানের করাল কবল হইতে তাহা সহসা উদ্ধার করা সহজসাধ্য নহে। এজন্য তিনি মুসলমান গৌড়েশ্বর ও রাজপুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন্ আজমশাহ যখন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, তৎকালে তিনি রাজা গণেশের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দীন্ গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া রাজা গণেশকে আপনার প্রধানমন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীন্ নিজে সুকবি ও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি গণেশের শৌর্য্যবীর্য্য ও রাজনীতিতে মুগ্ধ হইয়াই একপ্রকার রাজ্যভার তাঁহার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। গণেশও গুণজ্ঞ ও রসজ্ঞ সুলতানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যখন সুলতান স্বার্থরক্ষার জন্য একে একে ষোলটী ভ্রাতার চক্ষু উৎপাটন করিলেন, সেই অমানুষিক নৃশংস কার্য্যের জন্য রাজা গণেশ মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন। অন্ধ ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনবর্গ গিয়াসুদ্দীনের প্রবল শত্রু হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই এরূপ পাপিষ্ঠকে সিংহাসন হইতে সরাইবার জন্য রাজা গণেশকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গিয়াসুদ্দীনের পুত্র সৈফুদ্দীনও রাজ্যলোভে এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই গিয়াসুদ্দীন আজমশাহ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, দিনাজপুরের রাজা গণেশের হস্তে গিয়াসুদ্দীন্ নিহত হন। গৌড়ের বাদশাহকে মারিয়া রাজা গণেশের রাজ্যগ্রহণ সম্বন্ধে লাউরিয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র ও ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায়।

লাউরিয়া কৃষ্ণদাস রচিত বাল্যলীলাসূত্রে লিখিত আছে —

"শ্রীমান্ নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ যশঃপ্রসূনে স্ফুটিতে মনোজ্ঞে।
তৎসৌরভব্যূহবিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী॥ ৪৮
সদ্বংশশৈলে* দ্বিজরাজকল্পো বেদজ্ঞ সদ্বিপ্রসমাশ্রয়ো যঃ।
দুষ্টস্য শাস্তা কিল সাধুপালো দাতা গুণজ্ঞো হরিভক্তচূড়ঃ॥ ৪৯
দূতৈস্তমানীয় চ রাজধান্যাং দিনাজপুরাখ্যে বহুসভ্যযুক্তে।
তস্মিন নৃসিংহে বহুনীত্যভিজ্ঞে সংজ্ঞস্য মন্ত্রিত্বমবাপ ভদ্রং॥ ৫০

* "কায়স্থশৈলে" এইরূপ পাঠ প্রভাতচন্দ্রসেনের বগুড়ার ইতিহাসে মুদ্রিত হইয়াছে।

তদ্ব্যক্তিচাতুর্য্যবলেন রাজা শ্রীমদ্গণেশো বরদস্যুরূপান্।
গৌড়স্থ পাঠান্ যবনাত্মজান্ হি জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতামবাপ॥ ৫১
গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতিমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধৃগভূৎ॥ ৫২।" †

অর্থাৎ মহাত্মা নৃসিংহের প্রস্ফুটিত যশঃপ্রসূনসৌরভগুণে বহুশাস্ত্রদর্শী রাজা গণেশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই রাজা সদ্বংশশৈলের দ্বিজরাজ অর্থাৎ চন্দ্রের সমান ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ ও সদ্বিপ্রগণের আশ্রয়, দুষ্টের শাস্তা, সাধুজনপালক, দাতা, গুণজ্ঞ ও হরিভক্তগণের চূড়ামণি ছিলেন। তিনি বহুনীতিজ্ঞ নৃসিংহের নিকট দূত পাঠাইয়া বহুসভ্যযুক্ত দিনাজপুর নামক রাজধানীতে আনাইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই নৃসিংহের যুক্তি-চাতুর্য্যবলে তিনি গৌড়ের মুসলমান রাজগণকে জয় করিয়া গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিমান্ গণেশ ১৩২৯ শাকে যবনকে জয় করিয়া গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত। সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ের হৈল রাজা॥
যাঁর কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি। লাউর প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি॥"

উপরোক্ত দুই প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণে নরসিংহ নাড়িয়ালের সময়ে ১৩২৯ শকে বা ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ কর্ত্তৃক গৌড়াধিকারের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে।

বাল্যলীলাসূত্রে ১৩২৯ শক বা ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের সমস্ত গৌড়বঙ্গের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার কথা বর্ণিত হইলেও মুসলমান গৌড়াধিপগণের মুদ্রা হইতে জানা যায়, ৮১২ হিজরী বা ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গিয়াসুদ্দীন্ আজমশাহ জীবিত ছিলেন। তৎপরবর্ষের মুদ্রা আলোচনা করিলে মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন্ আজমশাহের পর তৎপুত্র শৈফউদ্দীন্ হামজাশাহ, তৎপরে সিহাবুদ্দিন্ বয়াজিদ্ শাহ এবং অবশেষে তৎপুত্র আলাউদ্দীন্ ফিরোজশাহ রাজা হইয়াছিলেন।

রিয়াজ-উস্-সলাতীনে লিখিত হইয়াছে, রাজা গণেশের কৌশলে গিয়াসুদ্দীন্ আজমশাহ নিহত হইলে তিনি রাজ্যের একপ্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, যদিও আজমশাহ ও তাঁহার বংশধরগণের নাম মুসলমান মুদ্রায় পাওয়া যাইতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা রাজা গণেশের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র ছিলেন। আজমশাহের মুদ্রা হইতে জানিতে পারি, তিনি ৭৯৫ হইতে ৮১৩ হিজরী পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৩৯২ হইতে ১৪১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সপ্তদশবর্ষের উপর (নামমাত্র)রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এরূপস্থলে মনে হয় ১৩৯২ হইতে আজমশাহের রাজ্যাভিষেকের সহিত রাজা গণেশের অভ্যুদয় ও পরাক্রম বিস্তৃত হইয়াছিল।

† শ্রীবাল্যলীলা সূত্র, ১ম সর্গ, শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সম্পাদিত, ১১ পৃষ্ঠা।

মুসলমান ইতিহাস ও সুলতানগণের মুদ্রা হইতে ৮১৭ হিজরীতে ফিরোজশাহের অভিষেক ও পতনের সংবাদ পাওয়া যায়। সুতরাং এ সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা গণেশ গৌড়বঙ্গের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও নিজে মুসলমান-শাসিত পাণ্ডুয়ায় অভিষিক্ত হন নাই।

দিনাজপুরের কোন্ স্থানে রাজা গণেশের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং তাঁহার কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে কি না তাহাই প্রথমতঃ আলোচ্য। দিনাজপুর জেলায় রাইগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল উত্তরে মহোস নামক একটী ক্ষুদ্রগ্রামে বহুদিনের পুরাতন একটী মস্‌জিদ্ দৃষ্ট হয়। এই মস্‌জিদ্‌টি স্বচক্ষে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মস্‌জিদের পীর সাহেবের সহিত আলাপ হয়। পীর সাহেব দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, এই মস্‌জিদের অদূরে ক্ষত্রিয়রাজ গণেশের বাড়ী ছিল। বাস্তবিকই এখানে বিশাল ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে! তন্মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর-খণ্ডেরও অভাব নাই। সেই ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি রাজা গণেশের প্রাচীন রাজবাটীর ধ্বংসা-বশেষ। মহোসগ্রামের মস্‌জিদ্‌টি জলাল্-উদ্দীনের নির্ম্মিত। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জলাল্-উদ্দীন্ নাম গ্রহণ করিয়া এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে এখানে প্রস্তরময় একটী হিন্দুদেবালয় ছিল। সেই হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই উপর এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদের প্রবেশদ্বারে মাথার উপর একটী বাসুদেব মূর্ত্তি, মন্দিরের আশ পাশ চারিদিকেই হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন ও মধ্যে মধ্যে দেওয়ালের গায়ে উল্টাভাবে নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

এই প্রাচীন গ্রামের যেখানে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহারই অনতিদূরে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে 'গণেশপুর' নামক গ্রাম রাজা গণেশের নাম ঘোষণা করিতেছে। গণেশ-পুর হইতে মালদহ জেলায় বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত বরাবর একটী পুরাতন রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। গণেশপুর হইতে ২ মাইলের মধ্যেই ব্রাহ্মণগাঁও। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, উক্ত গ্রামে রাজা গণেশের ব্রাহ্মণসচিব ও পুরোহিতগণ বাস করিতেন। এই গ্রামের মধ্য দিয়া পুরাতন পাণ্ডুয়ার সড়ক্ গিয়াছে। বলা বাহুল্য, রাজা গণেশের প্রাধান্যকালে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়ের সুল-তানগণ পাণ্ডুয়া নগরেই রাজধানী করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে রাজা গণেশ গণেশপুর হইতে এই পুরাতন রাস্তা দিয়াই পাণ্ডুয়ায় যাতায়াত করিতেন। রাজা গণেশের রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্ভবতঃ তিনি গণেশপুর হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত তাঁহার গমনাগমনের উপযোগী পথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

রাজা গণেশ গৌড়েশ্বর হইয়া কেবল হিন্দুস্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহার অভ্যুদয়ের সহিত আবার হিন্দুমন্দিরসমূহ শঙ্খঘণ্টানিনাদিত, দেবস্তোত্রমুখরিত ও বেদধ্বনিবিঘোষিত হইল—সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজ তাহাতে উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। অপর সমাজের ত কথাই নাই, ব্রাহ্মণসমাজেও এই সময় মুসলমান-নিগ্রহে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতৃগণ এই সময়ে সমাজরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা ও আভিজাত্যরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য

রাজা শ্রীগণেশদত্তখানের সভায় হইয়াছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে সেই সময়ের কথা বিবৃত হইয়াছে।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ প্রসঙ্গে পূর্ব্বে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এখানে তাহা সাধারণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে থাকিয়া গৌড়বাসী এই গণেশ নৃপতির সময়ে কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতার উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এই সুদিনে গৌড়ের ব্রাহ্মণ-সমাজও সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই শুভ অবসরে স্মার্ত্তপ্রবর কুল্লুকভট্ট ও সমাজ-তত্ত্ববিৎ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী আসিয়া মিলিত হইলেন। বহুদিন হইতেই এখানকার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ সেনবংশের অভ্যুদয়কাল হইতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য রক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু বিধর্ম্মী মুসলমানের শাসন ও বৌদ্ধাচারের প্রবল বন্যায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। এখন হিন্দুরাজের অধিকারে ও ব্রাহ্মণমন্ত্রীর শাসন-সুযোগে তাঁহারা সকলে মস্তকোত্তোলন করিলেন। এই স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে উদয়নাচার্য্য ও কুল্লুকভট্ট অগ্রণী হইয়াছিলেন। এক ব্যক্তি বল্লাল-পূজিত শ্রেষ্ঠ কুলীন সন্তান ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বৌদ্ধ পরাজয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি (মনুসংহিতার টীকাকার) অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত। বলিতে কি, কুল্লূকের মত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ তৎকালে গৌড়মণ্ডলে কেহই ছিলেন না। হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা ও হিন্দুধর্ম্মানুরাগী রাজা গণেশের সভায় তাঁহারা যে সর্ব্বপ্রধান সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি বশতঃই, সমাজে তাঁহারা যে ব্যবস্থা চালাইয়া ছিলেন, তাহা সকলেই অবনতশিরে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলিতে কি, বৌদ্ধাচার-বিপ্লাবিত ও মুসলমান-শাসিত বারেন্দ্র সমাজে এই সময়েই বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সমন্বয়ে নবীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল।"*

রাজা গণেশের সভায় সম্মানিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলতিলকগণের চেষ্টায় যেরূপ সমাজ-সংস্কারের আয়োজন হইয়াছিল, এক্ষণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ হইতেও জানিতেছি, রাজা দত্তখানের সভাতেও কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ সেইরূপ সমবেত হইয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে লিখিত আছে—

"স্ববংশভূপালকুমারকাভ্যাং যোগ্যো বিবাদঃ প্রতিপত্তিকারি।
শ্রীদত্তখানস্য সভায় পূর্ব্বং পিনালকুণ্ডং ঘটকাঃ সমূচুঃ॥"

৫৭ সমীকরণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে ধ্রুবানন্দ মিশ্র উক্ত কারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত সমীকরণ প্রসঙ্গে ধ্রুবানন্দ মিশ্র এইরূপ কারিকা দিয়াছেন,—

"কাহ্নায়িমিশ্রশ্রীমন্তৌ নরসিংহবশিষ্ঠকৌ।
পীতাম্বরো ধনপতিঃ সর্ব্বানন্দস্তিলো সমাঃ॥"

চট্টবংশীয় কানাই মিশ্র, শ্রীমান্, নরসিংহ ও বশিষ্ঠ এই চারিজন এবং বন্দ্যবংশীয় পীতাম্বর,

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চট্টবংশীয় ধনপতি, বন্দ্যবংশীয় সর্ব্বানন্দ এবং চট্টবংশীয় তিলাই এই আটজন সমান কুলীন বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।'

দেবীবর কৃত মেলপর্য্যায়গণনার টিপ্পনীতে লিখিত আছে,—

"গৌণৈঃ সহ গৌণানাং পরীবর্ত্তবিধানং কদাচিন্মুখ্যে তনয়াপ্রদানং অতঃ শ্রীদত্তখানেন রাজ্ঞা শ্রোত্রিয়াণাং সধর্ম্মত্বেন গৌণা অপি শ্রোত্রিয়াঃ কৃতাঃ॥"

'গৌণকুলীনের সহিত গৌণদিগের পরিবর্ত্ত চলিতেছিল, কখন মুখ্যের সহিতও আদান প্রদান হইতেছিল; কিন্তু রাজা শ্রীদত্তখান্ শ্রোত্রিয়ের সধর্ম্মত্বহেতু গৌণদিগকেও শ্রোত্রিয় করিলেন।'

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রকাশকালে হস্তলিখিত পুথির বিকৃত পাঠ অনুসারে 'দত্তখান' স্থলে 'দত্তখাস' নাম ছাপা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে আমি জাতিমালা-কাছারীর বিচারপতি মনে করিয়াছিলাম। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ধ্রুবানন্দের মহাবংশ-মুদ্রণকালেও এই ভ্রম থাকিয়া যায়। মহাবংশের মুদ্রণকার্য্য শেষ হইলে গোপালশর্ম্মা রচিত একখানি মহাবংশ-টীকা হস্তগত হয়। এই টীকায় রচনাকাল ১৬৭১ শক, নকলের তারিখ ১৬৮১ শক। মহাবংশ-মুদ্রণকালে এই টীকার সাহায্য পাই নাই। পীরালী সমাজের ইতিহাস লিখিবার সময় এই টীকাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার আবশ্যক হয়। এই সময়ে উক্ত টীকার মধ্যে "গৌড়ৈকচ্ছত্রী শ্রীদত্তখানস্য" এইরূপ পাঠ দৃষ্টিগোচর হয়। বলাবাহুল্য রাজা গণেশ ভিন্ন তৎকালে আর কেহ গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারেন নাই। এজন্য রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থের রাজা শ্রীদত্তখান এবং রাজা গণেশ অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। তুলনায় আলোচনা করিবার সুবিধার জন্য পর পৃষ্ঠায় রাজা গণেশের বংশলতা ও রাজা শ্রীদত্তখানের সভায় সম্মানিত কুলীনগণের বংশলতা প্রদত্ত হইল।

এই সকল বংশলতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, রাজা বল্লালসেনের সময় হইতে রাজা গণেশের সময় পর্য্যন্ত ৯।১০ পুরুষ অতীত হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে রাজা শ্রীদত্তখানের নাম থাকিলেও রাজা গণেশের নাই বা তাঁহার সময়ে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতেও রাজা গণেশের নাম নাই। সম্ভবতঃ ঐরূপ কোন কারণে যে কৌলিক উপাধিতে তিনি হিন্দুসমাজে পরিচিত ছিলেন, সেই উপাধিই কুলজ্ঞগণ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজের সমাজ সংস্কারের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয়, গৌড়াধিপ বল্লাল-সেনের ন্যায় গৌড়েশ্বর গণেশ দত্তখানও হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠা, দেবদ্বিজে ভক্তি, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অদ্বিতীয় বীর্য্যবত্তাগুণে হিন্দুসমাজে অসাধারণ প্রভাব, ও প্রতিপত্তি বিস্তার এবং সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মণ-সমাজকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেই রূপ নিজ সমাজের কুলীনগণের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া কুলগৌরব বৃদ্ধি করিয়া

রাজা গণেশ ও তৎসাময়িক ব্রাহ্মণ প্রবরগণের এবং তৎ তৎ পূর্ব্বপুরুষগণের নাম
১ মহেশ্বর
বল্লাল কর্ত্তৃক নিহত)
উবাক্ দত্ত
কুলপতি
কবিদত্ত
রবিদত্ত খান্
বিভাকর
প্রভাকর
দিবাকর
দত্তখান্
সোমদত্ত খান্
শিবদত্ত খান্
গণেশদত্ত খান্
যদুনাথ (জিৎমল)
ভাস্কর বেদান্তী
(বল্লালের সমসাময়িক)
সায়নাচার্য্য
আরু ওঝা নাড়িয়াল
যদুপণ্ডিত
শ্রীপতি
কুলপতি
ঈশান
বিভাকর
প্রভাকর
নরসিংহ নাড়িয়াল
কৈতে বা ক্রতু ভাদুড়ী
(বল্লালের সমসাময়িক)
সঙ্কর্ষণ
ভৃগু বা ভল্লুকাচার্য্য
যোগেশ্বর
পুণ্ডরীক বা পুণ্ডরীকাক্ষ
বিশ্বম্ভর আচার্য্য
লক্ষ্মীপতি আচার্য্য
বৃহস্পতি আচার্য্য
উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী
মৌন বা মনুভট্ট
নন্দনাবাসী
(বল্লালের সমসাময়িক)
জ্ঞানানন্দ
ভুবনানন্দ
কনকদণ্ডী
যদু ওঝা
বেদ ওঝা
ত্রিলোক বা ত্রিকালাচার্য্য
গঙ্গাদাস
দিবাকর জগৎগুরু
কুল্লূক ভট্ট
মহাদেব বন্দ্য
(বল্লালের সমসাময়িক)
মকরন্দ
দাশরথি (কাঁটাদিয়া)
বনমালী
ভীম
ভব
মাধব
জিয়ো
আদিত্য
দিগম্বর
পীতাম্বর
সর্ব্বানন্দ
কাশ্যপগোত্র শ্রীকর চট্ট
(বল্লালের সমসাময়িক)
বহুরূপ
গোবিন্দ
চাকু
গুণাকর
অর্ক
কৃষ্ণ
লোকনাথ
হরি
কেশব
শ্রীমান্
তিলাই
কানাই
ধনপতি
নৃসিংহ
বশিষ্ঠ

ছিলেন। নিজ কুলগৌরব বর্দ্ধনাশায় তিনি পাঁচথুপীর রাজা নরপতি ঘোষের পৌত্র কুলীন-প্রবর রঘুপতি মল্লিককে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।*

মুসলমান ইতিহাস রিয়াজ্ গ্রন্থে লিখিত আছে, তাঁহার অসাধারণ প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য মুসলমানেরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া পীর নূর-কুতব-আলমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পীর সাহেবের আহ্বানে জৌনপুরের মুসলমান নৃপতি সুলতান ইব্রাহিম শাহ সসৈন্যে আসিয়া গৌড় আক্রমণ করেন। বলিতে কি, এ সময়ে সকল স্থানের মুসলমানই রাজা গণেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। জয়লাভের সম্ভাবনা অল্প ভাবিয়া রাজা গণেশ প্রিয়পুত্র যদুকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়ান। পীর সাহেব নূরকুতব আলমের পরামর্শে যদু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে পীর সাহেব গিয়া জৌনপুরের সুলতানকে বুঝাইয়া দেন, স্বধর্ম্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নহে। পীর সাহেবের আদেশে জৌনপুর-নৃপতি সসৈন্যে ফিরিয়া যান। গৌড়রাজ্য নিরাপদ হইলে রাজা গণেশ প্রিয় পুত্র যদুনাথকে আবার হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিজে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

গণেশপুত্র যদু ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণ-সমাজে বেশ চাঞ্চল্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আপৎকালে কেহ যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, ইচ্ছা করিলে পুনরায় সে নিজ ধর্ম্মে আসিতে পারে, এ বিশ্বাস রাজা গণেশের ছিল। উদয়নাচার্য্য, কুল্লূকভট্ট প্রভৃতি তাঁহার সভাপণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনুমোদন করিয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠার সহিত ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত ভূতপূর্ব্ব হিন্দুসন্তানদিগকে আবার হিন্দু করিতে পারিলে হিন্দুসমাজের শক্তিবৃদ্ধি এবং হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপনের সুবিধা হইবে, তাহা মহামতি রাজা গণেশ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ৮১৯ হিজরা বা ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে যদুকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ এবং রাজা গণেশের পুনরায় সিংহাসন গ্রহণের কথা লিখিত আছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা গণেশ নিজ নামে মুদ্রা চালাইয়া ছিলেন কি না তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ৮২১ হিজরা বা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের দেহাবসানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যুদয় ও তাঁহার দেহাবসান-কাল মধ্যে প্রচারিত তাঁহার স্বনামাঙ্কিত কোন মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৩৩৯ শকের (বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের) শ্রীদনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রায় পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম, ও চাটিগ্রামের নাম আছে। এই সকল মুদ্রা হইতে সহজেই মনে হইবে, বর্ত্তমান মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া হইতে সুদূর চাটিগাঁ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র বাঙ্গলায় উক্ত ১৩৩৯ শকে রাজা শ্রীদনুজমর্দ্দনের নামে আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা গণেশের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক শ্রীদনুজমর্দ্দন ও রাজা গণেশকে অভিন্ন ব্যক্তি এবং রাজা গণেশেরই উপাধি

---

* উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড—২য় খণ্ড, ৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দনুজমর্দ্দন এবং জালাল্-উদ্দীনের 'মহেন্দ্রদেব' উপাধি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সাময়িক ইতিহাস বা কিংবদন্তি মূলে রাজা গণেশ বা দনুজমর্দ্দনের কাহারও একাধিক নামের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ রাজা গণেশের ও জলালুদ্দীনের যে অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ের প্রাচীন মুদ্রা হইতে আমরা জলাল্-উদ্দীন্, দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব এই তিন জন রাজার নাম পাইতেছি। রিয়াজ্ উস্ সলাতিন মতে মুসলমানবিদ্বেষী রাজা গণেশ ৭ বর্ষ মাত্র প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১৩২৯ শকে বা ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ গৌড়ের একচ্ছত্র নৃপতি হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য নূর-কুতুব-আলম্ জৌনপুরের সুল্তান ইব্রাহিমকে আহ্বান করেন। ৮১৭ হিজরায় বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম গৌড় আক্রমণ করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাজা গণেশ যদুকে রাজ্য ছাড়িয়া দেন। যদু ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় সুলতান ইব্রাহিম ফিরিয়া যান। সুলতানের প্রত্যাগমনের পর রাজা গণেশ সিংহাসন পুনরায় গ্রহণ করেন ও যদুকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রাজা গণেশের বিদ্যমানে যদু বা জিৎমল সিংহাসনে আরোহণ করিলে জলাল্-উদ্দীন্ নামে তাঁহার মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে ৮১৮ ও ৮১৯ হিজরী অঙ্ক পাওয়া যায়। আবার ঠিক ইহার অব্যবহিত পরেই দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে। শেষোক্ত নৃপতিদ্বয়ের মুদ্রা হইতে মনে হয় যে তাঁহারা পাণ্ডুয়া হইতে চাটিগ্রাম পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া ছিলেন। এ অবস্থায় রাজা গণেশ ও রাজা দনুজমর্দ্দন দেবকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

সম্ভবতঃ বৃদ্ধবয়সে রাজা গণেশ মুসলমান-বিদ্বেষী ও একজন গোঁড়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুলতান ইব্রাহিমের নিকট অবনতি স্বীকার তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ পুত্রকে হিন্দু করিয়া লওয়ায় সমাজে যে কিছু গোলযোগের সূত্রপাত না হইয়াছিল এমন নহে। যাঁহার সভায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের কুলবিধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, বল্লালসেনের ন্যায় যিনি ব্রাহ্মণসমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন, হিন্দুসমাজ রক্ষায় যাঁহার চিরন্তন লক্ষ্য ছিল, এখন তিনি হিন্দু সমাজের গৌরবরক্ষার্থ অপরের হস্তে সমগ্র গৌড়ের শাসনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন,তাহা সম্ভবপর নহে। যদুর পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের পর রাজা গণেশ দুই বর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন, এই সময়ে তিনি দনুজমর্দ্দন নামে নির্বিরোধে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যদু হিন্দু আত্মীয়গণের পরামর্শে প্রথমে 'মহেন্দ্রদেব' নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন ও মুদ্রা প্রচার করেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ও সুলতান আজিমের কন্যা আস্‌মান্‌তারাকে বিবাহ করেন। কুলগ্রন্থে যদু ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নামের শেষে 'জাত্যন্তর' লিখিত আছে, তৎপরবর্ত্তী পুরুষের নাম কুলগ্রন্থে নাই।

---

* Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, by Nalinikanta Bhattasali, p. 115—122.

সপ্তম অধ্যায়

পাটুলির দত্তবংশকারিকা

কবিদত্তের দ্বিতীয় পুত্র দামোদর, তৎপুত্র হরিহর ও হরিহরের পুত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর দত্তের দুই পুত্র কৃষ্ণ বা কেশদত্ত এবং বিষ্ণু বা বিশু দত্ত। এই কেশদত্ত হইতে পাটুলির দত্তবংশ এবং বিশু দত্ত হইতে দিনাজপুর-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষের জন্ম হয়। কেশদত্ত সম্বন্ধে ঘটক কারিকায় লিখিত আছে—

"কেশেতে দ্বারকনাথে, শ্রীমুখ জন্মিলা তাথে। সহস্রাক্ষ উদয় মূল, পাটুলি গমনে কুল।
কেশে উদয় বংশ ভাসি, জয়ানন্দ রূপ কাশী। শিবরাম সভার অনু, জয়ানন্দ পঞ্চ তনু।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামনাথ, তাথে লিখি বংশপাত। রাজীব রাঘব ভুবিখ্যাত, মহাদেব গোপাল সাত।
রাজীবকুলে ভবানন্দ, ধারা বেদ ছিল বন্দ। রামশরণ কাশীশ্বর, হবা কল্লু তার পর।
ভূ রাঘবে বাড়ে পুণ্য, তাথে যুগল বংশ ধন্য। রামেশ্বর বাসুদেব, রামেশ্বরে রঘুদেব।
মুকুন্দ রামকৃষ্ণ পরে, গোবিন্দদেব রঘুর ঘরে। মুকুন্দ রায়ে তিন জন, কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবন।
গোপীরায়ে সভার শেষে, রামকৃষ্ণে নেত্র ভাসে। কৃষ্ণরায় সাতু লেখি, গোবিন্দ কিশোর শেষে দেখি।
বাসুদেব মনোহর, পক্ষভেদে গঙ্গাধর। মনোহরে রাজচন্দ্র, গঙ্গধারা বন্দাবন্দ।
দুর্গাপ্রসাদ পোষ্যপুত্র, কন্যা দিল রাঘবসূত্র। মহাদেবে দুই পাই, রামেশ্বরের তুল্য ভাই।
রঘুনন্দন অগ্রগণ্য, কল্যাণ রাঘব বংশশূন্য। রঘুনন্দনে কৃষ্ণরাম, পূর্ব্ব পক্ষে রাজারাম।
কৃষ্ণে শূন্য রাজীব সূত্র, গৌরী ভবানী যুগল পুত্র। গোপালে কেবল রঘুনাথ, তাথে পঞ্চ বংশজাত।
রামদেব চান্দপায়, বিনোদ নবু দেবু রায়। রামদেবে বিদ্যাধর, রামনাথ তার পর।
চান্দ পরাণে শূন্য দেখি, বিনোদ রায়ে দুই লিখি। দুর্গাচরণ দুলাল ডাকে, রামহরি নরুর পাকে।
রামকুমার দেবুর অংশ, কন্যা দিল গোপাল বংশ। রূপে একা রামচন্দ্র, তাথে নেত্র ধারা বন্দ।
দেবিদাস ভূপাদইস, লক্ষ্মীকান্ত জগদীশ। দুই দুই তিনে পাই, পুতি অনুজে বংশ নাই।
বিশ্বনাথ রামানন্দ, বীরেশ্বর রামগোবিন্দ। রাম রাম গোপাল দাতা, অন্নদানে যার কথা।
বিশ্বনাথে বংশ থুই, কৃষ্ণজীবন কমল দুই। বীরেশ্বরে দুই খ্যাত, জগহরি উভয় নাথ।
রাম রামে দুই কায়, রামকান্ত কৃষ্ণ রায়। কাশীনাথে বিশ্বেশ্বর, বৈদ্যনাথ তার পর।
ব্রহ্মশাপে বংশহত, কন্যা দিল শ্রুত মত॥"

ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন,—

"কেশে উদয় দেশে ডাক, শেষে উদয় কুলে পাক। পাটুলি গমন কুল, শঙ্কর সবার মূল॥

দেখ গঙ্গার সমীপে গ্রাম অতি মনোহর। যথা সূর্য্যের সদৃশ তেজ ধরেন বিপ্রবর॥
তর্ক আদি নানা শাস্ত্র আগম পুরাণ। অহর্নিশ করেন যাঁহা বেদের বাখান ॥
হেন পাটুলিতে সভা করেন দত্ত মহাশয়। কেশে উদয় আদি করি রাঘব তনয় ॥
তারা দানেতে নিপুণ বড় বিখ্যাত অবনী। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী যাকে বলে শূদ্রমণি ॥
শ্রীকরণে একে একে লইলা আশ্রয়। সম্বন্ধ করিতে কেহ না করিল ভয়॥
সবে বলেন করি চল পাটুলি আলয়। তথা গঙ্গার সমীপ বটে দত্তের আশ্রয়॥
হেন পাটুলি-বিভব-বাসী তাহে দত্তগণ যৌটন দেখিয়া ভাল কুলের গমন॥
জীব প্রভাকর আইলা নারদে গোদাই। শ্রীধর আইলা আর মাধে গোবিন্দাই॥
ঘোষ ঘরে রাজা আদি তাজা মাজা জন। ঠাকুরে হরিহর আইলা মণ্ডলে নয়ন॥
মার্জ্জিত ত্রিকুলি কুলে গ্রহণ বিতরণ। চতুর্থে আইলা বলাই নিবাস গোকর্ণ॥
আগে মণ্ডল মহেশী কুলে মণ্ডিত পাটুলী। তথা শঙ্কর প্রথমাগম রঙ্গাই নিরাকুলি॥
শ্রীকান্ত বসন্ত জোড়া জড়া একই ঘরে। দস্তিদারে ভরত জড়া কালিদাস পরে॥
রাঘবে বসন্ত রায় বিখ্যাত মাগুরি। শ্রীরাম অনুজ আইলা শঙ্করনগরী॥
মঘমনে সন্তোষে ডাক না করে আশ্রয়। অবশেষে চলিয়া আইলা রূপের তনয়॥
গণেশ কানেডা হইতে চলিয়া আইলা দেশে। নৃসিংহ তনয় পরে আইল অবশেষে॥
এথা মল্লিক জড়িত সিধাই যজ্ঞের ঈশ্বরে। পশ্চাৎ কন্দর্প রায় কি দায় তৎপরে॥"

শুকদেব সিংহ পাটলির দত্তবংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"উদয় কুলে সবে বলে অশেষ কুলের গতি। হাল হাসিলে জনাজাৎ লিখি যে সংপ্রতি॥
রঘুতে গ্রহণ চারি শূন্য ধারা তিনে। আগে বল্লভে রাজারাম সরস ভাব মীনে॥
গোয়ানি হইতে কানু অনু ধবলপাট দেশে। ত্রিপুরারি মিরাটি রাজভোগে শেষে॥
অক্রূর সধর ধারা সুতা যজ্ঞ দান। উচিত কুলে কালীঘোষ উজান যজান॥
আগে প্রভা লেভে শ্রীআগমন শোভা করে বড়। কুলে হরিদাস সাবাস ভাষা আনামেক দড়
মনোহর গ্রহণ যজ্ঞ কক্ষবাম বিধি। আগে সেই মীনে রাজারাম জনার্দ্দনে নিধি॥
আদি পক্ষ শূন্য তায় সধর ধারা পরে। সুতা দান সুতে গ্রহণ ডাক সরসি ঘরে॥
মাধে দীপ্তি নির্ম্মল রাঘবি হরিশাড়া। লেবে শ্যাম ভুবন নাম পাটুলিতে খড়া॥
সুতে গ্রহণ গোবিন্দকুলে ডাকে আমাইপাড়া। তাথে আমুয়া ঘোগী চামুয়া ঘনশ্যামী ঝাড়া॥
গঙ্গাধর সুন্দর বাৎস্য সে বিভা দুই। পরে কেমপুর করিলা সিংহ রঘুর ভাবে থুই॥
মুকুন্দ গোবিন্দ বাসু লিখি ক্ষেম্য কুলে। অনুজে দেখি যে রাধা করিয়া রমা মূলে॥
দুই ভাইর তনয় ঘোষে দাসে অনুগত। ঘোষপাড়া দাস খড়া কুলজেতুর মত॥
সুতা দানে মুকুন্দ রায়ের তেজ দেখি ঘরে। গোবিন্দ কুলিয়া মগ্নি পাড়া দীপ্ত করণ করে॥
কেশে উদয় জয়ানন্দ চারি সহোদর। রূপকালী শিবরাম লিখি যে তাপর॥
প্রদান শ্রীকান্ত দীপ্তিমন্ত দেখি মাধে। তুজ সিংহ ঘোষ দাস মিত্র যেজ্ঞা সাথে॥

জয়ানন্দ সুত পঞ্চ রাজীব মহাদেব। রাঘব দুর্লভ দত্ত কুলে তোলে জেব॥
রামনাথ গোপাল দুই লিখি তার পরে। বংশীবদনে প্রদান গৌরীকান্ত শশধরে॥
রাজীবে রাজীব ভবানন্দ শ্রীবল্লভে। পরে রাজা হাজরা দ্বিপক্ষে ভাল লেভে॥
প্রদান নরেন্দ্র মাধে পরে রামচন্দ্র। গণেশ গণেশ প্রায় কক্ষে অনুবন্ধ॥
মহাদেবে মধু রঘু কল্যাণ এ তিন। কল্যাণে রামচরণ সিংহ কক্ষায় প্রবীণ॥
প্রদান মহাদেবে কৃষ্ণ পাঁচথুপী তাপরে। শ্রীহরি হাজরা রামচন্দ্র দীপ্ত করে॥
কল্যাণ প্রদান তেকু পরে শুকদেবে। তা পরা কুলাই ঝিল্লী বলরাম সেবে॥
মহাদেবে রঘু চণ্ডিদাসেতে আদান। শ্রীরামজীবন রাজা সম্প্রদান॥"

পাটুলির দত্তবংশ-বিবরণ

(কেশদত্তের ধারা)

কেশ দত্তের পুত্র দ্বারিকানাথ ও তৎপুত্র শ্রীমুখ দত্ত। শ্রীমুখ দত্তের পুত্র সহস্রাক্ষ দত্ত। সহস্রাক্ষ দত্তের পুত্র উদয় দত্ত পাটুলিতে একটি স্বজাতির সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং সমবেত কায়স্থগণ তাঁহাকেই সভাপতি মনোনয়ন করিয়াছিলেন। দত্তবাটী ত্যাগ করিয়া পাটুলিতে রাজধানী স্থাপন সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ আছে। কেহ বলেন উদয় দত্ত, কেহ বলেন সহস্রাক্ষ দত্ত এবং কেহ বলেন দ্বারিকানাথ দত্ত প্রথম পাটুলি আসিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে মুসলমানগণ ক্রমশঃ অত্যাচারী হইয়া গ্রামস্থ অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলে একদা দ্বারিকানাথ দত্ত সংবাদ পাইলেন, মুসলমানগণ তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সেদিন বিজয়া দশমী। তাড়াতাড়ি প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া তিনি সপরিবারে নৌকাযোগে পাটুলি পলায়ন করিলেন। পাছে যথাকালে ফিরিয়া আসিয়া ৺কালীপূজা করিতে না পারেন এই ভয়ে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে ৺কালীমাতার উদ্দেশে একটী ছাগ বলি প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি একাল পর্য্যন্ত পাটুলির বাটীতে বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে একটী ছাগবলি হইয়া থাকে। তৎপরে পাটুলির বাটীতে মহাসমারোহে কালীপূজা সম্পন্ন করা হয়। এই পাটুলি সম্বন্ধে কবিরাম প্রণীত দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে পাটলিগ্রামবাসীনাম্।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ত্ততে অধুনা নৃপ॥৬৯২"

শেওড়াফুলীর রাজবংশের বিবরণ হইতে জানা যায় দ্বারিকানাথ স্বীয় খুল্লতাত বিষ্ণু দত্তের আহ্বানে অগ্রদ্বীপে বাস করেন। পরে উদয় দত্ত পাটুলিতে রাজধানী স্থাপন করেন। সহস্রাক্ষ দত্ত সন ৯৮০ সালে মোগল সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক 'জমিদার' স্বীকৃত হইয়া-

ছিলেন।(১) হিন্দু রাজত্বকাল হইতে ইহাঁরা জমিদার ছিলেন, তথাপি মোগল রাজত্বকালে পাকা করিয়া 'জমিদার' হইতে হইয়াছিল।(২) সহস্রাক্ষ পরগণা ফৈজল্লাপুর জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। সহস্রাক্ষের পুত্র উদয় দত্ত আকবর বাদশাহের নিকট হইতে 'সভাপতি রায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। উদয় দত্তের সময় পাটুলির রাজবংশের সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছিল। এক দিকে দিল্লী হইতে রাজসম্মান লাভ করিয়া ও অপর দিকে উত্তররাঢ়ীয় সমাজে একজন সভাপতি হইয়া এই বংশ পুরুষানুক্রমে সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন। উদয় রায় আকবরের নিকট আরশা পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। রাজা টোডরমল ও মহারাজ মানসিংহের সুপারিশে উদয় দত্ত বাদশাহের এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাটুলির রাজধানীর এক পার্শ্বে গঙ্গা। উদয় দত্ত অপর তিন পার্শ্বে গড় খনন দ্বারা রাজধানী সুরক্ষিত করাইয়াছিলেন। গড়ের মধ্যে পূর্ব্ব দিকে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ, দক্ষিণে স্বজাতি, উত্তরে সেনাবাস ও পশ্চিমে কর্ম্মচারী, নাপিত, খানসামা ইত্যাদির বাসস্থান ছিল। অর্দ্ধক্রোশবিস্তীর্ণ দ্বীপের উপর রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া চতুর্দ্দিকে তোপ দ্বারা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উদয় দত্তের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং তাঁহার রাজসভায় বহু পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা উদয় রায়কে 'রাজর্ষি' উপাধি দিয়াছিলেন।

সন ১০৩৫ সালে (১৬২৮ খৃঃ) উদয় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ানন্দ সম্রাট্ শাহজাহানের নিকট হইতে "মজুমদার" উপাধি ও তৎসহ স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত দুইমুখী তরবারি এবং কোট্ একতিয়ারপুর পরগণা জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। পারসী অক্ষরে ক্ষোদিত উক্ত দ্বিমুখী তরবারি এখনও শেওড়াফুলী রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি পাটুলিতে কৃষ্ণদেব ঠাকুরের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

জয়ানন্দ মজুমদারের পাঁচ পুত্র মধ্যে রাঘব বাদশাহ শাহজাহানের নিকট হইতে হিজরী ১০৬০ সালে ১২ই রবি তারিখে (১৬৪৯ খৃ) চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে তিনি মজুমদার উপাধি এবং তৎসহ একুশটী পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। ঐ পরগণাগুলির অধিকাংশই সরকার সাতগাঁও অর্থাৎ সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত ছিল। তৎকালে বাঙ্গলা দেশে মাত্র ৪ জন মজুমদার ছিলেন। রাঘব তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। (৩)

---

(১) শেওড়াফুলীর কুমার সুধীরচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, সহস্রাক্ষ দত্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে বহু ভূমি দান করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং কুলেশ্বর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সহস্রাক্ষের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পরে উদয় দত্ত আকবর বাদশাহের নিকট হইতে বহু সম্পত্তি লাভ করেন।

(২) Vide Shore's Minute of 2nd April 1788 & 18th June 1788.

(৩) সাবর্ণ চৌধুরী বংশের পরিচয় প্রসঙ্গে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত রহিয়াছে।

بسم الله الرحمن الرحیم

৩। বাদশাহ অরঙ্গজেব প্রদত্ত 'রাজা মহাশয়' উপাধির সনদ
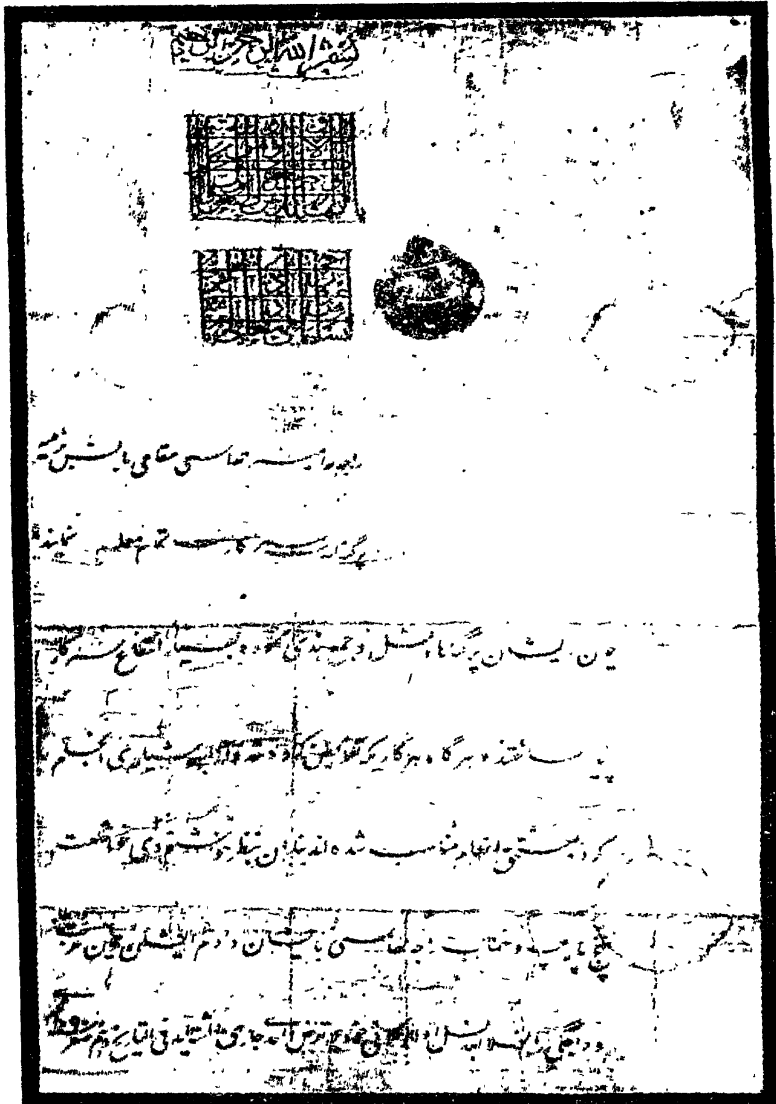
উক্ত ২১টী পরগণার নাম যথা—

আর্শা (১), হলদা, মামদানিপুর, পাঁজনৌর, বোরো, জাহানাবাদ, সায়েস্তানগর, সাহানগর, রায়পুর, কোতয়ালী, পাউনান, খোসালপুর, বকসবন্দর, পাইকান, আমিরাবাদ, জঙ্গলিপুর, মাইহাটী, হাবেলি সহর, মোজাফরপুর, হাতিকান্দি ও সেলামপুর।

এই পরগণাগুলির অধিকাংশই সপ্তগ্রাম সরকারের অধীন থাকায় রাজ্যের সুশাসনের নিমিত্ত রাঘব নিম্নবঙ্গের রাজধানী সপ্তগ্রামের উত্তরপূর্ব্বে ভাগীরথীতটে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত রাজবংশের বাটী বলিয়া এই স্থানের নাম বংশবাটী রাখা হইল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বাঁশ বন মধ্যে বাটী হওয়ায় এই নাম হয়, কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

শুনা যায়, রাজা রাঘবেন্দ্র রায় মজুমদারের সময়ে সর্ব্বসমেত পাটুলি রাজ্যের অধীনে একান্নটী পরগণা ছিল। রাঘবেন্দ্র রায়ের তিন পুত্র মধ্যে মথুরেশ বংশের কোনও সংবাদ জানা যায় না। অপর দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেবের বংশধরগণ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

বাঁশবাড়িয়া-রাজবংশ।

রাঘবের জীবনকালে বাঁশবাড়িয়ার প্রাসাদ কাছারী-বাটী রূপে ব্যবহৃত হইত। রামেশ্বর এখানে আসিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিলেন। তিনি নানা স্থান হইতে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং বিবিধ জলাচরণীয় হিন্দু ও শতাধিক সমরকুশল পাঠানকে আনাইয়া বংশবাটীতে বাস করাইলেন। এক এক পল্লীতে এক এক জাতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাশী হইতে রামশরণ তর্কবাগীশকে আনাইয়া রাজা রামেশ্বর আপন সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও রাজবাটীর সভা-পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। গ্রাম মধ্যে ৪১টী টোল স্থাপন করিয়া রাজা রামেশ্বর কাশী ও মিথিলা হইতে অধ্যাপক আনাইয়া ছাত্রদিগের শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। টোলের যাবতীয় ব্যয় রাজ-সংসার হইতে দেওয়া হইত। (২) তখনও ভাটপাড়ায় পণ্ডিতগণের বাস হয় নাই। ঠাকুর-বংশের পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সমসাময়িক। রামেশ্বর রায় ১০ই শফর হিজরি ১০৯০ (১৬৭৩ খৃঃ) অব্দে বাদশাহ আরঙ্গজেব বা গাজি আলমগীরের নিকট হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমে 'রাজা মহাশয়' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।(৩) এই সনন্দের সঙ্গে বাদশাহ তাঁহাকে "পঞ্চ পর্চা (পঞ্চ পোষাক)

(১) Vide Blochmann's Notes appended to Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol I.

(২) Vide Sir Roper Lethbridge's Golden Book of India

(৩) Vide Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol I.

খেলাত দিয়াছিলেন ও রাজপদবী সম্মানের সহিত রক্ষা করিবার জন্য ২২ জলুস অর্থাৎ ১৬৮০ খৃঃ অব্দে অপর এক সনদ দ্বারা তাঁহাকে বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ৪০১/ বিঘা নিষ্কর ভূমি জায়গীর ও ১২টী পরগণা জমিদারী দিয়াছিলেন। বংশানুক্রমিক "রাজা মহাশয়" উপাধির সনদ খানি দেখিয়া ভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক জজ মিঃ এইচ, বিভারিজ সাহেব যেরূপ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়

বরাবরেষু

পরগণা আর্শা—সরকার সাতগাঁও

যেহেতু তুমি পরগণাগুলি অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া রাজ্যশাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং যেহেতু তোমাকে যখন যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে তাহা তুমি সযত্নে সম্পন্ন করিয়াছ, এজন্য তুমি পুরস্কার পাইতে পার। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চ পর্চা খেলাত ও "রাজা মহাশয়" উপাধি দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রগণ এই উপাধি ধারণ করিবেন, ইহাতে কেহ কোনও আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ শফর ১০৯০ হিজরি।'

দিল্লীর দরবার হইতে রামেশ্বর যে ১২টী পরগণা পাইয়াছিলেন তাহাদিগের নাম যথা—

কলিকাতা, ধরসা, আমীরপুর, বালাণ্ডা, খালোর, মানপুর, সুলতানপুর, হাতিয়াগড়, মেদনমল, মাগুরা, কুবাজপুর ও কাউনিয়া।

রাজা রামেশ্বর ৪০১/ বিঘা ভূমি মধ্যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত ৪০১ বিঘার চতুঃপার্শ্বে পরিখা খনন পূর্ব্বক তাহাকে সুরক্ষিত করিয়া লইয়াছিলেন। গড়ের পাড় ৫০ হাত উচ্চ করিয়া তদুপরি কণ্টকময় বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। ভিতরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। দুর্গশিখরে ও পাহাড়ে কয়েকটী কামান রক্ষিত হইয়াছিল। আপদ্ বিপদের জন্য গড়ের ভিতরে নিয়ত কাল শস্য সঞ্চিত থাকিত। গড়ের ভিতরের ভূমি এরূপ ভাবে শস্যোৎপাদনের উপযোগী করিয়া রাখা হইত যে বহুকাল ধরিয়া শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রহিলেও দুর্গমধ্যস্থ লোকদিগের অন্নকষ্ট হইবে না। গড়ের ভিতরে প্রবেশের সেতু ছিল না। দিবসে গড়ের বাহিরে কাছারী হইত, নৌকাযোগে যাতায়াত চলিত। রাজা রামেশ্বরের গড় হইতে এই রাজবাটীকে এখনও 'গড়বাড়ী' বলে। পরিখার পরিধি প্রায় এক মাইল। অদ্যাপি গভীর জলপূর্ণ রহিয়াছে।

রাজা রামেশ্বর পাটুলির বাটী ত্যাগ করিয়া বাঁশবাড়িয়ার বাটীতে দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ১৬০১ শকাব্দে (১৬৭৯ খৃঃ) বাসুদেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রসংলগ্ন ইষ্টকে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। একখানি প্রস্তরফলকে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী উৎকীর্ণ রহিয়াছে—
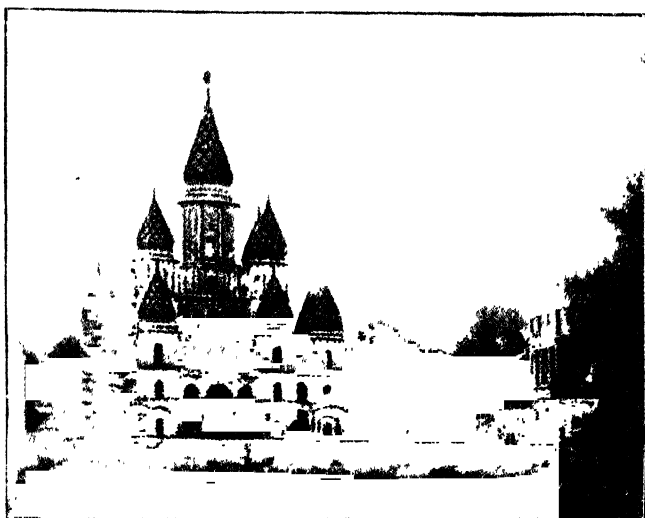
৯। বাঁশবাড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির

৬। গড়বাটীর তোরণদ্বার

৭। বাসুদেব-মন্দির

"মহীব্যোমাঙ্গশীতাংশুগণিতে শকবৎসরে,
শ্রীরামেশ্বরদত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরং। ১৬০১।"

নিজ নামের সহিত কোনও বিশেষণ বা মন্দিরপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই শ্লোকে নাই। রামেশ্বর নিরহঙ্কার ও নিষ্কাম।

রাজা রামেশ্বর রায় মজুমদারের তিনটী পুত্র, প্রথম পক্ষে রঘুদেব ও দ্বিতীয় পক্ষে মুকুন্দদেব ও রামকৃষ্ণ। তিন ভাই পৃথক্ হইলে জ্যেষ্ঠ রঘুদেব বাঁশবাড়িয়ায় রহিলেন এবং মুকুন্দদেব শিবপুরে ও রামকৃষ্ণ রাজহাটে বাস করিলেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর ১০৯৯ সালে সম্পত্তি বিভাগ হয়। তন্মধ্যে বাসুদেবের পুত্র মনোহর ও গঙ্গাধর ১ হিস্যা, রঘুদেব ১ হিস্যা এবং মুকুন্দদেব ও রামকৃষ্ণ ১ হিস্যা পাইয়াছিলেন। শেষোক্ত সম্পত্তির মধ্যে মুকুন্দদেব নয় আনা ও রামকৃষ্ণ সাত আনা পাইলেন। রামকৃষ্ণ রায়ের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় ক্রমশঃ সম্পত্তি বিভাগ হইয়া ঋণদায়ে অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার বংশধরগন বর্ত্তমানে সামান্য সামান্য সম্পত্তি লইয়া কোনরূপে দিনপাত করিতেছেন। মুকুন্দদেবের সম্পত্তির অধিকাংশ উক্ত বংশের দৌহিত্র হরিণাড়ার রাঘব বংশীয় রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোপীমোহন সিংহের পুত্র সন্তান ছিল না, এজন্য তাঁহার কন্যা ও জামাতা দিনাজপুরের প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন ও শিবপুরের বাটীতে বাস করিতেছেন।

রাজা রামেশ্বর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুদেব রায় বাঁশবাড়িয়ার গড়বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশে বর্গীদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে বহুলোক ধনরত্ন ও স্ত্রীপুত্রাদিসহ আসিয়া গড়মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। গড়ের মধ্যে এত লোকের স্থান দেওয়া সুবিধাজনক না হওয়ায় রাজা রঘুদেব পূর্ব্ব পরিখা সংস্কার করাইলেন ও তাহার চতুর্দ্দিকে আর একটী নূতন পরিখা খনন করাইলেন। এই দ্বিতীয় পরিখা মধ্যে বহুলোক স্থান পাইয়াছিল। এই গড়টী অদ্যাপি "বাহিরগড়" বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। একদা বর্গীরা গড়বাটী অবরোধ করিয়াছিল। কয়েক দিন অবরোধের পর রাজা রঘুদেব এক নিশায় অকস্মাৎ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সবলে মরাঠাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা ভয়ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে।

রাজা রঘুদেবের পুত্র গোবিন্দদেব একলক্ষ বিঘা ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও অনেকে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

রাজা গোবিন্দদেবের পুত্র রাজা নৃসিংহদেব পিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে অর্থাৎ সন ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খৃঃ) পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তখন বাঙ্গালা বেহারের মসনদে সমাসীন। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র আলিবর্দ্দী

খাঁকে সংবাদ দেন যে বাঁশবাড়িয়ার রাজা গোবিন্দদেবের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। বৰ্দ্ধমানের জমিদার একদা একটী ষড়যন্ত্র হইতে আলিবৰ্দ্দী খাঁর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যুপকার স্বরূপ আলিবৰ্দ্দী গোবিন্দদেবের অধিকাংশ সম্পত্তি বৰ্দ্ধমানের জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। পাঁচ মাসের শিশু নৃসিংহদেব শত্রুর কৌশলে বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এ সম্বন্ধে রাজা নৃসিংহদেব রায় স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

"সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়···সে কালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম বৰ্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে—খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্তপুস্তানীর জর খরিদা সনন্দী জমিদারি আপন মনিবের জমিদারি সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালের মাহ বৈশাখে খামাখা দখল করে ও হলদা পরগণা কিস্‌মতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল তিনিও ঐ সন কীসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রী·স্তুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাস্তা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল পীরখাঁ ফৌজদার বৰ্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না অতএব তালুক মজকুর আমার দখলে আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুকদারের পর এমত বেইনসাপী ও বেদায়ত কখনও হয় নাহি। রায়জন মুবারক জদি জমিদার ও তালুকদার সরকারের বাকীদাকী কিম্বা হাকামের সহিত সরকশী করে কীম্ব জমিদারি ও তালুকদারি বিক্রী করে ও ছাড়পত্র দেয় ইহাতে জমিদারি ও তালুক থাকে না এ সকল দফায় কোন প্রকারে আমার জমিদারি জায় নাহি আমার মিরাষ না হক অন্যে দখল করিয়াছে আমি জন্মাবধি মুরব্বি হীন হইল কালিষ মন্দ কিন্তু জমিদার মজকুরাণের জবরদস্তী ও কারসাজীতে বরে আজীজ ও আপন হক মিরাষ পাই না। সন ১১৯৪ সাল।"

উক্ত স্মারকলিপি হইতে জানা যাইতেছে কেবল মাণিকচন্দ্র কেন বাঙ্গালার বিশ্রুতকীর্ত্তি বিদ্বান্ ও ধাৰ্ম্মিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পৰ্য্যন্ত নাবালক নৃসিংহদেবের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়া নৃসিংহ পরিশেষে বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকৰ্ত্তা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শরণাপন্ন হইলেন। সহস্র দোষে দোষী হইলেও হেষ্টিংস সাহেবই প্রথমে সুশৃঙ্খলে ইংরাজ শাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস নৃসিংহ দেবের নিকট হইতে আনুপূৰ্ব্বিক অবস্থা অবগত হইয়া বৰ্দ্ধমানের রাজা কর্তৃক গৃহীত তাঁহার সম্পত্তিমধ্যে যাহা চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত হইয়াছিল তাহা নৃসিংহ দেবকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এবিষয়ে রাজা নৃসিংহদেব স্বহস্তে লিখিয়াছেন :—

"সন ১১৮৫ সালে গবর্ণর জনরল শ্রীযুক্ত মেস্তর্ হিষ্টীন সাহেব ও সাহেবান কৌষল হক ইন্‌সাপ মতে তজবিজ তহকিক করিয়া আমার মিরাষ জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারির মধ্যে যে সকল মহল বৰ্দ্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিষ পরগণার সামিল হইয়াছিল

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড

৩য় খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা

৮। রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড
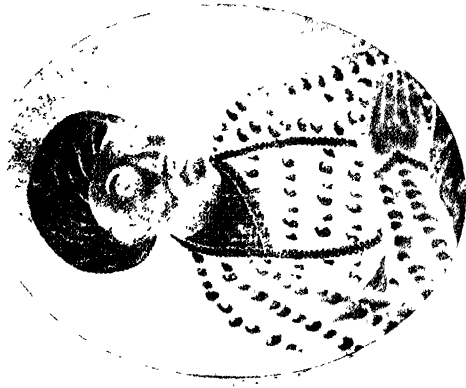
৩য় খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা

১০। রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয়

সেই মাহালতের জমিদারি ইস্তক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ও কৌন্‌শল ও কমিট হইতে সনন্দ দিয়াছেন।--পঃ বসিরহাটী ১, পঃ এক্তিয়ারপুর ১, কিঃ পঃ হাতিয়াঘর মাত্র নমকপুঞ্জ ও মোলপুঞ্জ ১, কী পঃ ময়দা ১, তপে সমুল কিঃ পঃ মাগুরা ১, কিঃ পঃ মানপুর এজমাঃ খড়দহ ১, = ৬।"

এই কয়েকটী ব্যতীত আরও তিনটী মোট নয়টী পরগণা নৃসিংহদেব ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলে নৃসিংহদেব তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কিয়দংশ তিনি পাইলেন, অবশিষ্ট সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের নিকট আবেদন করিতে বলিলেন। নৃসিংহদেব বিলাতের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকেন। ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে তিনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে কাশীধামে গমন করেন। সেখানে যোগীদিগের উপদেশ অনুসারে যোগমার্গ অবলম্বন করেন। সাত বৎসর মধ্যে সাত লক্ষের অধিক মুদ্রা সঞ্চিত হইল। বিলাতে আবেদন করিলে বিপুল ব্যয় হইবে অথচ ফল অনিশ্চিত এই ভাবিয়া তিনি তাহা না করিয়া একটী স্থায়ী কীর্ত্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ষট্‌চক্রভেদ প্রণালীতে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। তিনি এই মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার পত্নী রাণী শঙ্করী এই নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন এবং স্বীয় পতির উপদেশানুসারে উক্ত মন্দির মধ্যে পরাশক্তির বিকাশস্বরূপা হংসেশ্বরী দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণকৌশল যোগী ব্যতীত অপরের বোধগম্য নহে। শকাব্দ ১৭৩৭ বা (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। মন্দিরসংলগ্ন প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে--

"শাকাব্দে রসবহ্নিমৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বারচতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরীরাজিতং॥
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে।"

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার প্রভৃতি সরকারী বহু পুস্তকে এই মন্দিরের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার স্থাপত্য পরিদর্শন জন্য বহু শিল্পী এবং মন্দির দর্শন জন্য ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে বহু যাত্রী ও যোগী সন্ন্যাসী বাঁশবাড়িয়ার রাজবাটী আসিয়া থাকেন।

রাজা নৃসিংহদেবের অপর কীর্ত্তি স্বয়ম্ভবা মন্দির। হংসেশ্বরী মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে—

"আশাচলেন্দুসম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎস্বয়ম্ভবা
রেজে তৎশ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেবদত্ততঃ।"

১৭১০ শকাব্দ বা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা নৃসিংহদেব সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। চিত্র ও সঙ্গীতবিদ্যায়ও তাঁহার অসাধারণ নিপুণতা ছিল। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি গান এখনও সাধারণে গীত হইয়া থাকে। রাজা নৃসিংহদেব উড্ডীশতন্ত্র বাঙ্গলা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ড অনুবাদে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার কাশীখণ্ড গ্রন্থে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"* * * পাটুলি নিবাসী। শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥
যাঁর সহ জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা। প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥
* * * * * *
তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া। মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া। লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুধিয়া॥
* * * * * *
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার। রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার॥"

রাজা নৃসিংহদেবের পরলোকগমনের পরে তাঁহার দত্তকপুত্র রাজা কৈলাসদেব রায় তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু রাণী শঙ্করী স্বহস্তে সমস্ত কর্তৃত্ব রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ বিষয় বুদ্ধি ছিল ও স্বয়ং জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রত্যেক পরগণায় গিয়া প্রজাদিগের সংবাদ লইতেন। তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে ডাকিয়া স্বহস্তে মিষ্টান্ন বিলি করিতেন। এজন্য বৃদ্ধ প্রজারা এখনও প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাণী শঙ্করীর নাম স্মরণ করিয়া থাকে। রাণী সকলকেই সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার দান এত অধিক ছিল যে তাঁহার স্বামীর পরলোক গমনের পর যত দিন জীবিত ছিলেন তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকা তিনি সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় কালীঘাটের নিকটে তাঁহার একটী বাড়ী ছিল। কলিকাতার মিউনিসিপালিটি রাণীর নামে স্মৃতিরক্ষা জন্য তথায় একটী গলির নাম "রাণী শঙ্করী লেন" রাখিয়াছেন। তথায় তাঁহার বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন।

রাণী শঙ্করীর পুত্র রাজা কৈলাস দেব ১২৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি একটী পুত্র রাজা দেবেন্দ্র দেব ও তিনটী কন্যা রাখিয়া যান, তন্মধ্যে একটী কন্যার বিবাহ কান্দী রাজবাটীতে সুবিখ্যাত লালাবাবুর পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহের সহিত হইয়াছিল। তাঁহার নাম ছিল রাণী করুণাময়ী।

রাজা দেবেন্দ্রদেব সন ১২৫৯ সালের বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাস পরে রাণী শঙ্করী মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে রাজা দেবেন্দ্র দেবের

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা পূর্ণেন্দুদেবের বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, অপর দুইটী পুত্র কুমার সুরেন্দ্রদেব ও কুমার ভূপেন্দ্রদেব নিতান্ত শিশু ছিলেন। রাণী করুণাময়ীর পুত্রদ্বয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ নাবালকদিগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজা পূর্ণেন্দু দেব অল্প বয়স হইতেই বিষয় কর্ম্ম পরিদর্শন ও সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি কোম্পানী বাহাদুরকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন ও তজ্জন্য ধন্যবাদ লাভ করেন। তাঁহার সাহায্যে কয়েকটী পাকা ও কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও টোল সংরক্ষণ করিয়া তিনি স্থানীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বহু সভা সমিতির সভ্য ও কোন কোনটীর সভাপতি ছিলেন। বঙ্গের ছোটলাট মেকেঞ্জি সাহেব তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন ১৩০৩ সালের ১১ই শ্রাবণ তারিখে তিনি পরলোক গমন করায় উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। রাজা পূর্ণেন্দু দেব সন ১৩০২ সালে তাঁহার মাতা রাণী কাশীশ্বরী দ্বারা তুলাপুরুষ দান করাইয়া ছিলেন।

রাজা পূর্ণেন্দু দেব রায় চারিটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন—১ম রাজা সতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ২য় কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ৩য় কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ও ৪র্থ কুমার রমেন্দ্রদেব রায় মহাশয়। রাজা সতীন্দ্রদেব রায় অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিবার পর ক্ষিতীন্দ্রদেব "রাজা মহাশয়" হইলেন। হুগলী জেলার দরবারীদিগের নামের ও আসনের সর্ব্বপ্রথমে ইঁহার নাম রহিয়াছে এবং ইনি সকল দরবারেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নিকট পরিচয় (Presentation) করিয়া দিবার সময় তদানীন্তন লাটসাহেব সার উইলিয়ম ডিউক সাহেব রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়কে 'বাঙ্গলার সর্ব্ব প্রধান রাজবংশধরগণের মধ্যে ইনি একজন' বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাটের শোভাযাত্রার নিমিত্ত যে তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল, বাঁশবাড়িয়া-রাজবংশের 'কোট অব আর্ম্‌স্' অর্থাৎ রাজচিহ্নের অনুকরণে একটী প্যারিস প্লাষ্টার নির্ম্মিত ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া উক্ত তোরণোপরি সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল ও তাহার ছায়া-চিত্র সম্রাটের সহিত দেওয়া হইয়াছিল।

বাদশাহ অরঙ্গজেবের প্রদত্ত সনদ খানি লইয়া গবর্ণমেণ্ট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘরের Document's Gallery বা দলিলাদি রাখিবার কক্ষে উচ্চ স্থানে রাখিয়াছেন ও তজ্জন্য তাঁহাকে বড়লাটের পক্ষ হইতে ধন্যবাদজ্ঞাপক একখানি সনদপত্র দিয়াছেন। ঐ পত্র-প্রেরক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর রায় বাহাদুর বি. এ. গুপ্তে ইংরাজী ভাষায় একখানি বাঁশবাড়িয়া-রাজবংশের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা Historical Records Commisionএর পুনার অধিবেশনে পাঠ করা হইয়াছিল।

১৯১৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের সংস্কার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক,

১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনে এবং ১৯২৬ সালের কৃষি তথ্যানুসন্ধানের কমিশনে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেবের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল।

এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলিকাতা হিষ্টরিকাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি অনেক সভা সমিতিতে ইনি সভ্য রহিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু Major Weigall R. A, সাহেবের সাহায্যে তিনি সপ্তগ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে বেলভেডিয়ার কনফারেন্সে তিনিই প্রথমে সরস্বতী নদীর পুনঃ সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর কাল তিনি বাঁশবাড়িয়ার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবের একটী মাত্র পুত্র—কুমার মানবেন্দু দেবরায়।

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় একজন সুলেখক। রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব ও তিনি "The Eastern Voice" নামে একখানি ইংরাজী ভাষায় দৈনিক ও "The United Bengal" নামে একখানি ইংরাজী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি "হুগলী-কাহিনী", "Decadence of Rural Bengal", "History made by Ruins" প্রভৃতি বহু পুস্তক লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নানা সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। বাঁশবাড়িয়া-রাজবাটী হইতে 'পূর্ণিমা' নামে যে মাসিক পত্রিকা বাহির হইত, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব ও কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় বহু দিন তাহার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা ও কায়স্থসমাজ প্রভৃতি বহু সভা সমিতিতে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব ও কুমার মুনীন্দ্রদেব যোগ দিয়া থাকেন। কুমার মুনীন্দ্রদেবের পাঁচটী পুত্র মধ্যে বড়টী বি, এ ও মধ্যমটী এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষা, সামাজিক সংস্কার ও সাধারণ হিতকর সকল কার্য্যেই রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব ও কুমার মুনীন্দ্রদেবের উৎসাহ রহিয়াছে।

রাজা পূর্ণেন্দু দেবের ভ্রাতা কুমার সুরেন্দ্র দেব রায় বাঁশবাড়িয়া মিউনিসিপালিটির চেয়ার-ম্যানের কার্য্য করিয়া স্থানীয় অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি হুগলী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেম্বর ছিলেন। তিনি অতি সদাশয় ও সাধারণের ভক্তিভাজন ছিলেন। সালিশী মীমাংসা দ্বারা অনেকের গৃহ বিচ্ছেদ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দান ও মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্র দেব রায় পিতার স্থানে কার্য্য করিয়া অল্প বয়সেই পরলোকগমন করেন।

কুমার ভূপেন্দ্র দেব রায় লর্ডসিংহের ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্র কুমারেন্দ্র দেব রায়কে রাখিয়া তিনি অল্প বয়সেই পরলোকগমন করেন। যশোরের কুমার জ্যোতিষকণ্ঠ রায়ের সহিত তাঁহার একটী কন্যার বিবাহ হয়। কুমার কুমারেন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের লোকরঞ্জন শক্তি অতি অদ্ভুত। তিনি শত্রুকেও আপনার করিতে পারেন।

বাঙ্গলার লাট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত উচ্চপদস্থ সকল রাজপুরুষই বাঁশবাড়িয়া-রাজবাটী গমন করিয়া রাজবংশধরগণকে সম্মানিত করিয়া থাকেন। [১০৭ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড ৩য় খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা

১১। রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

কেশদত্তের ধারা
বাঁশবাড়িয়া-রাজবংশ
১৪ ঈশ্বর দত্ত (কেশোবাটী) (৭২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
১৫ কেশোদত্ত
বিষ্ণুদত্ত (দিনাজপুর)
১৬ দ্বারকানাথ
১৭ শ্রীমুখ
১৮ সহস্রাক্ষ (সমাজপতি)
১৯ উদয় রায় (বাস পাটুলী)
২০ জয়ানন্দ রূপরাম কাশীরাম শিবরাম
মজুমদার
২১ রামনাথ রাজীবলোচন রাজা রাঘবেন্দ্ররায় মহাদেব গোপাল
ভবানন্দ
২২ মথুরেশ রাজা রামেশ্বররায় মহাশয় (বংশবাটী) বাসুদেব
রামেশ্বর কাশীশ্বর হরেকৃষ্ণ কন্দর্প
দর্পনারায়ণ
গোপীনাথ
রাজা মনোহর (দশআনিশেওড়াফুলি)
গঙ্গাধর (ছয়আনি বালি)
২৩ রাজা রঘুদেব রায় কামদেব মুকুন্দদেব রামকৃষ্ণ
(নয়আনা শিবপুর) (সাতআনা রাজহাট)
২৪ ,, গোবিন্দদেব রায়
২৫ ,, নৃসিংহদেব ,, ২৪ কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবন গোপীনাথ
২৬ ,, কৈলাসদেব ,,
২৫ নন্দকুমার
হরিনাথ রাধানাথ
২৭ ,, দেবেন্দ্রদেব
২৬ শিবচন্দ্র ভৈরব কীর্ত্তিচন্দ্র
২৮ রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় সুরেন্দ্র ভূপেন্দ্র
ঈশ্বর প্রতাপ শ্রীশ রমেশ পরেশ শম্ভু অপ্রত্যয়
বীরেন্দ্র কুমারেন্দ্র
অবনী
কালী প্রসন্ন অভয়
ধীরেন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র সোমেন্দ্র
সতীন্দ্র ২৯ ক্ষিতীন্দ্র (রাজা মহাশয়) মুনীন্দ্র রমেন্দ্র শোভেন্দ্র ধ্রুবেন্দ্র কনকেন্দ্র অলকেন্দ্র তপনেন্দ্র
প্রণয়েন্দ্র
৩০ মানবেন্দু
প্রণবেন্দু বলেন্দ্র বিনয়েন্দ্র বিজয়েন্দ্র কনকেন্দ্র বুদ্ধেন্দ্র

রাজহাটের সাত আনী মহাশয়-বংশ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজ রামেশ্বর রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ রায় মুকুন্দদেব রায়ের সহিত সম্পত্তি বণ্টনকালে মুকুন্দদেব নয় আনা ও তিনি সাত আনা অংশ পাইয়াছিলেন। উক্ত সাত আনা অংশ লইয়া তিনি রাজহাটে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। উক্ত সাত আনা তাঁহার দুই পুত্র মধ্যে বিভক্ত হইলে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত দশ আনা ও কনিষ্ঠ গোবিন্দকিশোর ছয় আনা পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য রাজবংশ জাত হইলেও তাঁহারা রঘুদেবের বা মনোহর রায়ের বংশধরগণের ন্যায় রাজা বা রাজকুমার উপাধি ব্যবহার করিতেন না। তাঁহাদিগের বংশে মাত্র 'রায় মহাশয়' উপাধি এখনও চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণকান্তের আটটি পুত্র মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ কালীপ্রসাদ বালির দুর্গাপ্রসাদ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত হইয়া তথায় বাস করেন। সপ্তম পুত্র রামকেশবের ছয়টি পুত্র মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রামরতন বাঁশবাড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক দত্তক পুত্র গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল রাজা কৈলাস দেব রায় মহাশয়। অপর দিকে কৃষ্ণকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপ্রসাদের পৌত্র করুণাসিন্ধু সেওড়াফুলীর রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা পত্নী কর্ত্তৃক দত্তক পুত্র গৃহীত হওয়ায় রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় নাম হইয়াছিল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে বাঁশবাড়িয়া, সেওড়াফুলী ও বালি এই তিন রাজবংশের ধারা কৃষ্ণকান্তের সন্তানগণ হইতে রক্ষিত হইয়াছিল। রামকেশবের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রমোহন উচ্চ শিক্ষিত ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রাজহাট গ্রাম ম্যালেরিয়া গ্রস্ত হইলে শ্রীরামপুরের গোসাঁই বাবুগণের অনুরোধে চন্দ্রমোহন শ্রীরামপুরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন। তথায় চন্দ্রমোহন রায় ষ্ট্রীট নামে একটী রাস্তা রহিয়াছে। চন্দ্রমোহনের ছয়টী পুত্র মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শরদিন্দু শ্রীরামপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার ছিলেন। তিনি সাধারণ পেস্কার ছিলেন না। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। শরদিন্দুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্র একজন বুদ্ধিমান্ ও কৃতী পুরুষ। তিনি বারাণসীতে বাস করিতেছেন ও ইঞ্জিনিয়র এবং কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিয়া বেশ উন্নতিলাভ করিতেছেন।

চন্দ্রমোহন রায়ের তৃতীয় পুত্র জগদিন্দুরায় মহাশয় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ মধ্যে একটী উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার মৌলিক গবেষণার ফলগুলি পৃথিবীর সকল জাতিরই সম্পত্তি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে কার্য্য করিতে থাকেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কলেজে থাকিয়া তিনি অধ্যাপক (পরে Sir) জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে তাঁহার মৌলিক গবেষণায় বহু সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি আলোক (light) সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। উক্ত গবেষণার নূতনত্ব দেখিয়া স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে লইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লেক্‌চারারের পদে নিযুক্ত করেন।

উপরি উক্ত গবেষণাটী ১৯০৮ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিনগরীস্থিত Societe

Francaise De Physique নামক বৈজ্ঞানিক সমিতির গোচরীভূত হয়। প্রবন্ধ মধ্যে মৌলিক সত্য পাইয়া উক্ত সমিতি তাহা গ্রহণ করেন ও তাহা Journal De Physique নামে উক্ত সমিতির পরিচালিত পত্রিকায় প্রচার করেন। জগদিন্দু রায় মহাশয় এই মৌলিক গবেষণাটি বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচারিত করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এর কর্তৃপক্ষদিগের শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে কর্ণপাত করিলেন না। পরে তিনি লণ্ডন নগরীস্থিত রয়াল সোসাইটির সভাপতি লর্ড রেলের নিকট তাঁহার প্রবন্ধটী পাঠাইলেন। প্রবন্ধটী বড় সুতরাং তাঁহার পাঠের অবকাশ নাই, অন্য কোনও সভ্যের সহিত পরিচয় থাকিলে তাঁহার সাহায্যে রয়াল সোসাইটীতে এই প্রবন্ধটী উত্থাপন করিবেন, এই মর্ম্মে জগদিন্দু রায় মহাশয়কে তিনি একখানি পত্র দেন। কিন্তু অন্য কোনও সভ্যের সহিত জগদিন্দুর পরিচয় না থাকায় অগত্যা তাঁহাকে নিরস্ত থাকিতে হইল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল ফ্রান্স দেশে প্যারি নগরীর 'সোসাইটী ফ্রাঙ্কেইস্ ডি ফিজিক্' নামে যে বিজ্ঞান সমিতি রহিয়াছে, প্রেসিডেন্সি কলেজে কার্য্য কালে উক্ত সমিতির জনৈক সভ্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার নিকট প্রবন্ধটী প্রেরণ করিলে তথায় পঠিত ও গৃহীত হইতে পারে। কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। অধীনস্থ জাতির গবেষণার ফল রাজার জাতির গ্রাহ্য না হইলেও স্বাধীনতাপ্রিয় ফরাসী জাতির নিকট সাদরে গৃহীত হইল এবং তাহা বিজ্ঞানশাস্ত্রে স্থান পাইল। উক্ত গবেষণার পরিপোষকতায় জগদিন্দু আর একটী মৌলিক গবেষণা উদ্ভাবন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করেন ও তাহা গৃহীত হইয়াছিল। সাহিত্যপরিষদের বর্দ্ধমান ও যশোহরের অধিবেশনে তিনি অনেক গুলি মৌলিক গবেষণার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ও কলেজিয়ান নামক পত্রিকায় তাঁহার অনেক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। জগদিন্দু বাবু সম্প্রতি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া শ্রীরামপুরে বাস করিতেছেন। [১১০ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

সেওড়াফুলীর রাজবংশ-কারিকা

শুকদেব সিংহ উক্ত রাজবংশের এইরূপ কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন—

"মনোহর গ্রহণ যুগ্ম কঙ্কবান্ নিধি। আগে সেই মীনে রাজারাম জনার্দ্দনে বিধি।
আদি পক্ষ শূন্য তায় সধর ধারা পরে। সুতা দান সুতে গ্রহণ ডাক সরসি ঘরে।
আগে মাধো দীপ্ত নির্ম্মল রাঘবী হরিশআড়া। শেষে লেবে শ্যাম ভুবন নাম পাটুলীতে খড়া।
সুতে গ্রহণ গোবিন্দ কুলী ডাকে আমইপাড়া। তাথে আছে আনুয়া জুলী চান্না ঘনশ্যামী বাড়া।
গঙ্গাধর সুন্দর বাৎস্য বিভা দুই। শেষে কেয়ামপুর করিলা সেটী রঘুর ভাবে থুই।
মুকুন্দে গোবিন্দ বাসু ডাকে ক্ষেম্য কুলে। অনুজে দেখিয়ে লভ্য কারফরমা মূলে।
দুই ভাইর তনয় ঘোষে দাসে অনুগত। ঘোষ হইতে দাস খড়া কুলজ্ঞের মত।

[পরবর্ত্তী অংশ ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

রাজহাট-রাজবংশ
২৩ রামকৃষ্ণ (রাজহাট) (১০৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
২৪ কৃষ্ণকান্ত (সাতুরায়)
গোবিন্দ
২৫ হরিপ্রসাদ
রামনারায়ণ
বৃন্দাবন
গঙ্গানারায়ণ
(শিবনারায়ণ)
দেবীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
২৫রামকেশব
কালীপ্রসাদ
(দত্তকগত)
শম্ভু
ভৈরব
রামকানাই
রামধন
নকুড়
পঞ্চানন
ঈশান
২৬ বিষ্ণুপ্রসাদ
২৬ ঠাকুরদাস
২৬ শ্রীরাম
রামরতন
গোপীমোহন
(দত্তকগত)
রাধামোহন
ব্রজমোহন
কৃষ্ণমোহন
২৬চন্দ্রমোহন
চন্দ্র
নবীন
মহেন্দ্র
কালী
দেবপ্রসাদ
২৭ রামচন্দ্র
ঈশ্বর
গিরিশ
গোলক
২৭দীনবন্ধু
গুণসিন্ধু
কৃপাসিন্ধু
করুণাসিন্ধু
(দত্তকগত)
গোপাল
হরিশচন্দ্র
গৌর
গৌরীশঙ্কর
তারা
হরি
জ্ঞান
চন্দ্র
কৃষ্ণ
বৃন্দাবন
বিপিন
২৮ আশুতোষ
রাজেন্দ্র
২৫শরদিন্দু
হেমেন্দু
জগদিন্দু
পূর্ণেন্দু
জ্ঞানেন্দু
গগনেন্দু
২৯গোবিন্দ
সিদ্ধেশ্বর
কালী
শ্যামা
উমা
সারদা
শ্রীপতি
মথুরা
মাধব
গোকুল
২৮ নবান
অঘোর
গিরীন্দ্র
শৈলেন্দ্র
মণীন্দ্র
রমেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
শচীন্দ্র
অচিন্ত্য
নৃপেন্দ্র
মনীন্দ্র
ধীরেন্দ্র
হীরেন্দ্র
সম্মোহন
২৯ কান্তি
শুভেন্দু
সুধীন্দু
৩০ সতীপ্রসাদ
রজনী
৩০ নারায়ণ
সুশীলকান্ত
২৮ রবীন্দ্র
সৌরেন্দ্র
যতীন্দ্র
দীপেন্দ্র
দ্বিজেন্দ্র
৩১ক্ষিতি
গুরু
জ্যোতি
২৯ অর্দ্ধেন্দু
অমলেন্দু
বিমলেন্দু
পূর্ণেন্দু
অচলেন্দু
অনিলেন্দু
বিমানেন্দু
ধামানেন্দু

সুতা দানে মুকুন্দ রায়ের তেজ দেখি ঘরে। গোবিন্দ কুলী আমইপাড়ায় দীপ্তকরণ করে।
কেশে উদয় কুলে রামকৃষ্ণে দান চারি দেখি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কান্ত গোবিন্দ পুত্র নেত্র লিখি।
দান কুলাই শ্রীকৃষ্ণ সুত কৃষ্ণদেব ঘোষে। পরে সেই কুলাই আনন্দী সুত প্রসাদেতে শেষে।
মাধে ঈশ্বরাংশে চন্দ্রসুত সদাশিবে পাই। পরে জগদীশ তনয় কিশোর বংশ গোবিন্দাই।
কৃষ্ণরায়ে গ্রহণ আগে মহীপতিপুর দাসে। মাধে জোলকুল রসিক সুতা মিত্রগত শেষে।
আদি পক্ষ দান মোক্ষ দেখি তাজা ঘোষে। কুলাই মীনে দুখু সুত কাশীপুর বাসে।
কৃষ্ণকান্তে বিভা তিন যুগল সিংহ খোলে। গোবিন্দে পার্ব্বতী মাধ ভিকু জোলকুলে॥
আগে দুই সিংহে বিভা সমাধিকরণ। কেনে পক্ষশেষে বর্দ্ধ্বা মানকর গমন।
আদি পক্ষ শূন্য তায় বংশদ্বয়ে পরে। মধ্যমেতে হরিপ্রসাদ পূর্ণ উদয় করে।
দান গোবিন্দে বিশ্বাস কুলে বল্লভী তনয়। তারা তনে গণে সরস ভাব স্বদেশ আলয়॥"

মনোহরষ্টক।

"পিতৃভূদান অন্তে পুত্র স্বরস জাহ্নবী। সুপুত্রশ্চ পুনর্জ্জন্ম চাষ্টক মনোহর শ্রুতং॥
পিতৃরাজ্যে রাজত্ব যাবৎ ক্ষিতিমণ্ডলে। দ্বিজে ভূমি সদাব্যয় অহর্নিশি বৎসরে।
অর্দ্ধান্ন ন্যূন দান গ্রাম নাহি রাজ্যমণ্ডলে। দত্ত মনোহর তুল্য দৃষ্ট নাহি ভূতলে।১
ভূদানশ্রুত কর্ণাহৃত চক্ষুপ্রীতি ক্ষোভিত। অদানি দানি দোহে শুনি পাপ পুণ্যে অর্জ্জিত।
তত্ত্বজ্ঞানী হৃষ্ট মানি সাধু সাধু সে বোলে। দত্ত মনোহর তুল্য দৃষ্ট নাহি ভূতলে।২
অন্তকালে বিজ্ঞাপনে জনে জনে মেলানি। চিরদিন তীর্থসেবা সদা কৃষ্ণকাহিনী।
ভীষ্ম পরীক্ষিৎ যেন সভা করিয়া চলে। দত্ত মনোহর তুল্য দৃষ্ট নাহি ভূতলে।৩
পুত্র পৌত্র দৌহিত্র জামাতা কন্যকাগণে। জ্ঞাতি পুরোহিত আদি কুটুম্ব সর্ব্ব বেষ্টনে।
অন্তকালে গঙ্গাজলে হরি হরি সে বলে। দত্ত মনোহর তুল্য দৃষ্ট নাহি ভূতলে।৪
স্ববশেতে সর্ব্বেন্দ্রিয় চির আত্তি ভুগিয়া। রাজ্য অংশ নিজ বংশ স্বাভাবিক থুইয়া।
যজ্ঞ দান মহেশ্বরে আর্ত্ত সীমা যে করে। দত্ত মনোহর তুল্য দৃষ্ট নাহি ভূতলে।৫
জাহ্নবী পশ্চিমকুলে অন্তর্জলে থাকিয়া। কৃষ্ণসেবা কুলদেবা অগ্রভাগে রাখিয়া।
তুলসী অঞ্জলি ইষ্টে প্রাণত্যাগ যে করে। দত্ত মনোহর তুল্য দৃষ্ট নাহি ভূতলে।৬
শুভাদৃষ্টে অন্তকালে পরলোকে সুগতি। ইয়ং গঙ্গা অহং ম্রিয়ে শুদ্ধজ্ঞানে মুকতি।
মনোবাঞ্ছা সর্ব্ব পুণ্য ভাগ্যবলে সে চলে। দত্ত মনোহর তুল্য দৃষ্ট নাহি ভূতলে।৭
পুত্র রাজচন্দ্র যস্য বংশকুলদীপকঃ। স্থানে স্থানে দেবার্চ্চনা সদা ইষ্টপূজকঃ।
স্বভাবিক বর্ণন ইহ শুকদেব যে বলে। দত্ত মনোহর তুল্য দৃষ্ট নাহি ভূতলে।৮"

"কেশে উদয় রাঘব ঘর, পাক সরসি মনোহর। গৃহে নিধি দুর্লভ দানি, ভুবনে পূরিল হরিধ্বনি।
শুন চন্দ্রে আমইপাড়া, তস্য দান সানন্দে খড়া। বদনে সন্তোষ জন্ম, রাজার গণে সিদ্ধ মর্ম্ম।
ধারা রাধা প্রতাপসিংহে, বংশহীনে হর্ষভঙ্গে। আনন্দে গোপাল বংশী নাড়ি, গ্রীবা দীর্ঘ বকে বড়ি।
মনোহর মানসরো জলে, চক্রবাক হংসে ছলে।"

শেওড়াফুলীর রাজবংশ বিবরণ।

পাটুলির দত্তরাজবংশের ইতিহাসের স্থচনায় উল্লেখ করিয়াছি কেশ দত্ত বা কৃষ্ণ দত্ত এবং বিশু দত্ত বা বিষ্ণু দত্ত প্রথমে দত্তবাটীতে বাস করিতেন। শেওড়াফুলীর রাজবংশীয়গণ বলেন, বিষ্ণু দত্ত একদা ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে গমন করিয়া কোনও বাদশাহের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন ও তথা হইতে দেশে ফিরিয়া দত্তবাটী না গিয়া অগ্রদ্বীপে বাস করেন ও তথায় ৺কৃষ্ণদেব বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পরগণা মহম্মদ আমীনপুর উক্ত দেবের দেবোত্তর করিয়া দেন। পুনরায় কর্ম্মস্থলে গিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা তিনি প্রথমে বহু সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে আরও উন্নতি লাভ করিয়া উত্তরবঙ্গে গমন করেন। তথায় সম্ভবতঃ তাঁহার জ্ঞাতি ও গৌড়াধিপ যত্নর অনুগ্রহে পদ্মার উত্তর হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমির কানুনগো পদ লাভ করিয়াছিলেন। তখন তিনি কেশ দত্তের বংশধরকে অগ্রদ্বীপের সম্পত্তি অর্থাৎ বর্ত্তমান্ মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ হইতে ভাগীরথীর উভয়পার্শ্বে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের আধিপত্য প্রদান করেন। কেশ দত্ত অগ্রদ্বীপে যান নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র দ্বারকানাথ তথায় গিয়া বাস করেন। দ্বারকানাথের পুত্র শ্রীমুখ ও তৎপুত্র সহস্রাক্ষ অগ্রদ্বীপে বাস করিতেন। প্রবাদ আছে, সহস্রাক্ষ দত্ত ব্রাহ্মণগণকে বহু ভূমিদান করিয়া যশোভাগী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৈনন্দিন দান এত বেশী ছিল যে তাঁহার সমসাময়িক কোনও রাজা সেরূপ যশস্বী হইতে পারেন নাই। তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ এজন্য ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া সহস্রাক্ষ দত্তের অধিকাংশ সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পরে সম্রাট্ আকবর শাহের রাজত্বকালে বৃদ্ধ সহস্রাক্ষ দত্তের পুত্র উদয় দত্ত সুবে বাঙ্গলার ওয়াশীল তুমার জমা কালে রাজা টোডরমল্লকে বিশেষ সাহায্য করায় রাজা মানসিংহ ও রাজা টোডরমল্লের অনুরোধে সম্রাট্ আকবর শাহ বঙ্গাব্দ ৯৮০ সালে (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে) সহস্রাক্ষ দত্তকে কয়েকটী পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বাঁশবাড়িয়ার রাজবিবরণ হইতে জানা যায় শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণদেব বিগ্রহ এই সহস্রাক্ষ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সহস্রাক্ষ দত্তের মৃত্যুর পর অগ্রদ্বীপ গঙ্গায় গ্রাস করিলে উদয় দত্ত ভাগীরথীর পশ্চিম পারে পাটুলিতে রাজধানী স্থাপন করেন। উত্তরকালে শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ ঠাকুরের পিতৃ শ্রাদ্ধের মেলা উপলক্ষে একদা ৫।৬ জন লোকের মৃত্যু হয়। তখন মুর্শিদাবাদে নবাবদিগের শাসনকাল। পাটুলির রাজাদিগকে খুনের জন্য দায়ী করিলে তাঁহাদিগের উকিল দরবারে জানাইলেন উক্ত সম্পত্তি পাটুলির রাজাদিগের নহে, বর্দ্ধমানের রাজ-উকীলও ঐরূপ অস্বীকার করিলেন। নবদ্বীপের রাজা রঘুনাথ রায়ের উকীল চতুর ছিলেন, তিনি উক্ত অগ্রদ্বীপের স্বামিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন এবং নানা প্রকারে নবাবের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া রঘুনাথকে খুনের দায় হইতে মুক্ত করিলেন। তদবধি অগ্রদ্বীপ পাটুলির রাজাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া নবদ্বীপাধিপতির অধিকারে রহিয়াছে।
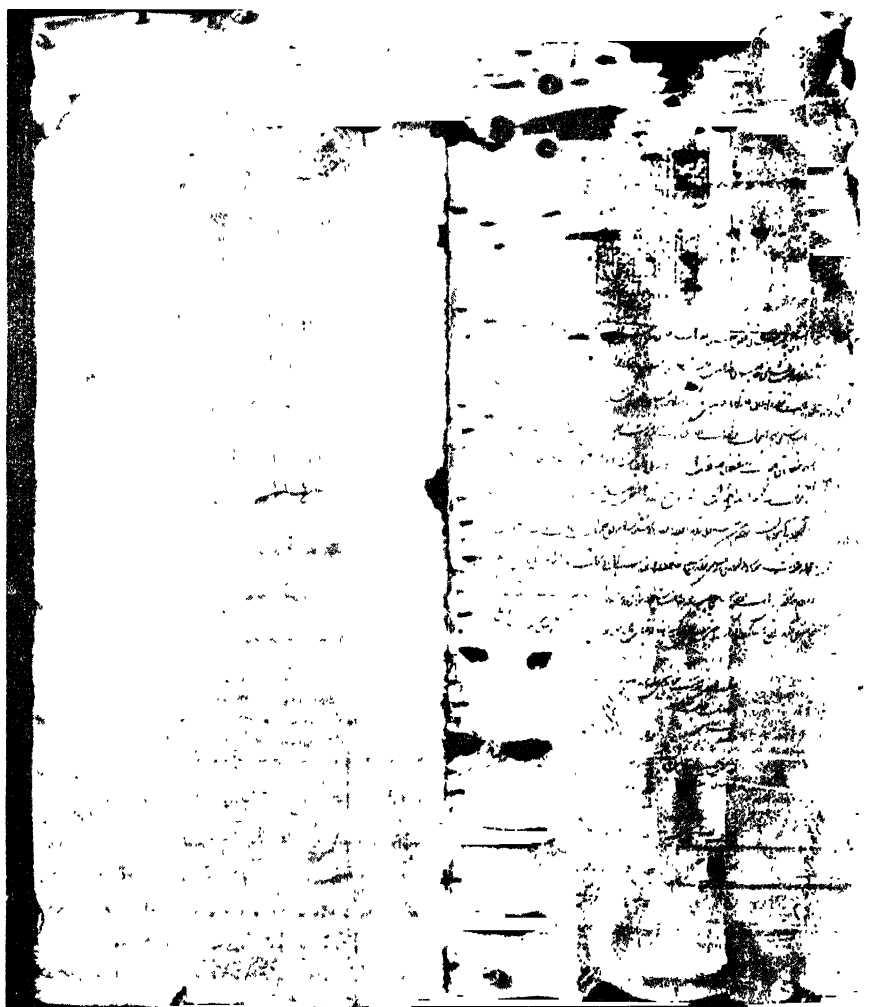
১ বাদশাহ শাহজহান দত্ত রাঘবেন্দ্র দত্তের রাজা উপাধির সনদ

২। শাহসুজা প্রদত্ত রাঘবেন্দ্র রায়ের রাজা উপাধির সনদ

উদয় দত্ত স্বনামখ্যাত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের সভা। তিনি উক্ত সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। বহু কুলীন কায়স্থকে তিনি স্বীয় অধিকার মধ্যে বাস করাইয়াছিলেন এবং অনেকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আকবর শাহের নিকট হইতে ইনি 'রায় মহাশয়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

উদয় দত্তের পুত্র জয়ানন্দ দত্ত বঙ্গের তদানীন্তন সুবাদার কাসেম খাঁ জুয়ানী কর্ত্তৃক কানুনগোই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাদশাহ শাহজাহান তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রথমে মজুমদার ও পরে বংশানুক্রমে 'রাজা মহাশয়' উপাধি প্রদান করেন এবং ফার্ম্মাণের সহিত খেলাত স্বরূপ স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত একখানি দুই মুখী তরবারি প্রদান করেন। উক্ত তরবারিতে পারসী অক্ষরে খোদিত রাজাদেশ লিখিত রহিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি তাহা দুষ্পাঠ্য বা অপাঠ্য হইয়াছে। (১)

জয়ানন্দ সর্ব্বসমেত ৭২টী পরগণার জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র মধ্যে তৃতীয় পুত্র রাঘব রায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই পাটুলির রাজবংশের ধারা চলিয়া আসিতেছে। তিনি হিজরি ১০৬৬ সালের রবিউল্ আউয়ল মাসের ১২ই তারিখে সম্রাট্ শাহজহানের পুত্র শাহসুজার নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাঘব রায় মজুমদার চৌধুরী মহাশয় ২২টী পরগণা জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। রাঘব সম্পত্তি পরিদর্শনের সুবিধার জন্য সপ্তগ্রামের নিকটে বাঁশবাড়িয়া গ্রামে একটী কাছারীবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত বাটী পরে বাঁশবাড়িয়া রাজবাটী নামে খ্যাত হইয়াছিল।

রাজা রাঘবেন্দ্র রায়ের দুইটী পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামেশ্বর ও কনিষ্ঠ বাসুদেব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রামেশ্বর অধিকাংশ সময় বাঁশবাড়িয়ার বাটীতে বাস করিতেন এবং বাসুদেব পাটুলির বাটীতে থাকিতেন। তখনও সমস্ত সম্পত্তি এজমালি ছিল। রামেশ্বরই সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে 'রাজা মহাশয়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং আরও ১১টী পরগণার সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাসুদেবের দুই পুত্র প্রথম পক্ষে রাজা মনোহর রায় ও দ্বিতীয় পক্ষে গঙ্গাধর রায়। রামেশ্বর মৃত্যুর পূর্ব্বে সন ১০৯৯ সালে যেরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন তদনুসারে তাঁহার পুত্রগণ ও বাসুদেবের পুত্রগণ মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ হইয়াছিল। সন ১১৯৪ সালের লিখিত একখানি হকিকৎ জমিদারী ও কুর্‌সীনামার নকল সেওড়াফুলীর রাজবাটীতে ও আর একখানি নকল—কাগজ, কালী ও লেখা একই প্রকার—রাজহাটের ৺শরদিন্দু রায়ের

(১) উক্ত তরবারিখানি এক্ষণে শেওড়াফুলীর কুমার সুধীরচন্দ্র রায়ের নিকটে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকট আরও ৩ খানি তরবারি আছে, তন্মধ্যে প্রথমখানি সম্রাট্ অকবরের প্রদত্ত স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত ও পারসী খোদিত, দ্বিতীয়খানি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রদত্ত পিত্তলনির্ম্মিত ব্যাঘ্রমুখ মুষ্টিযুক্ত এবং তৃতীয়খানি নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর প্রদত্ত পারসী খোদিত।

পুত্রগণের নিকট তাঁহাদের শ্রীরামপুরের বাটীতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত কাগজে জয়ানন্দ দত্তের প্রাপ্ত ৭২ পরগণার বা তৎপূর্ব্বপুরুষগণের প্রাপ্ত কোনও সম্পত্তির উল্লেখ নাই। রাজা রাঘব দত্তের অর্জ্জিত ২২ পরগণা ও রাজা রামেশ্বর দত্তের অর্জ্জিত ১১ পরগণা এই ৩৩ পরগণার বণ্টনের বিবরণ উক্ত কাগজে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত সম্পত্তি সকল খরিদের বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় রাজা রাঘব রায় সন ১০৫৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১০৮১ সাল পর্য্যন্ত ৮১ দফায় ২২টী পরগণা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাল খরিদ করিয়াছিলেন, এবং রাজা রামেশ্বর রায় সন ১০৮১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১০৯৯ সাল পর্য্যন্ত ১২৬ দফায় ১১টী পরগণা ও কয়েকটী ক্ষুদ্র মহাল খরিদ করিয়াছিলেন। সন ১০৯৯ সালের বিভাগ কালে ঐ সকল সম্পত্তিই বিভাগ হইয়াছিল।

উক্ত নথী মধ্যে মাত্র পরগণা বিভাগের পাতা কয়টির নকল এখানে দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীহরি

সন ১১৯৪

হকিকৎ জমিদারী ও কুরসী নামা—৸৹

ইজা— ৩৩

এই তেত্তিস মহাল রামেশ্বর রায়ের অনুমতিক্রমে তাঁহার পরলোক হইলে সন ১০৯৯ সালে বাটোয়ারা হয়

৩ হিষ্যা

মিনাহ ২ হিষ্যা

বিতং

রায় মজকুরের ভ্রাতা বাসুদেব রায়ের পুত্র মনোহর রায় ও গঙ্গাধর রায়

১ হিষ্যা—

কাত—

কীঃ পঃ ফয়জুল্লাপুর ১

কীঃ পঃ কোট এক্তিয়ারপুর

হিষ্যা দঃ চৌঃ ১

কিঃ পঃ আর্শা

অজ বাসা বাটী মৌজে

বালী ১

৩

ইজা— ৬

কিঃ পঃ বোরো ১

কীঃ পঃ পাউনান ১

কীঃ পঃ বকঃ স বন্দর

হিষ্যা দপ্তর চৌধুরাই ১

কীঃ পঃ পাইকান ১

পঃ হাতিকান্দা ১

পঃ আমীরাবাদ ১

পঃ আমীরপুর ১

বালাণ্ডা ১

কীঃ পঃ মেদনমল ১

অজ মোঃ দসন

কীঃ পঃ কুবাজপুর ১

পঃ কাউনিয়া ১

১৩

হকীকৎ জমিদারী ও কুরশীনামা—

বাটোওয়ারা—২৷৵০

রায় মজকুরের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান

মুকুন্দদেব রায় ও রামকৃষ্ণ রায়

১ হিষ্যা—

কাত

	মহাল
কিঃ পঃ ফয়জুল্লাপুর	১
কীঃ পঃ কোট এক্তিয়ারপুর	১
হিষ্যা দপ্তর চৌরধুাই	
কিঃ পঃ মাহম্মদামিনপুর	১
কীঃ পঃ আর্শা	
অজ বাসা বাটী মোঃ বালী	১
কীঃ পঃ বোরো	১
কীঃ পঃ রায়পুর	১
পঃ খোশালপুর	১
কীঃ পঃ পাউনান	১
কীঃ পঃ বকঃস বন্দর	১
হিষ্যা দপ্তর চৌধুরাই	১
পঃ মুজঃফরপুর	১
কীঃ পঃ হালীসহর	১
কীঃ পঃ কলিকাতা	১
পঃ ধাড়সা	১
কীঃ পঃ খারোটী	১
কীঃ পঃ মাগুরা	১
	১৫

বাটোওয়ারা—২৷৵০

বাকী রায় মজকুরের প্রথম পক্ষের সন্তান

রঘুদেব রায়

১ হিষ্যা—

কাত

পুস্ত	মহাল
বে সরাকৎ	
কিঃ পঃ হলদা	১
কিঃ পঃ সাহাপুর	১
পঃ সাইস্তানগর	১
পঃ আর্শা	১
তঃ পঃ পাজনৌর	১
কিঃ পঃ সাহানগর	১
কিঃ পঃ মৈয়াড়	১
কিঃ পঃ সিলেমপুর	১
পঃ জঙ্গলপাড়া	১
তঃ পঃ সুলতানপুর	১
কীঃ পঃ হাতিয়াঘর	১
কী পঃ মানপুর	১
বিঃ হিষ্যা—	
কাঃ পঃ ফয়জুল্লাপুর	১
	১২
কাঃ কোট এক্তিয়ারপুর গয়রহ	
দপ্তর কানুনগোই দরোবস্ত ও হিষ্যা চৌধুরাই	
কিঃ পঃ মামুদামিনপুর	১
কিঃ পঃ বোরো	১
কিঃ পঃ রায়পুর	১
কিঃ পঃ পাউনান	১
কিঃ পঃ বকঃস বন্দর দপ্তর	১
কানুনগোই ও নেউগাই দরোবস্ত	১
৩ হিষ্যা চৌধুরাই	
কী পঃ হালিসহর	১
কীঃ পঃ মেদন মল্ল	১
কীঃ পঃ খারোড়	১
কীঃ পঃ কুবাজপুর	১
	১১

উক্ত কাগজগুলি সন ১১৯৪ সালে রাজা আনন্দচন্দ্র রায়ের আমলে লিখিত হইয়াছিল। এই বণ্টননামা অনুসারে সম্পত্তি বিভাগ হইবার পর রাজা রঘুদেব রায় সম্পূর্ণরূপে পাটুলির বাটী ত্যাগ করিয়া বাঁশবাড়িয়ায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা মুকুন্দদেব ও রামকৃষ্ণ প্রাপ্ত সম্পত্তির বিভাগ করিয়া মুকুন্দদেব রায় নয় আনা অংশ লইয়া শিবপুরে ও রামকৃষ্ণ সাত আনা অংশ লইয়া রাজহাটে বাস করিতে লাগিলেন। অপর দিকে মনোহর রায় ও গঙ্গাধর রায়ের মধ্যে বিভাগ হওয়ায় মনোহর জ্যেষ্ঠ বলিয়া দশ আনা ও গঙ্গাধর ছয় আনা অংশ পাইলেন। গঙ্গাধর পাটুলির বাটী ত্যাগ করিয়া বালির বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা এক্ষণে সম্পত্তিহীন হইয়াছেন। তথাপি সাধারণতঃ তাঁহারা ছয় আনি মহাশয় বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। রাজা মনোহর রায় সেওড়াফুলিতে বাস করিয়া দক্ষিণ দেশের সম্পত্তি পরিদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি পাটুলির বাটীর বাস ত্যাগ করেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণই পাটুলিতে বাস করিতেন। রাজা মনোহর রায় একজন খ্যাতনামা কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব সম্পত্তির আয়বৃদ্ধি ও অনেক নূতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি বহু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের সেবা পরিচালন জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত বহু দেবদেবীর জন্যও সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হুগলির কালেকটরী হইতে গৃহীত একখানি দেবোত্তর সম্পত্তির তায়দাদের নকলে দেখা যাইতেছে, ৬০ দফায় প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি মধ্যে রাজা রাঘবেন্দ্র দত্ত প্রদত্ত ১০৩৬ সালের ও ১০৪০ সালের ২ দফা দেবোত্তর, বাসুদেব দত্তের ১ দফা এবং রাজা মনোহর দত্তের প্রদত্ত ১১২৫ সাল হইতে ১১৫০ সাল পর্য্যন্ত ৩৮ দফা দেবোত্তর এবং রাজা রাজচন্দ্র দত্তের প্রদত্ত ১১৫১ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্য্যন্ত ১৯ দফা দেবোত্তরের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কত জেলায় কত দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা কষ্টকর। গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রের মন্দির, মাহেশে জগন্নাথ-দেবের মন্দির, কলিকাতার নিকট কাশীপুরে চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির ইত্যাদি শেওড়াফুলীর রাজবংশের অসংখ্য কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। একদা মনোহর রায় রাজস্ব দায়ে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এজন্য কারারুদ্ধ ছিলেন। রাজা মনোহর রায়ের পক্ষ হইতে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ৫০,০০০৲ টাকা রাজস্ব উপস্থিত করিলে রাজা মনোহর রায় উক্ত টাকায় প্রথমে ব্রাহ্মণের কারামুক্তির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এইরূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কারামুক্ত হইলেন। নবাব এই সংবাদে রাজা মনোহর রায়ের ব্রাহ্মণভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেও মুক্তি দিলেন এবং তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটী মাণিক উপহার দিলেন। উক্ত মাণিক সম্প্রতি দ্বিখণ্ডিত ও স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া কুমার সুধীরচন্দ্র রায়ের নিকট আছে।
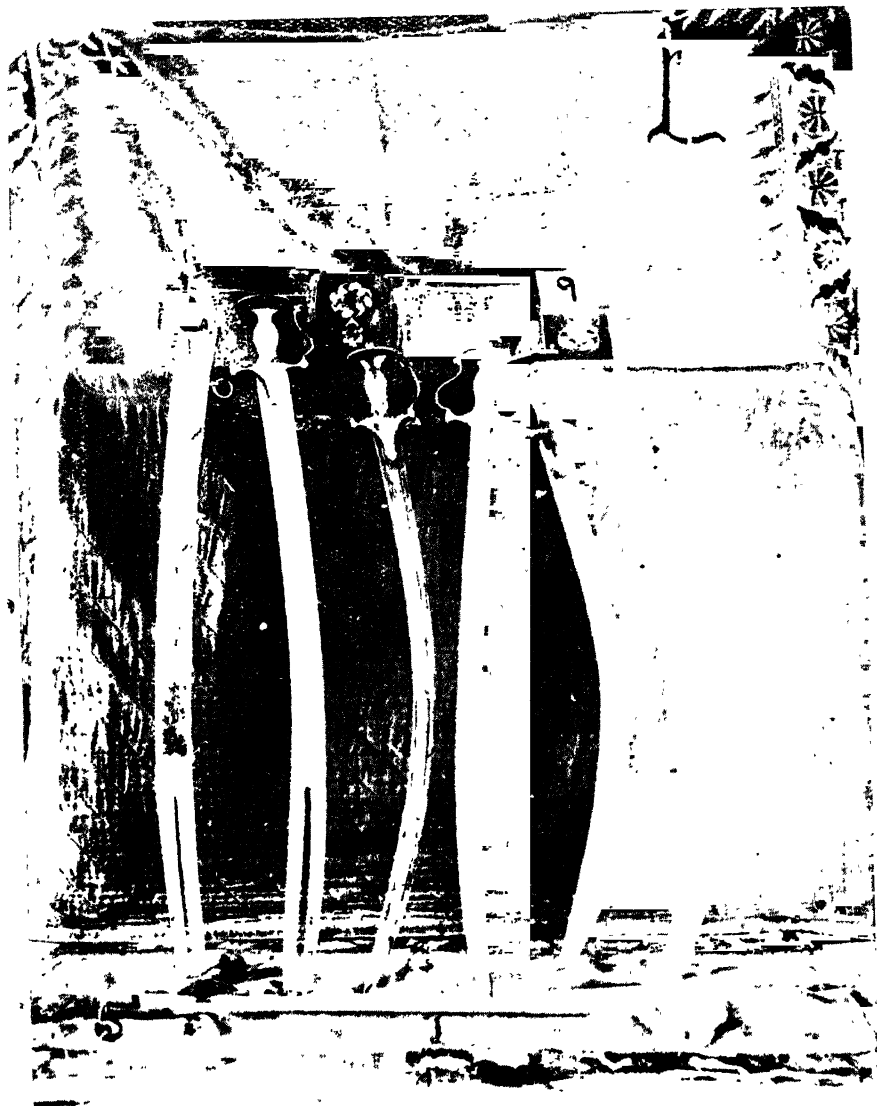
১২। বাদশাহ প্রদত্ত ও নবাব দত্ত তরবারি, শিরোভূষণ ও মাণিক
(৩নং হইতে ৮নং) [চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য]

দিনেমার গবর্ণমেণ্ট প্রথমে রাজা মনোহর রায়ের নিকট হইতে মৌজা আকনা ও পেয়ারাপুর বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, পরে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র রাজচন্দ্রের নিকট হইতে শ্রীরামপুরে ৬০/ বিঘা জমি বার্ষিক ১৬০১৲ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত লইয়া তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।(১) ডেন্‌মার্কের রাজা ফ্রেডরিকের পক্ষ হইতে একখানি কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া দিনেমার গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় শাসনকর্ত্তা তাহাতে সহি করিয়াছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা উক্ত কবুলিয়ৎখানি দেখিয়াছিলাম, কিন্তু বহু কাগজের সহিত সেখানি নষ্ট হওয়ায় এক্ষণে তাহা পাওয়া গেল না। ১৮৪৫ সালে দিনেমার গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ কোম্পানিকে সাড়ে বার লক্ষ টাকা মূল্যে তাঁহাদের ভারতীয় অধিকার বিক্রয় করেন। উক্ত সন্ধিপত্রের ষষ্ঠ দফায় এই বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। আর ইহাও স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে যে ভারতীয় সম্পত্তি মধ্যে তাঞ্জোরের রাজাকে বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা ও শেওড়াফুলীর রাজাকে বার্ষিক ১৬০৲ সিক্কা টাকা (কোম্পানির ১৭০৮৲ টাকা) রাজস্ব দেওয়া ব্যতীত ইংরাজ কোম্পানির আর কোনও দায়িত্ব রহিল না।(২) দিনেমার গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থান বন্দোবস্ত লইয়া স্বীয় রাজার নামানুসারে ফ্রেড্‌রিক্‌স্ নগর নাম রখিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের উক্ত স্থান সম্প্রতি অন্যান্য সম্পত্তির সহিত শেওড়াফুলীর রাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়াছে। মাত্র বিচারালয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান শেওড়াফুলীর রাজবাটীর শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা ঠাকুরাণীর দেবোত্তর রহিয়াছে। শেওড়াফুলীর রাজবংশধরগণ তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ৪৮৷১০ টাকা রাজস্ব পাইয়া থাকেন।

রাজা মনোহর রায়ের এক পুত্র রাজচন্দ্র রায় এবং দুইটী কন্যা ছিল। প্রথমা কন্যার বিবাহ হরিশাড়ায় মাধে রাঘব সিংহ বংশে গোপীনাথ সিংহ সহ এবং দ্বিতীয়ার বিবাহ কান্দী প্রভাকর সিংহ বংশে হীরারাম সিংহের ধারায় বাবুরাম সিংহের সহিত হইয়াছিল। গোপীনাথের চারি পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, রামশঙ্কর সিংহ ও পার্ব্বতীচরণ সিংহ সন ১১৩৬ সালের ২৩শে ফাল্গুন তারিখে রাজা রাজচন্দ্র রায়ের নিকট পাঁচঘরা গ্রামের মজকুরী হিস্যা ৷৷১০ আনা অংশ বার্ষিক ১৫১৲ টাকা জমায় বন্দোবস্ত পাইয়া তথায় বাস করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন এবং উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। উক্ত ১৫১৲ টাকা তাঁহারা কখনও শেওড়াফুলীর রাজাদিগকে দেন নাই এবং এখনও কাহাকেও দেন না। ঐ তারিখে বাবুরাম সিংহের পুত্র ভোলানাথ সিংহ রাজা রাজচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে ঘোষ মৌজা বন্দোবস্ত পাইয়া তথায় বাস করেন।

(১) Vide Treatise, Sanads &c of Bengal and neighbouring Countries, vol 1.

(২) Vide Toynbye's Administration Report (from 1795 to 1845) of the Hooghly District p. 27 and p. 79, published in 1888.

তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন এবং উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। মনোহর রায় মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজচন্দ্র রায়ের প্রতি দৌহিত্রদিগকে সম্পত্তি দিবার অনুমতি দিয়া যান।

মনোহর রায়ের বহু কীর্ত্তি এখনও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। ঘটক শুকদেব সিংহ তাঁহার প্রশংসায় একটী মনোহরাষ্টক লিখিয়াছেন। তাহা প্রথমেই কারিকা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, রাজা মনোহর রায় প্রত্যহ ভূমিদান করিতেন, এইরূপ ভূমিদান করিতে করিতে তাঁহার শেষ জীবনে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে সমস্ত রাজ্য মধ্যে এমন গ্রাম ছিল না যাহার অর্দ্ধেক ভূমি তিনি নিষ্কর দান করেন নাই। মৃত্যুকালে তিনি গঙ্গার পশ্চিমকূলে অন্তর্জলে থাকিয়া কুলদেবতা কৃষ্ণদেবকে সম্মুখে রাখিয়া তুলসী অঞ্জলি অর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। হিন্দুর একান্ত বাঞ্ছনীয় মৃত্যু রাজা মনোহর রায় লাভ করিয়াছিলেন। সন ১১৫০ সালে রাজা মনোহর রায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সন ১১৪১ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি সাড়াপুলি বা শেওড়াফুলীর বাটীতে শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতা তথায় শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সেবা এখনও চলিতেছে।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাজপেয় যজ্ঞে রাজা মনোহর রায় 'ক্ষত্রিয়রাজ' বলিয়া আসন ও সম্মান পাইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা শিবচন্দ্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া রাজা মনোহর রায় কৃষ্ণনগরে গিয়া শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার হস্তে মুদ্রা বা অলঙ্কারাদি না দিয়া একখানি কাগজ দিয়াছিলেন। উহা একখানি দানপত্র, নবকুমারকে মৎস্য খাইবার জন্য বিখ্যাত নদীয়ার বিল দান করিয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক আয় কয়েক সহস্র মুদ্রা।

পিতা বাসুদেব রায়ের নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য রাজা মনোহর রায় বাসুদেবপুর নামে একটী গ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক তথায় একটী মন্দিরে স্বীয় পিতার একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও তাহার সেবা পূজা নির্ব্বাহ জন্য সন ১১৪৬ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ১২০/ বিঘা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। এখনও উক্ত পূজা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত পিতামহের নামে বৈদ্যবাটীতে রাঘবেশ্বর শিব স্থাপন করিয়াছিলেন। মনোহরের পিতৃ পুরুষগণের প্রতি ভক্তি লোকশিক্ষার আদর্শ।

মনোহরের পুত্র রাজা রাজচন্দ্র রায় বাল্যকাল হইতেই সংসারে অনাস্থাবান্ ছিলেন। এজন্য ১৩।১৪ বৎসর বয়সেই তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তথাপি তিনি গৃহত্যাগে উদ্যোগী হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া পুত্রমুখ দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিতে বলেন। পরে যথাকালে পুত্রের জন্ম হইলে রাজচন্দ্র যখন সংসার ত্যাগের জন্য মাতার নিকট হইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, তিনি বলিলেন—পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিও।

৪। শাহজহানের মোহরাঙ্কিত ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের স্বাক্ষরযুক্ত রাজা রাজচন্দ্র র য়ের বাদশাহী সনন্দ (সন ১১৮৩ সাল ২৭ অগ্রহায়ণ)
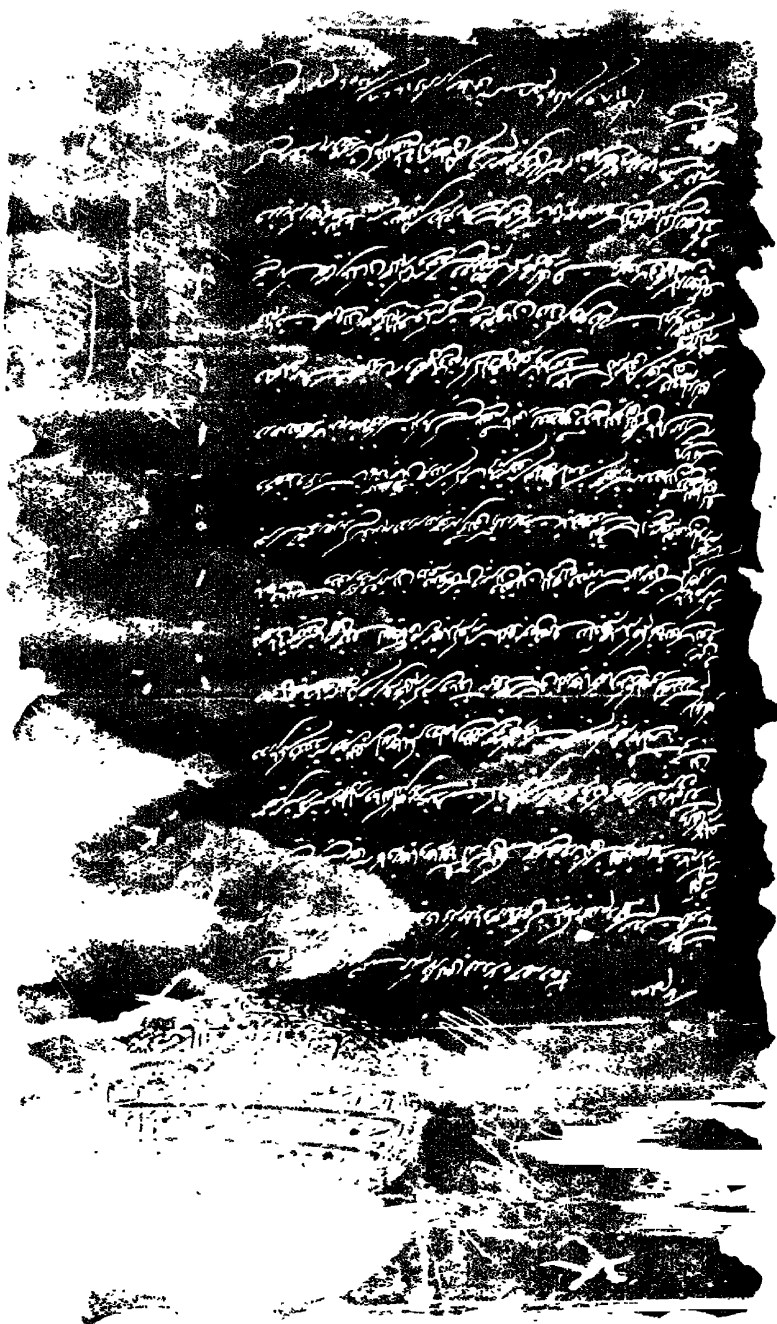
মাতৃ-আদেশে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে না পারিলেও জটাজুটাদি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে গৃহে রহিলেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে 'জটে রাজা' বলিত। এই সময় ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহই তাঁহার নিকট হইতে ভূমি দান প্রাপ্ত হইতেন। চতুর্দ্দিকে এই রূপ দানের কথা প্রচারিত হইলে শেষে দলে দলে ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে ভূমির জন্য ধরিত। শেষে এরূপ অবস্থা হইল যে এই সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে বনপ্রদেশে গমন করিতেন। কথিত আছে একদা এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বনমধ্যে দেখিতে পাইয়া ভূমি প্রার্থনা করিলে তথায় লিখনোপকরণ না পাইয়া বিল্বপত্রে বিল্বকণ্টকে স্বীয় শোণিত দ্বারা এক খানি ভূমিদানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের বংশধরগণ এখনও উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেছেন।

রাজচন্দ্রের ব্রাহ্মণভক্তির একটী দৃষ্টান্ত এখনও প্রবাদ স্বরূপ প্রচলিত আছে। একদা রাজচন্দ্র বনমধ্যে পথিপার্শ্বে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কয়েকটী গোয়ালিনী নিজ নিজ দুঃখকাহিনীর বিষয় গল্প করিতে করিতে উক্ত পথে যাইতেছিল। গল্পের মর্ম্ম এই যে রাজ্যে ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য হইয়াছে, তাঁহারা গোয়ালিনীদিগের দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাখন, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইয়া যান, তাহার মূল্য দেন না, রাজার নিকট অভিযোগ করিলে তিনিও কোন প্রতিকার করেন না। এই প্রসঙ্গে একটী গোয়ালিনী বলিয়া উঠিল 'রাজা ত ব্রাহ্মণের দাস, তিনি কি প্রতিকার করিবেন', এই কথা শুনিয়া রাজা আনন্দাশ্রুপূরিত লোচনে বনমধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া গোয়ালিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা সকল, আমি কি ব্রাহ্মণের দাস হইবার যোগ্য হইয়াছি ?"

রাজা রাজচন্দ্র রায় বহু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা ও বহু দেবোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামপুরে রামসীতা, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ঠাকুরের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়া কিঞ্চিদধিক তিন শত বিঘা দেবোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তদবধি ফ্রেড্রিক্স নগরের নাম শ্রীরামপুর হইয়াছে। কলিকাতায় শ্রীশ্রী৺চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির নির্ম্মাণ ও তজ্জন্য ভূমিদান রাজচন্দ্রের কীর্ত্তি। তিনি আরও অনেক দেবকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেবের নামে যখন বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে মোকদ্দমা চলিতেছিল, তখন হেষ্টিংস সাহেবের পক্ষ হইতে এ দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট প্রশংসা পত্র লওয়া হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমার পেপার বুকে দেখা যায়, রাজচন্দ্রের নিকট হইতেও তিনি একখানি ঐরূপ প্রশংসাপত্র লইয়াছিলেন।

রাজচন্দ্রের চারিটী পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে যোগী হইয়া অল্পদিনেই পরলোকগমন করেন। মধ্যম দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গাধর রায়ের দত্তকপুত্র হইয়া বালিতে বাস করেন, তৃতীয় প্রতাপনারায়ণ অনুপযুক্ত থাকা হেতু পিতা কর্ত্তৃক নারায়ণপুর গ্রাম তালুক পাইয়া তথায় বাস করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ আনন্দচন্দ্র উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায়

রাজচন্দ্র তাঁহাকেই সমস্ত রাজ্য ভার অর্পণ করেন। আনন্দচন্দ্র যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া সন ১২০৬ সালে হোরা পঞ্চমীর দিন পরলোকগমন করেন।

রাজা আনন্দচন্দ্র রায়ের মৃত্যুকালে তৎপুত্র রাজা হরিশচন্দ্র রায় নাবালক ছিলেন। হরিশচন্দ্র রায়ের মাতা রাণী চম্পকলতা কিছুকাল রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। সন ১২০৭ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ নাবালকের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। সন ১২২০ সালে রাজা হরিশচন্দ্র সাবালক হইয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। সন ১২০৮ সালে রাজবাটী গঙ্গাগর্ভে যাওয়ায় রাণী চম্পকলতা নারায়ণপুরে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় দেববিগ্রহাদি লইয়া গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু উক্ত বাটীও পাটুলির বাটী বলিয়া বিখ্যাত হইল। রাজা হরিশচন্দ্রের তিনটী পত্নী ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী রাণী সর্ব্বমঙ্গলার সন ১২২৪ সালে অপমৃত্যু ঘটে। পরে অপমৃত্যুপাপ হইতে নিস্তার নিমিত্ত নিস্তারিণী নামে দক্ষিণকালিকা মূর্ত্তি স্থাপনের স্বপ্নাদেশ পাইয়া হরিশচন্দ্র সন ১২৩৪ সালে সেওড়াফুলীতে গঙ্গাতটে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একটি পাষাণময়ী নিস্তারিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্ত দেবীর সেবা পরিচালন জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মন্দিরগাত্রস্থ প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত রহিয়াছে—

"স্বীয়ে রাজ্যে ভুজঙ্গশ্রুতিশিখরিধরা গণ্যমানে শকাব্দে।
কালীপাদাভিলাষী স্মরহরমহিষীমন্দিরং তৎপ্রতিষ্ঠাং॥
চক্রে গঙ্গাসমীপে বিগতভবভয়ঃ শ্রীহরিশচন্দ্রদত্তঃ।
সম্মতির্যস্য রামেশ্বর ইতি নৃপতের্ম্মন্ত্রী যত্নেন সার্দ্ধং॥"

রাজা রাজচন্দ্র রায়ের ও রাজা আনন্দচন্দ্র রায়ের অতি দানে রাজ এষ্টেট বহু টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল। হরিশচন্দ্রের নাবালক অবস্থায় কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বহু যত্ন করিয়াও ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। হরিশচন্দ্র যখন স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখনও প্রায় তিনলক্ষ টাকা ঋণ ছিল, হরিশচন্দ্রও নানা কারণে ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ব্যয় সঙ্কোচ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পাটুলি নারায়ণপুরের বাটী হইতে সেওড়াফুলীর বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি সন ১২৩২ সালে পরলোক গমন করেন। হরিশচন্দ্রের আত্ম-সম্মান ও তেজস্বিতার পরিচয় স্বরূপ একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত রহিয়াছে। রাজা মনোহর রায় মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ ও সেবা পরিচালন জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায় ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য কমলাকর পিপ্লাইএর বংশধরগণ স্নান-যাত্রা উপলক্ষে সেওড়াফুলীর রাজাদিগের অনুমতি লইয়া ঠাকুরদের স্নান আরম্ভ করাইতেন। এখনও তাঁহাদিগের উক্ত সম্মান রহিয়াছে। সেওড়াফুলীর রাজবংশের ছয় আনি জ্ঞাতিগণ বালিতে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সম্পত্তি ঋণদায়ে বিক্রয় হইলে শ্রীরামপুরের জনৈক

তিলি তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। উক্ত নূতন জমিদারের পিতামহ এককালে সূতার ঝুড়ি মস্তকে বহন করিয়া বিক্রয় দ্বারা মাসিক ৫৲। ৬৲ টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিতেন। এজন্য সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিলেও জন সাধারণের নিকট তিনি জমিদারের উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। মাহেশে জগন্নাথের স্নানযাত্রা উপলক্ষে সেওড়াফুলীর রাজারা যে সম্মান পাইয়া থাকেন, উক্ত সম্মান লাভে ইচ্ছুক হইয়া উক্ত তিলি জমিদার পূজারী ব্রাহ্মণ-দিগকে উৎকোচ দিয়া রাজা হরিশচন্দ্র তথায় পৌছিবার পূর্ব্বেই স্নান আরম্ভ করাইয়া দিলেন, এমন সময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আড়ম্বরের সহিত অশ্বারোহণে তথায় পৌছিলেন এবং তাঁহার অপেক্ষা না করিয়া স্নান করাইবার কারণ অবগত হইয়া পূজারী ব্রাহ্মণদিগকে বন্ধন করিয়া সেওড়াফুলীর রাজবাটীতে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তিন দিন ঐরূপ অবস্থায় রাখিবার পরে বহু ব্রাহ্মণের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা সর্ব্ব সমক্ষে স্বীকার করিয়া যান রাজবাটীর অনুমতি না লইয়া আর কখনও শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের স্নান হইবে না, এখনও তাঁহারা উক্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া আসিতেছেন। (১)

সন ১২৩৯ সালের ফাল্গুন মাসে রাজা হরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহার দুই পত্নী রাণী হরসুন্দরী ও রাণী রাজধন দুইটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। হরসুন্দরীর পুত্র পূর্ণচন্দ্র বয়সে ছোট ছিলেন এবং রাজধনের পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বয়সে বড় ছিলেন, ঐ দুই জন হইতে বড়তরফ ও ছোট তরফ হইয়াছে।

রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র ও রাজা পূর্ণচন্দ্র সাবালক হইয়া যখন সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন, তখন এষ্টেটের ঋণ পরিশোধ হইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ টাকা রাজকোষে সঞ্চিত ছিল। উপরন্তু হাবড়া রেল ষ্টেশনের ও তথা হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রেলপথের জন্য রেল কোম্পানী সেওড়াফুলীর রাজএষ্টেট হইতে যে সকল ভূমি লইয়াছিলেন তাহার মূল্য বাবত কয়েক লক্ষ টাকা পাইলেন। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা, এত অর্থ ও সম্পত্তি পাইয়াও রাজা পূর্ণচন্দ্রকে সর্ব্বস্বান্ত ও নির্ব্বাসিত হইয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র বিষয়কর্ম্মে উদাসীন ছিলেন। তিনি সেওড়াফুলীর বাটীতে থাকিতেন এবং শ্রীশ্রী৺নিস্তারিণীর মন্দিরের নিকটে গঙ্গাতীরে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় গঙ্গাস্নান ও পূজাদি করিয়া ভোজনকালে বাড়ী যাইতেন। রাজা পূর্ণচন্দ্র বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন, তিনি পাটুলির বাড়ীতে অধিককাল যাপন করিতেন এবং বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি সৌখীন পুরুষ ছিলেন। গরু, ঘোড়া ইত্যাদির সখ ছিল। কয়েকজন ইউরোপীয় মোসাহেব ও কর্ম্মচারী জুটিয়া তাঁহাকে ইউরোপীয় ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে

(১) Vide Toynby's Administration of Hooghly District, p p. 153-155.

তিনি নির্ভীক ছিলেন। পাটুলির নিকটে একটী সাহেবের নীলকুঠী ছিল; রাজা পূর্ণচন্দ্রের গোবৎসাদি সাহেবের সীমানায় গিয়া অনিষ্ট করিত, এজন্য একদা সাহেব গরু ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্র ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া বহু লাঠিয়ালসহ সাহেবের কুঠীতে উপস্থিত হইয়া কুঠীর লোকজনকে এবং সাহেবকে বিশেষ লাঞ্ছিত করিয়া গরু লইয়া আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে একটী ফৌজদারী মোকদ্দমা হয়। তাহাতে উভয়পক্ষের বহুলক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সাহেব কুঠী বিক্রয় করিয়া বিলাত চলিয়া যান। পূর্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থ তাঁহার বিলাসিতায় এবং কর্ম্মচারী ও আত্মীয়গণের বিশ্বাসঘাতকতায় নষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে ঋণ হইল উভয় ভ্রাতায় তাহার জন্য দায়ী হইলেন। ক্রমশঃ গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল ও ঋণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; পরে উভয় ভ্রাতায় পৃথক্ হইলেন, সন ১২৬৫ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার মাতা রাণী রাজধন ১২৪৮ সালে স্বর্গারোহণ করেন। রাণী হরসুন্দরী যোগেন্দ্রচন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন; তিনি পাটুলির বাটীতে অবস্থানকালে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শোকাতুরা হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং সন ১২৬৬ সালের ৯ই বৈশাখ তারিখে দেহত্যাগ করিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র সুগায়ক ছিলেন; তাঁহার রচিত কীর্ত্তনের পদাবলী গায়কগণ গান করিতেন; তাঁহার চেষ্টায় সেওড়াফুলীতে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল; বহু দিন পরে উক্ত স্কুলটী উঠিয়া গেলে বৈদ্যবাটীতে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

রাজা মনোহর রায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজস্বদায় হইতে মুক্ত করিবার পর হইতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সহিত সেওড়াফুলীর রাজবংশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং উভয় রাজবংশের পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত ছিল; একদা কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র কলিকাতা হইতে জলপথে নবদ্বীপ যাইতেছিলেন. বৈদ্যবাটীর ঘাটে একটী রূপবতী কন্যা তাহার মাতার সহিত গঙ্গাস্নান করিতেছিল। রাজা শ্রীশচন্দ্র ঐ কন্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়া রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্রের ঘাটে বাজরা বাঁধিলেন ও স্বীয় আগমনবার্ত্তা রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্রকে জানাইলেন; যোগেন্দ্রচন্দ্র অতি সমাদরে তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন; শ্রীশচন্দ্র তাঁহার নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন। যুবক শ্রীশচন্দ্রের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র উক্ত বালিকার অনুসন্ধানে গুপ্তচর নিয়োগ করিলেন ও অবিলম্বেই সংবাদ জানিলেন উক্ত কন্যাটি বৈদ্যবাটীর জনৈক ব্রাহ্মণের। যোগেন্দ্রচন্দ্র ভোজনকালে নিজবাটী গিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিয়া পালকী পাঠাইয়া উক্ত ব্রাহ্মণের পত্নীকে রাজান্তঃপুরে আনয়ন করাইয়া অর্থ দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ব্রাহ্মণী বাড়ী গিয়া স্বামীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। ব্রাহ্মণ নৈকষ্য কুলীন ছিলেন। তিনি অর্থলোভে স্বীয় মেলের বাহিরে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র কৌশলে ব্রাহ্মণকন্যা ও ব্রাহ্মণপত্নীকে রাজবাটীর নিকটস্থ একটী বাড়ীতে লইয়া গিয়া জনৈক আত্মীয় দ্বারা কন্যা সম্প্রদান করাইলেন। ব্রাহ্মণ কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে ব্রাহ্মণ

১৬। রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়

বিবাহের পর দিন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ও রাজা শ্রীশচন্দ্রকে বংশ নাশ হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য শ্রীশচন্দ্রের ঔরস পুত্র ছিল না এবং যোগেন্দ্র চন্দ্রের পুত্রেরও পুত্রবংশ নাই।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের দুইটি পুত্র, গিরীন্দ্রচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রচন্দ্র। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র অল্প বয়সেই ১২৭৩ সালে পরলোক গমন করেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজা পূর্ণচন্দ্র নাবালকগণের ও এষ্টেটের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া গিরীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষীয় লোকদিগের সহিত পূর্ণচন্দ্রের অনেক মোকদ্দমা হইয়াছিল। পরে সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়াডের হাতে যায়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের জীবনকালে ঋণদায়ে অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল। গিরীন্দ্রচন্দ্রও ঋণগ্রস্ত অবস্থায় সম্পত্তি হাতে পাইলেন। তাঁহার সাবালক হইবার অল্পকাল পরেই ঋণদায়ে সামান্য মূল্যে তাঁহার জমিদারী সম্পত্তি সমস্তই বিক্রয় হইয়া যায়। মাত্র লাখরাজ ও দেবোত্তর ইত্যাদি সামান্য সামান্য সম্পত্তি ভোগ করিয়া গিরীন্দ্রচন্দ্র জীবন যাপন করেন। খুল্লতাত রাজা পূর্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার আজীবন মোকদ্দমা চলিয়াছিল, তথাপি তৎপুত্র কুমার নরেন্দ্রচন্দ্রের সহিত গিরীন্দ্রচন্দ্রের সৌহার্দ্দ ছিল।

গিরীন্দ্রচন্দ্র অসামান্য বলশালী ছিলেন। শুনা যায় মাটিয়ারীর সুবিখ্যাত বীর রামবাবুর ও রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় বলশালী পুরুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভয় কাহাকে বলে তাহা গিরীন্দ্রচন্দ্র জানিতেন না। তাঁহার ব্যবহৃত মুদ্গর দুই মন ওজনের কাষ্ঠখণ্ড এখনও শেওড়াফুলীর রাজবাটীতে দেখা যায়। তাঁহার বীরত্ব সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তারকেশ্বর রেল লাইন খুলিবার সময় নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ও কুমার নরেন্দ্র চন্দ্র বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সহিত এক যোগে গাড়ীতে চড়িয়া শেওড়াফুলী হইতে তারকেশ্বর গিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপালিটির প্রথম নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। সন ১৩০৩ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে গিরীন্দ্রচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্রের পুত্র সন্তান ছিল না, একটী মাত্র কন্যা ছিল। ভাগলপুরের মহাশয় তারকনাথ ঘোষের সহোদর ও হরিহর কারফরমা বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের মধ্যম পুত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হয়। গিরিশচন্দ্রের একটী পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ ও তিনটী কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যাটী পাইকপাড়ার রাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের মাতা। নির্ম্মলচন্দ্রই এক্ষণে গিরীন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া শেওড়াফুলির রাজবাটীতে বাস করিতেছেন, ও দেবসেবাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি কৃতবিদ্য, হাইকোর্টের উকীল, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বহুদিন হইতে বৈদ্যবাটী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান রহিয়াছেন। তিনি নিজ ব্যয়ে শেওড়াফুলীতে একটী অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

রাজা পূর্ণচন্দ্র ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হইবার পর ক্রমশঃ মোকদ্দমা ও ঋণে জড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। সন ১৩০৪ সালে ঋণদায়ে শেওড়াফুলীর রাজবাটীতে তাঁহার বাসের অংশ ক্রেতা দীঘাপতিয়ার রাজকুমারের হস্তগত হইলে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় ভাড়া-

বাটীতে বাস করিতেন। শেষ পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়া সন ১৩২০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়, তাঁহার বন্ধু ও উকীল স্বর্গীয় জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্রের কলিকাতার বাটীতে কালযাপন করিয়া সম্প্রতি অন্যত্র বাস করিতেছেন। নরেন্দ্রচন্দ্রের তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ সরসীচন্দ্র ও কনিষ্ঠ সুধীরচন্দ্র সম্প্রতি বৈদ্যবাটী মধ্যে একটী আম্রকাননে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। সুধীরচন্দ্র চতুর ও বুদ্ধিমান্, সম্প্রতি তিনিই নরেন্দ্রচন্দ্রের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র। সরসীচন্দ্রের পুত্র সন্তান নাই, তিনটী কন্যা।

রাজা পূর্ণচন্দ্রের দুইটী কন্যা ছিল। প্রথমার বিবাহ পাঁচথুপীর মল্লিকবংশে রাধামোহন ঘোষ মল্লিকের সহিত ও দ্বিতীয়ার বিবাহ রসোড়া জয়দেববংশে গোপীকান্ত রায়ের সহিত হইয়াছিল; প্রথমা কন্যার পুত্র সন্তান না হওয়ায় নরেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যম পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া শৈলেন্দ্রমোহন মল্লিক নাম রাখা হইয়াছিল, পরে তাঁহার গর্ভজাত পুত্র হইলে তাঁহার নাম রাখা হয় অসিতমোহন মল্লিক।

১৫। শ্রী নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, এডভোকেট, হাইকোর্ট
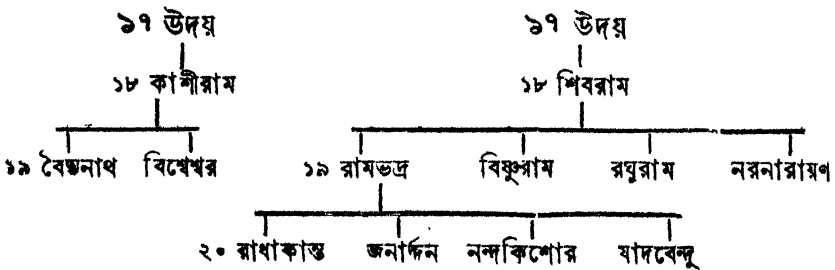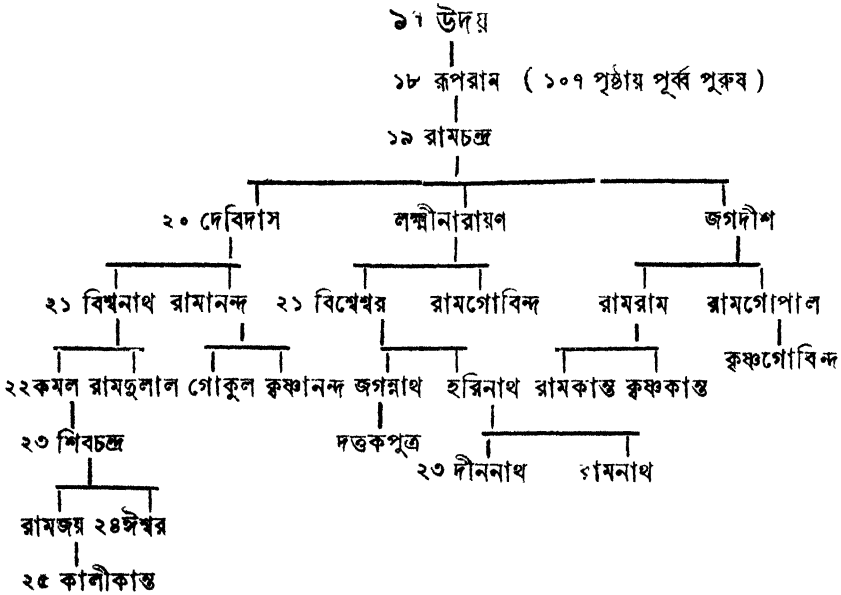
সেওড়াফুলীর রাজবংশ
১৯ রাজা রাঘবেন্দ্র রায় (১০৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
২০ মথুরেশ রামেশ্বর বাসুদেব (পাটুলি)
২১ মনোহর রায় (সেওড়াফুলী) গঙ্গাধর (বালি)
দুর্গাপ্রসাদ (দত্তক)
রাজা রাজচন্দ্র রায় হরগোবিন্দ
২৩ কালীপ্রসাদ রায়
২৩রাধাকৃষ্ণ দুর্গাপ্রসাদ প্রতাপ আনন্দচন্দ্র রায়
২৪ অন্নদাপ্রসাদ
হরিশচন্দ্র
২৫ যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় (দত্তক) পূর্ণচন্দ্র রায় (দত্তক)
ভগবতী প্রসন্ন গোপালপ্রসন্ন
ব্রজেন্দ্র
২৬ গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় নরেন্দ্রচন্দ্র রায় গিরিজা শৈলজা
কন্যা
নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ
২৭ সরসীচন্দ্র রায় সুধীরচন্দ্র রায়
২৮ প্রমথেশরায় প্রণবেশরায় প্রণয়েশরায় প্রভাবেশরায় শুদ্ধোদনরায়
১৮ জয়ানন্দ (১০৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
১৯ মহাদেব
১৯ গোপাল
২০ রঘুনন্দন ২০ কল্যাণ
২০ রঘুনাথ
২১ রাজারাম ২১ কৃষ্ণরাম
২১ রামদেব চাঁদমোহন বিনোদ নরেন্দ্র গোপীনাথ দেবীপ্রসাদ
২২ গৌরীচরণ ২২ভবানীচরণ
২৩ বিদ্যাধর ২৩ রামনাথ ২২দুর্গাচরণ ২২দুলালচন্দ্র
২৩ শম্ভুচন্দ্র
২৪ জয়নারায়ণ
২৩প্রাণকৃষ্ণ রাজকিশোর নবকিশোর যুগলকিশোর
২৪ রাধিকা
২৪ রামচরণ ২৪ বিষ্ণুচরণ
২৫ শ্রীকান্ত ২৪ভুবনমোহন
২৪ পারসনাথ অম্বিকা মহেশচন্দ্র বিশ্বম্ভর ত্রৈলোক্যরামচন্দ্র
২৪ কৃপারাম
২৪ জগন্নাথ কালীপ্রসাদ সদাশিব
২৫ পার্ব্বতীচরণ
২৫ গঙ্গারাম হরেরাম শ্রীরাম পার্ব্বতীচরণ

নবম অধ্যায়

দিনাজপুরের প্রাচীন রাজবংশ

(রাজা বিষ্ণুদত্তের ধারা)

পাটুলির দত্তবংশ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে কবিদত্তের ২য় পুত্র দামোদর, এই দামোদরের পৌত্র ঈশ্বর, ঈশ্বরের দুই পুত্র কেশ বা কৃষ্ণদত্ত এবং বিশু বা বিষ্ণু দত্ত। কেশদত্ত হইতে পাটুলির রাজবংশ এবং বিষ্ণুদত্ত হইতে দিনাজপুর রাজবংশের উদ্ভব। বিষ্ণুদত্তের বংশপরিচয় সম্বন্ধে সদানন্দের কারিকায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"রবির অনুজ দামোদর। অস্ত্রে শাস্ত্রে মহা ধনুর্দ্ধর॥
হরিহর তার কোঙর। খ্যাত পুত্র যার ঈশ্বর॥
কেশু বিশু পুত্র তার। মহামান্য কুলের সার॥
অশ্বঘাটে বিষ্ণুদত্ত। উচ্চপদে যে প্রতিষ্ঠিত॥
মহামান্য রাজখ্যাতি। উত্তরে হইল সভাপতি॥
আত্মীয় কুটুম্ব কতশত। বিষ্ণুদত্তের হইল শরণাগত॥
কান্দী পাঁচথুপী জাম্বা কুলাই। মহাকুলীন লেখা জোখা নাই॥
সভে করিতে যায় দত্ত সঙ্গ। মধুচক্রে যেমন কুলভৃঙ্গ॥
বিষ্ণুর সুত জগদীশ। মহাদাতা দনুজাধীশ॥
তস্য সুত রামনাথ। করণ কারণে অবদাত॥
প্রাণনাথ ভগবান্। দুই পুত্র গুণবান্॥
দুহে দুই রাজপাট। উত্তর দক্ষিণে হইল সাট॥
প্রাণনাথ গৌড়ে গেলা। ভগবান্ উত্তরে রহিলা॥
প্রাণনাথের উভয় নন্দ। পুরুষোত্তম আর কৃষ্ণানন্দ॥
কৃষ্ণানন্দের রাজছত্র। পুরুষোত্তম বিষম তন্ত্র॥
তাঁহার পুত্র ধন্য সন্তোষ। সদাই যার পরিতোষ॥
কৃষ্ণ পুত্র কানু নরু। ধনে দানে কল্পতরু॥
নরোত্তমে বংশ নাই। কানুরামে বংশ পাই॥
ধন্য ঠাকুর নরোত্তম। নাহি কেহ তাঁহার সম॥
কানুরামে রাজ্য নাশ। ভগবানে সুপ্রকাশ॥

অশ্বঘাটের অধিকারী। রাজা ভগবান্ নামধারী॥
তার পুত্র রূপরাম। সকল গুণের ধাম॥
তস্য পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্রে সমাপ্ত॥
শ্রীমন্তের কন্যা বিভা করি। ঘোষবংশ দণ্ডধারী॥
ধন্য রাজা শুকদেব রায়। দেশ বিদেশে মহিমা গায়॥"

উপরোক্ত কারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে বিষ্ণুদত্ত অশ্বঘাটে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেওড়াফুলীর দত্তরাজবংশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে বিষ্ণুদত্ত অল্প বয়সে নিজের চেষ্টায় অগ্রদ্বীপ অঞ্চলে অনেক ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া কানুনগো হইয়া দিনাজপুরে গিয়াছিলেন। এই সময় পদ্মার উত্তর হইতে নেপালের তরাই পর্য্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড ও ভূস্বামী তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছিল। এদিকে ভাগলপুরের থাকদত্ত বংশের বিবরণী হইতে পাওয়া যায়, এই বংশ ৮২১ সনে ভাগলপুর প্রদেশের কানুনগো পদ লাভ করেন।* তখনও বাঙ্গলা সন প্রচলিত হয় নাই, হিজরী সনই প্রচলিত ছিল। ৮২১ হিজরী (১৪১৮ খৃষ্টাব্দে) রাজা গণেশ দত্তের পুত্র মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী জলাল্‌উদ্দীন্‌কে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখি। তারিখ-ই-ফেরিস্তা নামক মুসলমান ইতিহাসে জলাল্‌উদ্দীন্ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"পিতার মৃত্যুর পর জিৎমল সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন, আমার ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহাতে আমিও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। আবার দেখিতেছি যদি তজ্জন্য আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে সিংহাসনের অধিকারী হইতে না দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার অমাত্যবর্গ জানাইলেন, তিনি যে ধর্ম্মই গ্রহণ করুন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহাকে সকলেই তাঁহাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তদনুসারে জিৎমল মুসলমান হইলেন ও সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ন্যায়পরতার সহিত রাজত্ব করেন এবং ১৭ বর্ষ রাজ্যভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।"

ফেরিস্তার উক্তি হইতে মনে হয় যে যদু ওরফে জিৎমল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আত্মীয় অমাত্যবর্গের পরামর্শ লইয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ না করায় তিনি বরং আত্মীয় স্বজনকেই প্রধান প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। থাকদত্তের বংশ যেমন ভাগলপুরে, বিষ্ণুদত্ত সেইরূপ দিনাজপুরের কানুনগো পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। থাকদত্ত ও বিষ্ণুদত্ত-বংশ রাজা গণেশ ও জলাল্‌উদ্দীনের জ্ঞাতি হইতেছেন। তাঁহাদের জ্ঞাতিত্ব-নির্দ্দেশক বংশলতা নিম্নে প্রদত্ত হইল। জানকী ওরফে থাকদত্ত মজুমদারের ন্যায়

* পরবর্ত্তী অধ্যায়ে থাকদত্তগণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুদত্তও ৮২১ হিজরী (১৪১৮ খৃঃ অঃ) বা তাহার অনতি পরে দিনাজপুরের কানুনগো ও তাহার কিছুকাল পরে গৌড়াধিপের নিকট রাজোপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকিবেন।

[পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

রাজা বিষ্ণুদত্তের সৌভাগ্যোদয়ে কান্দী, পাঁচথুপী, জামুয়া, কুলাই প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ কুলীনগণ বিষ্ণুদত্তের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন এবং অনেকে বিষ্ণুদত্তের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। রাজা গণেশদত্ত খাঁর ও তাঁহার পিতৃগণের সময় হইতেই উত্তররাঢ়ীয় কুলীনগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ক্রমেই কুলীনগণের সমাগমে দিনাজপুর একটী প্রধান সমাজ হইয়া পড়িল, এই সমাজস্থানই উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে 'অশ্বঘাট' নামে পরিচিত হইয়াছে। কুলগ্রন্থানুসারে রাজা বিষ্ণুদত্ত অশ্বঘাটে সভাপতি হইয়াছিলেন।

রাজা বিষ্ণুদত্তের পুত্র রাজা জগদীশ কুলগ্রন্থে "মহাদাতা দনুজাধীশ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। 'দনুজাধীশ' বলিবার কারণ কি? দিনাজপুর কি কোন সময়ে 'দনুজপুর' নামে পরিচিত ছিল? মার্টিন ও বিভারিজ প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস অনুসারে রাজা গণেশকে Hakim of Dinwaj লিখিয়াছেন!—এই Dinwaj ও কুলগ্রন্থের দনুজ কি অভিন্ন? রাজা গণেশের প্রসঙ্গে লিখিয়াছি—রাজা গণেশ অন্তিমকালে 'দনুজমর্দ্দন' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তদনুসারে 'দনুজমর্দ্দনপুর' বা 'দনুজপুর' নাম কি হইয়াছিল? যেমন রাজা গণেশের নামানুসারে গণেশপুর, সেইরূপ দনুজমর্দ্দন নাম হইতে 'দনুজপুর' বা 'দনুজ' নাম হওয়া অসম্ভব নহে। পরবর্ত্তী কালে তাই দিনাজপুরপতি জগদীশ 'দনুজাধীশ' নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন।

রাজা জগদীশের পুত্র রাজা রামনাথ দত্ত "করণ কারণে অবদাত" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ কুলীনগণের সহিত আদান প্রদান করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কুলাই সমাজের ঘোষবংশতিলক সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের অনুজ দনুজারি ঘোষ রাজা রামনাথ দত্তের সহিত করণ করিয়া বিস্তর সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তি লাভের আশায় দনুজারির ভ্রাতুষ্পুত্র (কংসারির পুত্র) কমলনয়ন দিনাজপুরবাসী হইয়াছিলেন।

ঘটককেশরীর প্রাচীন কারিকায় লিখিত আছে—

"কমলাকান্ত মহাশয়ঃ পরমকো শ্রীবিষ্ণুদত্তালয়ে।
কক্ষা খর্ব্ব সুগর্ব্ব মিলিতে চাত্র ন চাদাৎ কুলং॥"

উদ্ধৃত কারিকা অনুসারে কমলাকান্ত বা কমলনয়ন ঘোষও শ্রীবিষ্ণুদত্তের ঘরে বিবাহ করিয়াছিলেন।

রাজা রামনাথের দুই পুত্র রাজা ভগবান্ ও রাজা প্রাণনাথ। কুলকারিকায় প্রাণনাথের নাম প্রথম উল্লেখ থাকায় তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু রাজবংশের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পিতৃপদ লাভের সর্ব্বত্র নিদর্শন থাকায় পিতৃপদে অভিষিক্ত

দিনাজপুরবাসী রাজা ভগবান্‌কেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছি। সম্ভবতঃ কারিকায় কবিতা মিলাইবার সুবিধার জন্য নাম দুইটী অগ্রপশ্চাৎ লিখিত হইয়াছে।

নিম্নে উভয়ের বংশলতা দেওয়া হইল—
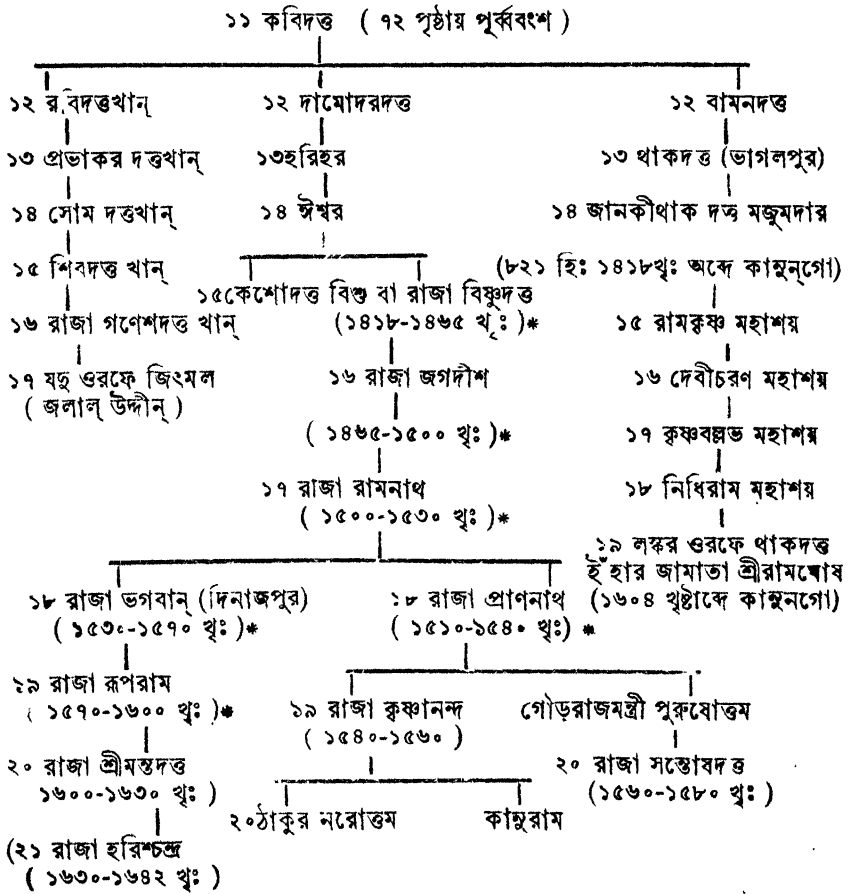
দিনাজপুরপতি রাজা ভগবান্ দত্তের সমকালে বর্দ্ধনকুটীতে যিনি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নাম ছিল ভগবান্ দেব। এই বংশ বারেন্দ্র কায়স্থ অতি প্রাচীন ঘর। ভগবান্ দত্তের সহিত ভগবান্ দেবের প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। কুলগ্রন্থে কোথাও কোথাও রাজা বিষ্ণুদত্ত অশ্বঘাটের সভাপতি বলিয়া পরিচিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অশ্বঘাট বা সরকার ঘোড়াঘাট বর্দ্ধনকুটীরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। তবে কেবল সরকার ঘোড়াঘাট বলিয়া নহে, পার্শ্ববর্ত্তী আরও তিনটী সরকার কানুনগোই-সূত্রে বিষ্ণুদত্তের শাসনাধীন ছিল। এই কারণেই তিনি অশ্বঘাটের সভাপতি বলিয়া বোধ হয় পরিচিত হইয়া থাকিবেন।

* চিহ্নিত অব্দগুলি সমসাময়িক ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আনুমানিক ধরা হইয়াছে।

বর্দ্ধনকুটীরাজ ভগবান্ দেবের অধিক বয়সে পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি প্রিয়বন্ধু রাজা ভগবান্ দত্তকে সমুদয় রাজ্য দিয়া যাইবার ইচ্ছা করেন। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুকাল নিকট-বর্ত্তী জানিয়া বর্দ্ধনকুটীপতি মহাস্থানগড়ে করতোয়া তীর্থে আসিয়া প্রায়োপবেশন করেন। তিনি প্রিয়বন্ধু ভগবান্ দত্তকে তাঁহার সহিত শেষ দেখা করিবার জন্য সংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আসিয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বেই রাজা ভগবান্ দেবের মৃত্যু হয়। বর্দ্ধনকুটীরাজের নিকট তৎকালে তাঁহার খাসনবীশ (Private Secretary) ভগবান্ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ তিনি রাজা ভগবান্ দেবের আদেশ অনুসারে রাজ্যদানপত্র লিখিয়াছিলেন।

সেই দানপত্রে রাজা ভগবান্ দেবের অভিপ্রায় অনুসারে রাজা ভগবান্ দত্তের নাম থাকিবার কথা। কিন্তু ধূর্ত্ত খাসনবিশ সেই স্থলে নিজের নাম বসাইয়া কৌশলে মুমূর্ষু বর্দ্ধনকুটীরাজের স্বাক্ষর বা শীলমোহর করাইয়া লইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যদুনন্দনের বারেন্দ্র ঢাকুরে লিখিত আছে—

"তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী। আর্য্যবর মণ্ডল বাস কৈলা বর্দ্ধনকুটী॥
তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাতুরী। রাজা ভগবান্ মৈলে নিল জমিদারী॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালায় আইল। নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিল॥"

যদুনন্দনের উক্ত বর্ণনার সহিত গুড্‌ল্যাড সাহেবের রিপোর্ট মিল না হওয়ায় যদুনন্দনের উক্তিতে সন্দেহ হইয়াছিল।* এখন কুলগ্রন্থ ও দিনাজপুর রাজবংশের প্রবাদ হইতে যদুনন্দনের কথা অপ্রকৃত বলিয়া মনে হইতেছে না। যদুনন্দনের মতে ভগবান্ মণ্ডলের পিতা আর্য্যবর মণ্ডলই ১ম বর্দ্ধনকুটীতে আসিয়া বাস করেন, সুতরাং নবাগত হইতেছেন। তৎপুত্র ভগবান্ মণ্ডল বর্দ্ধনকুটীরাজের খাসনবিশ হইয়াছিলেন, এবং তিনি কিরূপ চাতুরী করিয়া জমিদারী গ্রহণ করেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিত আছে।

রাজা ভগবান্ দত্ত বন্ধু রাজা ভগবান্ দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন এবং বর্দ্ধনকুটীরাজ যে তাঁহাকেই রাজ্য সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়বন্ধুবিয়োগ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল, এ নিমিত্ত কালবিলম্ব না করিয়া তিনি নিজ দিনাজপুর রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এ দিকে খাসনবিশ ভগবান্ মণ্ডল বৃদ্ধ রাজার দানপত্র সকলকে দেখাইয়া বর্দ্ধনকুটী জমিদারী দখল করিয়া বসিলেন এবং আপনার স্বত্ব পাকা করিবার জন্য মুসলমান অধিপতিকে বিস্তর নজর দিয়া এবং তাঁহার আমলাগণকে দানপত্র দেখাইয়া ও ঘুস দিয়া হাত করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং তাঁহার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগের আর বাধা থাকিল না।

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র কায়স্থ বিবরণ, ২৫২ পৃঃ।

বৰ্দ্ধনকুটীরাজ ভগবান্ দেবের মৃত্যুকালে তাঁহার এক মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। যথাকালে তিনি এক পুত্ররত্ন প্রসব করেন। এ সময়ে ভগবান্ মণ্ডল সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। পাছে তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির জন্ত তিনি রাজকুমারের প্রাণসংহার করেন, এই ভয়ে রাণী শিশু কুমারকে লইয়া গোপনে দিনাজপুরে পলাইয়া আসেন। এ সময়ে রাজা ভগবানের পুত্র রূপরাম দিনাজপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাণী ও শিশু রাজকুমারকে সসম্মানে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

রাজা রূপরাম জানিতেন বৰ্দ্ধনকুটীরাজ তাঁহার পিতার একান্ত বন্ধু এবং অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে তিনি সমুদয় রাজ্য তাঁহার পিতাকে দিয়া গেলেও যখন তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন সেই রাজত্ব পাইবে। তিনি রাজ্যাপহারক ভগবান্ মণ্ডলকে এ কথা জানাইয়া উপযুক্ত লোক পাঠাইলেন। কিন্তু মণ্ডল রাজা রূপরামের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মণ্ডল বুঝিয়াছিলেন, দিনাজপুরপতি সহজে ছাড়িবেন না। এ কারণ তিনিও অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। অল্পদিন মধ্যেই ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। রাজা রূপরাম প্রথমতঃ শত্রুপক্ষের অবস্থা না বুঝিয়া অল্পসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহার পরই বর্ষা আসিয়া পড়িল, সুতরাং রাজা রূপরাম এবার আর সুবিধা করিতে পারিলেন না। ভগবান্ মণ্ডলের প্রভাব বাড়িয়া গেল। এই ঘটনার পূর্ব্বেই কালাপাহাড়ের অভ্যুদয়। সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল যে কালাপাহাড় উৎকলের দেবমূর্ত্তি সকল ধ্বংস করিয়া মহাস্থানের দেবকীর্ত্তি নষ্ট করিতে আসিতেছে, এ সংবাদে সকলেই সশঙ্কিত হইল। হিন্দুর এই দারুণ দুর্দিনের সময় ভগবান্ মণ্ডল ও রাজা রূপরাম কিছুদিনের জন্ত পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এ দিকে রাজা রূপরাম নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি ভিতরে ভিতরে প্রভূত বল সঞ্চয় করিতেছিলেন। তিনি কমলনয়ন ঘোষের পুত্র মহাবীর জগদানন্দ ঘোষকে সেনানায়ক করিয়া ভগবান্ মণ্ডলকে দমন করিতে পাঠাইলেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে জগদানন্দ অর্জ্জুনের ন্যায় চরিত্রবান্ মহাবীর এবং অশ্বঘাটদেশবিজেতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তখনও পাঠান রাজত্বের অবসান হয় নাই—সুলতান সুলেমন কররাণী ভগবান্ মণ্ডলকে জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য ছিল না ' যাহা হউক জগদানন্দের বীরত্বে অশ্বঘাট জয় হইলে ভগবান্ মণ্ডল অশ্বঘাট বা ঘোড়াঘাট পরগণার পূর্ব্বাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

অল্পদিন পরেই সুলতান কররাণীর পুত্র গৌড়পতি দাউদ অকবরের সেনানীর হস্তে পরাজিত ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার সহিত গৌড়বঙ্গে পাঠান রাজত্বের অবসান হইল। যখন দক্ষিণবঙ্গে পাঠান রাজত্বের অবসান এবং মোগল প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল, তৎকালে উত্তরবঙ্গে কতকটা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই সময় সরকার ঘোড়া-

ঘাটের বিজিত অংশ জগদানন্দ ঘোষের পুত্র দৈবকীনন্দন ঘোষ শাসন করিতেছিলেন। এই সময় রাজা রূপরাম দত্ত স্বর্গারোহণ করেন এবং তৎপুত্র শ্রীমন্ত দত্ত পিতৃ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি মোগল বাদশাহ অকবর কর্ত্তৃক সমস্ত উত্তরবঙ্গের কানুনগো-পদে অধিষ্ঠিত হন এবং 'রাজা বাহাদুর' সনদ লাভ করেন। কানুনগোপদ প্রাপ্তির সঙ্গে তিনি রাজা ভগবান্ মণ্ডলকে শাসন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই সময় ভগবান্ মণ্ডল প্রজাবৃন্দকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বহু ধনরত্ন বিতরণ ও সংকীর্ত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সময় বর্দ্ধনকোটের তৎকালীন রাজধানী রামপুরে ১৫৩৩ শকে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে) যে বৃহৎ দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাই বোধ হয় তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তি রাজা মানসিংহ উত্তরবঙ্গে বন্দোবস্ত ও শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আগমন করেন। তিনি ভগবান্ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগ রাজা শ্রীমন্তদত্তের নিকট শুনিলেন। রাজা মানসিংহ ভগবান্ মণ্ডলকে রাজ্যাপহারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। বর্দ্ধনকুটী রাজ্যের যে অংশ দৈবকীনন্দন ওরফে নরসিংহের শাসনাধীন ছিল, সেই অংশ তাঁহার সহিত এবং যে অংশ ভগবান্ মণ্ডলের অধিকারে ছিল, সেই অংশ বর্দ্ধনকুটীরাজের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কুমুদানন্দের সহিত বন্দোবস্ত হইল। এইরূপে রাজা মানসিংহের বিচারে দৈবকীনন্দন বর্দ্ধনকুটীরাজের ।৵০ এবং কুমুদানন্দ ॥৵০ আনা অংশ পাইয়াছিলেন।

প্রাজ্ঞ শ্রীমন্তদত্ত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও সুবিবেচক রাজা ছিলেন। তাঁহার যত্নে দিনাজপুর রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি কুলীনপ্রবর দৈবকীনন্দন ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিরাম ঘোষের সহিত আপনার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে সমস্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ আহূত হইয়াছিলেন। বলিতে কি তৎকালে গৌড়বঙ্গের অধিকাংশ স্থান দত্ত-বংশীয় কানুনগো জমিদারগণের শাসনাধীন ছিল। পদ্মার উত্তরতীর হইতে নেপালের তরাই প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজা শ্রীমন্তদত্তের, পশ্চিমে ভাগলপুর প্রদেশ থাকদত্ত-বংশের এবং পদ্মা-নদীর দক্ষিণ হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভূভাগ কেশদত্তের বংশধরগণের শাসনে ছিল। সমাজপ্রতিষ্ঠাকালে এই দত্তবংশ উত্তররাঢ়ীয় কুলীন ও কুলজ্ঞগণের নিকট উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ না করিলেও এবং পদমর্য্যাদায় হীন বলিয়া অনেক স্থলে হেয় হইলেও দত্তবংশের অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের সহিত সর্ব্বত্রই এই দত্তবংশ সম্ভ্রম ও প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীমন্তদত্তের কন্যার বিবাহসভায় দত্ত ধনকুবেরগণ এবং সকল সমাজের প্রধান প্রধান কুলীনগণ সম্মিলিত হইলে কুলাচার্য্যগণ যে গাথা বা প্রশস্তি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে দত্তবংশের সকল প্রধানগণের এবং সমাগত কুলীনগণের নাম গ্রথিত ছিল।*

---

* দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি—এই কাগজ দিনাজপুর রাজ-বাটীতে রক্ষিত ছিল। ওয়েষ্টমেকট সাহেব দিনাজপুরের ইতিহাস লিখিবার জন্য রাজবাটী হইতে বহু প্রাচীন কাগজ লইয়া যান, সেই সঙ্গে উক্ত সভাপ্রশস্তিও লইয়া ছিলেন, আর ফেরত দেন নাই।

† উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড—২খণ্ড, ৫৯-৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজা শ্রীমন্তদত্ত প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ায় তাঁহার ভাগিনেয় (হরিরাম ঘোষের পুত্র) শুকদেব ঘোষ দিনাজপুরের রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। বর্ত্তমান দিনাজপুর-রাজবংশ রাজা শুকদেব রায়ের বংশধর। †

রাজা প্রাণনাথদত্ত ও খেতরী গোপালপুর শাখা।

রাজা রামনাথের কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণনাথ সম্ভবতঃ উন্নতির আশায় গৌড়ের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাই কুলকারিকায় বর্ণিত হইয়াছে—

"প্রাণনাথ গৌড়ে গেলা। ভগবান্ উত্তরে রহিলা॥
প্রাণনাথের উভয় নন্দ। পুরুষোত্তম আর কৃষ্ণানন্দ॥"

পুরুষোত্তমের নাম অগ্রে লিখিত হইলেও কৃষ্ণানন্দ জ্যেষ্ঠ ও পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ হইতেছেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। নরোত্তমবিলাসে এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"তথাহি সঙ্গীতমাধবে—

পদ্মাবতীতীরবর্ত্তী গোপালপুরনিবাসী গৌড়াধিরাজ-মহামাত্য শ্রীপুরুষোত্তমদত্তসত্তমতনুজ শ্রীসন্তোষদত্তঃ সহিত শ্রীনরোত্তমদত্তসত্তম মহাশয়ানাং কুলীয়ান্ পিতৃব্যজ ভ্রাতা শিষ্যস্তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ব্বরাগাদি বিলসার্হং সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদিদানেনাস্মান্ পুরস্কৃত্য সমর্পিতোঽস্তি স এব প্রস্তূয়তাং "

নরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে—

"জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম। লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য প্রিয়তম॥
শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত। তার পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্ব্বত্র॥"

আবার ঠাকুর নরোত্তমের জন্মকথা প্রসঙ্গে নরোত্তমবিলাসে লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান্। পৌত্রের কল্যাণে কৈল বহু অর্থদান॥"

বলাবাহুল্য নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত ও পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত খেতরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থান গোপালপুরের সামীল। নরোত্তমবিলাস ও বিদগ্ধমাধবপাঠে মনে হয়—নরোত্তমের পিতামহই গৌড়াধিরাজের সভায় মহামাত্যপদ লাভের সহিত প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে মুসলমান সুলতানের নিকট রাজোপাধি লাভ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি আপন রাজ্যভার জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দকে এবং গৌড়াধিরাজের মহামাত্যপদ পুরুষোত্তমকে দিয়া যান। নরোত্তমের জন্মকালে তিনি জীবিত ছিলেন। তবে পৌত্রমুখদর্শনের পর অনতিকাল পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। কারণ নরোত্তমের চরিতলেখকগণ তাঁহার বাল্যলীলাপ্রসঙ্গে পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পিতামহের আর কোন উল্লেখ করেন নাই।

দত্তবংশের অদ্বিতীয় গৌরব প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব অবতার নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নিজ অসাধারণ চরিত্রমাহাত্ম্যে গৌড়দেশ ধন্য করিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষের বিস্তৃত ইতিহাস এই বংশবিবরণ মধ্যে অসম্ভব। তথাপি ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও নরোত্তমবিলাস হইতে তাঁহার চরিতকথা অতি সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইতেছে—

"কিবা মাঘ পূর্ণিমা দিবস দণ্ড ছয়। সর্ব্ব সুলক্ষণ হৈল প্রকট সময়॥" (নরোত্তমবিলাস)

নরোত্তমের জন্ম তারিখ ঠিক জানা যায় না; তবে তখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে প্রকট আছেন, সুতরাং প্রায় ১৫৫৩ কি ৫৪ শকাব্দ (১৫৩১ কি ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ) হইবে।

নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই অতি মধুর প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে ও সুমধুর ব্যবহারে সকলেই আকৃষ্ট হইত। একদা কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, তিনি গৌরাঙ্গপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পরে যখন শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অপ্রকট হইয়াছেন তখন তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে তাঁহার পার্ষদগণ শ্রীবৃন্দাবনধামে গিয়া বাস করেন, নরোত্তমও বৃন্দাবন যাইবার জন্য অধীর হইলেন। তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া পিতামাতা অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

একদিন নরোত্তম পদ্মায় একাকী স্নান করিতে গিয়াছিলেন। বহুক্ষণ অতীত হইল তথাপি তিনি গৃহে ফিরিলেন না। তখন তাঁহার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল, এমন কি তাঁহার মাতা রাণী নারায়ণীও কাঁদিতে কাঁদিতে নদীতীরে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন বালক নরোত্তম ভাববিহ্বল হইয়া নদীতীরে নৃত্য করিতেছেন। সকলে বালককে গৃহে লইয়া আসিলেন। প্রেমবিলাসগ্রন্থে এই ঘটনার একটী পূর্ব্ব কারণ লিখিত আছে, তাহা এই—একদা মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে পদ্মাতীরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃষ্ণাবেশে 'নরোত্তম নরোত্তম' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতেই নরোত্তমের জন্ম। মহাপ্রভু নরোত্তমের জন্য প্রেমধন পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন। তিনি স্বপ্নাদেশ দিয়া নরোত্তমকে পদ্মাবতীতে স্নানার্থ প্রেরণ করেন ও তাঁহাকে গচ্ছিত প্রেমধনের অধিকারী করেন।

নরোত্তম বৃন্দাবন গমনে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মাতা পিতা তাঁহাকে বাধা দিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার গুণ শ্রবণ করিয়া জায়গীরদার তাঁহাকে আনাইয়া দেখিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তিনি প্রেরিত লোক সহ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সংবাদ পাইয়া রাজা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে ধরিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু নরোত্তম কিছুতেই আর রহিলেন না।

বৃন্দাবনে গিয়া তিনি শ্রীজীবগোস্বামীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। লোকনাথ গোস্বামীকে দেখিয়াই তাঁহাকে তিনি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন ও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণে

অভিলাষী হইলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে লোকনাথ গোস্বামী কাহাকেও শিষ্য করিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন অন্তরে নিদারুণ দুঃখ পাইয়া গোপনে তাঁহার সেবা আরম্ভ করেন। তৎসম্বন্ধে প্রেমবিলাসে লিখিত আছে—

"আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম। রাত্রিশেষে সেই সেবা করিল নিয়ম॥
যেই স্থানে গোসাঞি যায়েন বহির্দ্দেশ। সেই স্থানে যাই করে সংস্কার বিশেষ॥"

অনুরাগবল্লীতে ইহাও লিখিত আছে—

"মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটী আনে। ছড়া কাটি জল আনে বিবিধ বিধানে॥"

লোকনাথ ব্যাকুল হইলেন, কে এমন করে? একদিন রাত্রিশেষে তিনি বাহিরে আসিয়া সমস্তই দেখিলেন ও নরোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বোপর অবগত হইলেন। এইরূপে কয়েক বর্ষ সেবা করিবার পর নরোত্তমের আশা পূর্ণ হইল। গোস্বামী তাঁহাকে কৃপা করিলেন।

শ্রীজীবের নিকট সমস্ত গোস্বামিগ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধিতে বিভূষিত করিলেন।

"বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার। দেখি নরোত্তমের অদ্ভুত অধিকার॥
শ্রীজীবগোস্বামী বুঝি সবার আশয়। দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয়॥"

শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং শ্যামানন্দও অশেষ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই তিন জন দ্বারা শ্রীজীব বঙ্গদেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভক্তিগ্রন্থপূর্ণ একটী সিন্দুক দশজন পদাতিক সঙ্গে দিয়া ইঁহাদের সহিত পাঠাইলেন। পথি মধ্যে গোপালপুর নামক স্থানে মল্লরাজ বীর হাম্বীর নিযুক্ত দস্যু কর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি চুরি যায়। শ্রীনিবাস গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে সেখানে থাকিলেন, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ খেতরীতে আসিলেন।

অতঃপর নরোত্তম নবদ্বীপ ধামে গিয়া মহাপ্রভুর লীলা চিহ্ন সকল দর্শন করেন। তথা হইতে শান্তিপুর, ত্রিবেণী, খড়দহ ও খানাকুল এই সকল পাট দর্শন করিয়া নীলাচলে গমন করেন। নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া নরহরি দাস ঠাকুরের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করেন। অনন্তর তিনি কাঁটোয়ায় গমন করেন—এখানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও এখানে তাঁহার শেষচিহ্ন কেশের সমাধি দর্শন করেন।

ঠাকুর মহাশয় পুনর্ব্বার খেতরী আগমন করিলেন। খেতরীতে কীর্ত্তনানন্দের বন্যা বহিল। এখানে তিনি বিগ্রহ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণানন্দ নিজে এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত 'গরাণহাটী' কীর্ত্তন পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। কথিত আছে এ কীর্ত্তনে স্বগণ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বিগ্রহ স্থাপিত হইল। স্থাপিত বিগ্রহ ছয়টীর নাম ঠাকুর মহাশয়ের রচিত নিম্নের শ্লোকটীতে আছে—

"গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥"

শ্রীনিবাস এবং রামচন্দ্র কবিরাজ এই উৎসবে আগমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সহিত নরোত্তমের প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল, তিনি খেতরীতেই রহিয়া গেলেন। এই সময়ে বলরাম মিশ্র, রামকৃষ্ণ আচার্য্য, হরিরাম আচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ মহা বিচলিত হইয়া মিথিলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুরারিকে আনাইলেন। বিচারে মুরারি পরাজিত হইলেন। পূর্ব্বেই নরোত্তমের পিতৃব্য মহামাত্য পুরুষোত্তমের মৃত্যু হইয়াছিল। ঠাকুর মহাশয় বিষয়বিরক্ত বলিয়া রাজা কৃষ্ণানন্দও ভ্রাতৃপুত্র সন্তোষদত্তকে রাজ্যাধিকার দিয়া যান। রাজা সন্তোষদত্ত ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইয়া তাঁহার সেবার ভার নিজে গ্রহণ করেন। অল্প দিন পরে গাম্ভিলানিবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ রাজা নরসিংহের শরণাপন্ন হন। যাহা হউক, রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ রাজপ্রেরিত পণ্ডিতবূ্যহকে পরাস্ত করিলেন। রাজা নরসিংহ সস্ত্রীক ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হইলেন। পরে গৌড়াধিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা চাঁদরায়ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যের আহ্বানে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গমন করেন। রামচন্দ্র আর ফিরিয়া আসেন নাই। এই সময়ে প্রিয় সঙ্গীর বিরহে ঠাকুর মহাশয় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়া ছিলেন। দিবারাত্র 'প্রেমস্থলী' নামক ভজন স্থানে গিয়া পড়িয়া থাকিতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। আচার্য্য ও রামচন্দ্রের বিয়োগের পর তাঁহার যে ভাব হইয়াছিল, তাহা রাধিকাবিরহভাব—সাধকের শেষ অবস্থা। তিনি বুঝিলেন, বিরহব্যথায় তিনি আর দেহ ধারণ করিতে পারিতেছেন না। শিষ্যগণকে ডাকিয়া বিগ্রহ গুলি দান করিলেন। তখন একবার প্রিয় রামচন্দ্রের আলয় বুধুরীতে গমন করিলেন ও রামচন্দ্রের অনুজ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের পদাবলী শুনিলেন। পরদিন বুধুরী হইতে গাম্ভিলা গ্রামে প্রিয় শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে গমন করিলেন। এখানে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর মহাশয় গঙ্গাতীর্থে দেহ রক্ষা করেন। সে কাহিনী অত্যাশ্চর্য্য। ঠাকুর মহাশয় কয়েক দিন পীড়িত, শিষ্যগণ তাঁহাকে ঘাটে লইয়া গিয়াছেন, আস্তে আস্তে তাঁহার গাত্র মার্জ্জন করিতেছেন।

"দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিলাইলা গঙ্গার জলেতে॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈল অন্তর্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্জেয় ইহা কে বুঝিবে আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল॥" (নরোত্তমবিলাস)

এইরূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গঙ্গার কোলে অপ্রকট হইলেন, কায়স্থ জগতের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক চিরতরে অস্তমিত হইলেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় চির ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ সন্তোষদত্তকে রাজ্যভার দিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কুলকারিকায় দেখা যাইতেছে—

"কানুরামে রাজ্যনাশ। ভগবানে সুপ্রকাশ॥"

কানুরাম নরোত্তমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ পুত্র থাকিতে রাজা কৃষ্ণানন্দ ভাইপো সন্তোষকে রাজ্যভার দিবার কারণ কি? সম্ভবতঃ কানুরাম বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, বিষয় কর্ম্ম পরিচালনে অনুপযুক্ত মনে করিয়াই কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে রাজ্যভার না দিয়া সন্তোষকে রাজা করিয়া গিয়াছিলেন।* এদিকে রাজা সন্তোষদত্ত ঠাকুর মহাশয়ের সেবা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রধান প্রধান ভক্ত সহবাসে তাঁহার হৃদয়েও সংসারবৈরাগ্য উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ তিনিও পরে কানুরামকে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে কানুরাম রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সম্ভবতঃ নূতন মোগল সরকার ভূতপূর্ব্ব পাঠান গৌড়পতির মন্ত্রিবংশকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। কানুরামের সহিত গোপালপুর-রাজ্যের অবসান হইল—কিন্তু খেতরী আজও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অধিষ্ঠান হেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। আজও বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে খেতরীতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সহিত বহু ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা বিষ্ণুদত্তের বংশে রাজা ভগবানের ধারায় রাজা হরিশ্চন্দ্র পর্য্যন্ত রাজ্য করিবার পর বংশ শেষ হওয়ায়, দৌহিত্র রাজা শুকদেব রায় দিনাজপুররাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। অপর দিকে রাজা প্রাণনাথের ধারায় রাজা কৃষ্ণানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুর নরোত্তম বিবাহ করেন নাই এজন্য তাঁহার বংশ নাই। কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ দত্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারও বংশের উল্লেখ দেখা যায় না। ঘটককারিকায় লিখিত রহিয়াছে—

"নরোত্তমে বংশ নাই। কানুরাম বংশ পাই॥"

ঠাকুর নরোত্তম বৈরাগ্য অবলম্বন করায় রাজা কৃষ্ণানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। শেষে সন্তোষ যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করেন তখন কানুরামকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কানুরামের বিষয় বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল না এবং তৎকালে গৌড়ের স্বাধীন পাঠান বংশের রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় ও মোগল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অল্পদিন মধ্যেই কানুরামের রাজ্য নষ্ট হইল। তাঁহার বংশধরগণ সম্পত্তিহীন হইলে সমাজ

---

* "মহারাষ্ট্র পুরুষোত্তম দত্তের তনয়। শ্রীসন্তোষ দত্ত নাম গুণের আলয়।
শ্রীনরোত্তমের তেঁহ পিতৃব্যকুমার। কৃষ্ণানন্দ দত্ত যারে দিলা রাজ্যভার।
ঐছে শ্রীসন্তোষ রাজা মঙ্গল বিধানে। করেন অনেক দান ব্রাহ্মণ সজ্জনে॥"

(নরোত্তম বিলাস)

বা ঘটকগণ আর তাঁহাদিগের সংবাদ রাখিতেন না। সম্প্রতি জেলা মালদহ তুলসীহাটের নিকট দৌলা বিষ্ণুপুর গ্রামে বিষ্ণুদত্তের একটী বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কানুরামের পক্ষে ২।৩ পুরুষের নাম পাওয়া না গেলেও নিম্নে তাঁহাদিগের প্রদত্ত বংশলতা দেওয়া হইল

দৌলাবিষ্ণুপুরের দত্তবংশ নারায়ণচন্দ্র দত্ত

গৌরপ্রসাদ

নিমাইচাঁদ

তিনকড়ি

রঘুনন্দন

বাঞ্ছারামসুত আনন্দমোহন

ব্রজবল্লভ ছত্রধর

রমেশচন্দ্র কালীকৃষ্ণ

(১) প্রসন্নচন্দ্র দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিয়া রায় সাহেব উপাধি লাভ করিয়াছেন ও সম্প্রতি পেনশন লইয়া ভাগলপুর সহরে বাস করিতেছেন।

ঠেঙ্গাপুরের দত্তবংশ
১২ রবিদত্ত (১০৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
১৩ বিভাকর
১৪ সৃষ্টিধর
১৫ সর্ব্বেশ্বর
১৬ ঈশান
১৭ বৈকুণ্ঠ
১৮ ভগবান্
১৯নবকিশোর জগমোহন চন্দ্রকান্ত
২০রামচরণ হীরালাল
২১কাশীনাথ বংশীধর
২২ হরিমোহন দোলগোবিন্দ
রামকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ২৩ বৈকুণ্ঠ
২৪ মণিরাম
২৫ দুর্গাচরণ (দুঃখরাম) মহাদেব
২৬ গোকুলচন্দ্র (বাস রঘুনাথপুর জেলা নদিয়া)
সুবল ২৭ শ্রীদাম ২৭ রামলোচন
২৮ রামানন্দ
২৮ কৃষ্ণধন লক্ষ্মীনারায়ণ নবকিশোর
২৯ কেশব
২৯কৈলাস প্রাণবন্ধু ত্রৈলোক্য বিপিনবিহারী
৩০ রাধাবল্লভ শরৎচন্দ্র
৩০ আশুতোষ নবদ্বীপ পঙ্কজ গোবিন্দবল্লভ
৩১ মুরারি অহিভূষণ
অমূল্য রণজিৎ বিভূতি বিরজা

দশম অধ্যায়

ভাগলপুরের থাকদত্ত-বংশ

কবিদত্তের নয় পুত্র মধ্যে রবিদত্ত খাঁ, দামোদর দত্ত ও বামন দত্তের বংশধরগণ এককালে অতি প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছিলেন। রবিদত্তবংশে রাজা গণেশের বিবরণ, দামোদরে পাটুলির কেশদত্ত-বংশ ও বিষ্ণুদত্ত বংশে ঠাকুর নরোত্তম ও দিনাজপুর-রাজবংশের বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে। বামনদত্তের চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ থাকদত্ত, মধ্যম ভৃগুদত্ত অপর নাম ছাগদত্ত, তৃতীয় ভাগনাথ দত্ত ও কনিষ্ঠ বিভাগদত্ত। থাকদত্তের প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ প্রথমে তিনি থাক সেরেস্তার কর্ম্ম করায় থাকদত্ত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তদবধি এই বংশের প্রধান ব্যক্তি রাজসরকারে 'থাকদত্ত' নামে পরিচিত হইতেন। ভাগলপুরের মহাশয় বংশের পুরাতন কাগজে লস্কর দত্তের নামের 'উরুফ থাকদত্ত মজুমদার' লেখা রহিয়াছে। আবার কোথাও বা জানকী দত্ত উরুফ থাকদত্ত মজুমদার দেখা যায়। জানকী দত্তের নামের সহিত প্রথম 'মজুমদার' উপাধি পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় জানকী থাকদত্তই এই বংশে প্রথম কানুনগো হইয়াছিলেন। লস্কর দত্তের বংশধর ভাগলপুরের উকিল এবং উক্ত জেলার রামচন্দ্রপুর ইটহরি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত নদীয়া চাঁদ দত্ত তাঁহাদের যে বংশ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় হিজরী সন ৮২১ সালে থাকদত্ত ফর্ম্মান্ পাইয়া ভাগলপুর প্রদেশের কানুনগো হইয়াছিলেন। হিজরী ৮২১ সন বা ইংরাজী ১৪১৮ সালে বাঙ্গলা বা বেহার প্রদেশ দিল্লীর বাদশাহগণের অধীন ছিল না। ইংরাজী ইং ১৪১৪ মতান্তরে ১৪১৮ সালে গৌড়াধিপতি রাজা গণেশ পরলোকগমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র যদু বা জলালুদ্দীন্ এই ফর্ম্মান দিয়া থাকিবেন। আমরা এই ফর্ম্মান্ বা তাহার নকল পাই নাই। সুতরাং কাহার নামে এই ফর্ম্মান দেওয়া হইয়াছিল বা কে তাহা দিয়াছিলেন ঠিক জানা গেল না। যাহা হউক দত্তবংশধর গৌড়ের একচ্ছত্রী অধীশ্বর হইলে তাঁহার জ্ঞাতিগণ যে তদন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। থাকদত্তের পুত্র জানকী দত্তের পরে তিনপুরুষের নাম ঘটকের পুঁথিতে পাইলেও মহাশয়জীর সেরেস্তায় পাওয়া যায় নাই। শেষে লস্কর দত্তের নাম পাওয়া যাইতেছে। জানকী দত্তের পুত্র রামকৃষ্ণ, তৎপুত্র দেবীচরণ ও তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভের তিন পুত্র, কৃষ্ণপ্রসাদ দত্ত, লস্কর দত্ত ও ভরত দত্ত। এই লস্কর দত্তের নামের স্থলে ঘটকের কাগজে লক্ষণ দত্ত দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাহা নকলের ভুল। কৃষ্ণপ্রসাদ ও ভরতের বংশ যশোর শিবনগর ও পাদগাছিতে আছেন। লস্কর দত্তের বংশ ভাগলপুরে রহিয়াছেন।

লস্কর দত্ত দিল্লীর বাদশাহ অকবর শাহের সময়ে ভাগলপুর অঞ্চলের কানুনগোই ছিলেন। ৮২১ সনের ফর্ম্মান অনুসারে পূর্ব্বপুরুষগণ গড় ইটহরি বা রামচন্দ্রপুর ইটহরির চাক্‌লেদার ও মকদ্দম নিযুক্ত হইলেও তাঁহারা ডুমরামা গ্রামের নিকটে বাস করিয়াছিলেন এবং উক্ত গ্রামের নাম দত্তবাটী রাখিয়াছিলেন। দত্তবাটীর নিকটবর্ত্তী বনহরা গ্রামে এতদঞ্চলের রাজকার্য্যালয় ছিল এবং তথায় বাদশাহ বা তৎপ্রতিনিধির বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। থাকদত্ত রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ উক্ত স্থানে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। এজন্য এখনও উক্ত স্থানকে তখ্‌ত বন্‌হরা বলিয়া থাকে। এদেশের লোকের ধারণা রহিয়াছে থাকদত্ত এদেশের রাজা ছিলেন। বনহরা গ্রামে এখনও প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ও একটি ভগ্ন শিবমন্দির পরিদৃষ্ট হয়।

লস্কর দত্ত বাদশাহের নিকট হইতে "মহাশয়" ও "মজুমদার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিবার পর বৃদ্ধ বয়সে বাদশাহ তাঁহাকে দিল্লীতে তলব করিয়াছিলেন। লস্কর দত্তের বয়স অধিক হইয়াছিল, তথাপি তিনি ক্ষমতাপ্রিয় ও অভিমানী ছিলেন, এজন্য বাদশাহ তাঁহার স্থলে অন্যলোক নিযুক্ত করিবার মনন করিয়াছিলেন। লস্কর দত্তের জামাতা শ্রীরাম ঘোষ তাঁহার সঙ্গে দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাম ঘোষকে বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মঠ দেখিয়া বাদশাহ লস্কর দত্তের পদে শ্রীরাম ঘোষকে কানুনগোই নিযুক্ত করিলেন ও তৎসহ পুরুষানুক্রমে ব্যবহার জন্য "মহাশয়" উপাধি প্রদান করিলেন। খৃষ্টীয় ১৬০৫ অব্দে শ্রীরাম ঘোষকে এই ফর্ম্মান প্রদান করা হয়। অভিমানী ও ক্ষমতাপ্রিয় বৃদ্ধ লস্কর দত্ত জামাতার এইরূপ পদপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া জামাতা তাঁহার অধিকার কাড়িয়া লইয়াছেন বলিয়া শ্রীরামের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য পরিশেষে শ্রীরাম ঘোষই আধিপত্য স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার বংশধরগণ এখনও "মহাশয়" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। দত্তবাটীর সমীপবর্ত্তী ঘোষপুরে শ্রীরাম ঘোষের বাসভবন ছিল, এজন্য লস্কর দত্তের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ কেহ কাশপুরে, কেহ কসবায়, কেহ রামচন্দ্রপুর ইটহরিতে, কেহ রূপসা এবং কেহ বা বেরামা গ্রামে বাস স্থাপন করেন। তাঁহারা এখনও তত্তৎস্থানে বাস করিতেছেন।

কানুনগোই পদের সহিত তৎসংসৃষ্ট সম্পত্তি গুলি শ্রীরাম ঘোষের হস্তগত হইয়া পড়ে। উপরি লিখিত কয়খানি গ্রাম লস্কর দত্তের বংশধরগণের অধিকারে রহিয়া যায় এবং এখনও কিছু কিছু রহিয়াছে। তাঁহারা কেহ কেহ মজুমদার উপাধি ব্যবহার করিলেও কেহই এখন মহাশয় উপাধি ব্যবহার করেন না।

এই বংশে দুলালচন্দ্র দত্ত কাশপুর হইতে আসিয়া ইটহরিতে বাস করেন। কিন্তু এখনও কাশপুরে দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে তাঁহার বংশধরগণকে তথায় যাইতে হয়।

ইংরাজী সন ১৮০০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের সনদপাটাদ্বারা হৃদয়রাম মজুমদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে রামচন্দ্রপুর ইটহরি জমিদারী বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন।

দুলাল চন্দ্রের পৌত্র নদীয়াচাঁদ দত্ত বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাগলপুরে ওকালতি করিতেছিলেন। পরে লছমীপুরের রাজা স্বর্গীয় ঠাকুর প্রতাপনারায়ণ তাঁহাকে স্বীয় এষ্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পরলোক গমন করেন। তদবধি তিনি উক্ত এষ্টেটের কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কাজ করেন না এবং দীর্ঘকাল বিশ্বাসের সহিত কর্ম্ম করায় প্রজা সাধারণ, রাণীগণ ও রাজপুরুষগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। নিম্নে থাকদত্তের বংশলতা উদ্ধৃত হইল—

১৯ মহাশয় লস্কর দত্ত ওরফে থাকদত্ত মজুমদার (ভাগলপুর), তৎসুত ২০ মস্‌হর দত্ত, সুত ২১ কৃতপাল দত্ত, সুত ২২ মদনদত্ত
২৩ ক্ষেমানন্দ দত্ত
২৩ গঙ্গারাম বিঃ উমদানন্দ (রূপসা)
২৪ চক্রপাণি
ত্রিলোকচন্দ্র
২৪ ভীমলাল
২৫ তুলারাম
২৬ বহোরলাল
২৫ রণপাল
২৫ মনোমোহন
২৬ দুলালচন্দ্র
সুলীলা
নন্দকিশোর
২৬আশানন্দ
হৃদয়রাম
২৭ নারায়ণচন্দ্র
২৮ দুলাষচন্দ্র
২৭ হৃদয়রাম
২৮ আত্মারাম
২৯ কান্তরাম সেবকরাম
২৭ উগ্রসেন
২৮ নারায়ণ হীরালাল রুদ্রমোহন
২৯ রতনলাল
২৯ ফাগুলাল
গোপাল ২৯মাখনলাল
৩০ লক্ষ্মীনাথ গৌরীনাথ ভোলানাথ
৩০ বংশীলাল মুরারিলাল ঝবকলাল ৩০শ্যামলাল ৩০কালীপ্রসাদ
৩০ সুন্দরচাঁদ
৩০ শ্রীচাঁদ ৩০ বুন্দীলাল ৩০নদীয়াচাঁদ ৩০গরিশ ৩১দ্বারিকানাথ কার্ত্তিকলাল
৩১ সুধীরচন্দ্র ৩২ লাড্‌লীমোহন ৩১দুর্গাপ্রসাদ হরিপ্রসাদ সিংহেশ্বর
৩১লাড্‌লীমোহন ৩১তারিণীপ্রসাদ ব্রজমোহন
৩১ ছেদিপ্রসাদ ৩১নরেন্দ্রনাথ
৩২তারিণী সারদা
৩১তিতুলাল সখিলাল ৩১ চন্দ্রকান্ত
৩২ নগেন্দ্রনাথ
৩১ বিভূতিভূষণ
৩১ কুমারচন্দ্র
সতীশ
বিজয়বসন্ত
৩২ যতীন্দ্র উপেন্দ্র উমেশ খোকা
৩২ রমণীমোহন শচীন্দ্রনাথ
অনাদিনাথ
পুত্র
৩২ প্রকাশ পুত্র
পুত্র পুত্র

ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশে ও সাওতাল পরগণা জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে কয়েক খানি গ্রামে কাশ্যপ দত্ত বংশ বাস করিতেছেন, তাঁহারা থাকদত্তের সন্তান বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ নিরোলের দত্ত গোপাল দত্তের ধারা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা থাক দত্তের বংশ না হইলেও জ্ঞাতি হওয়া সম্ভব। মাদারি গ্রাম হইতে এক খানি কুরশী নামা পাওয়া গিয়াছে এখানে তাহা দেওয়া হইল।

একাদশ অধ্যায়।

কাশ্যপ-দত্তবংশ কাপদত্তের ধারা
১ দেবদত্তসুত ২ আদিত্য, তৎসুত ৩ বিনায়ক
৪ কাপ
৪ তপন
৫ তপস্বী
৬ রক্ষাকরসুত ৭উষাকর (বংশ ভাগলপুর)
৬ মথুরেশ
৮ ধীরনারায়ণ ৮ ধূমকেতু (বংশ অশ্বঘাট)
৯ ভাস্কর
১০ সুধাকৃষ্ণ কুশল কৃষ্ণকিশোর কৃষ্ণহরি
১১ অনন্ত যাদবেন্দু উদয় কালী ২৪আনন্দী কৃপা বন্দী গুরু রাধা রামশ্রীকান্ত গতি বিশ্ব
১২কেবলরাম কৃষ্ণ রাম বংশী মদন বংশীধর
১৩ রমানাথ
১৪ কৃষ্ণকিশের ১৪ রামকিশোর
১৫ যজ্ঞেশ্বর
১৬ কাফেশ্বর
১৭পরমানন্দ (পাড়াল) পশুপতি (অশ্বঘাট)
১৮ বিদ্যানন্দ মহানন্দ সদানন্দ রামানন্দ সর্বানন্দ হরানন্দ ধ্রুবানন্দ
অগ্নিঋষি (বিঃ শ্মশানেশ)
১৯ হরিহর হরিরাম
২০ শ্রীচন্দ্র ২০শ্রীনিধি
হরিহরসুত ২০ শ্রীচন্দ্র
২১ দেবীদাস
২২ রামজীবন
২৩ তেকুরাম (সুত ১১)
২৫রামকৃষ্ণ
২৫ফকির প্রসাদ দৌলত ২৫বদন বল্লভাকান্ত
২৫ যাদব দীনবন্ধু জগচ্চন্দ্র
২৬শ্যামসুন্দররায় ২৬ধনকৃষ্ণ
২৬নীলকণ্ঠ ২৬ব্রজমোহন
২৬শিবনারায়ণ ২৬ দ্বারিকানাথ
২৭ কৃষ্ণচন্দ্র
২৭ অক্ষয়রাম
হরিহরসুত ২০ শ্রীনিধি
২১ চিরঞ্জীব
২২ পরশুরাম
২৩ রঘুনাথ
২৪ কালীচরণ
২৫কৃষ্ণপ্রসাদ ২৫করুণাময়
২৬ শ্রীমন্ত যুগল নবকিশোর

১৮ বিদ্যানন্দসুত ১৯ হরিরাম (১৪৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
২০ লোকনাথ মধুসূদন রামরাম রাধারাম
২১ রামানন্দ পরমানন্দ (বীরভূম রাইপুর)
২২ কৃষ্ণানন্দ গৌরহরি
২৩ গঙ্গাহরি পুরুষোত্তম শিবরাম যদুনন্দন চন্দ্রশেখর ভগবান্ রাঘব শ্রীরাম
২৪ মনোহর দিবাকর যাদবানন্দ বসন্ত জগবন্ধু
২৫ কল্যাণ হরগোবিন্দ জিতরাম
২৬সন্তোষজগন্নাথরাজবল্লভ উদয় হরিজিউগোপীনাথ দীনরাম কৃপারাম লোকনাথ
২৭রামচন্দ্র গোকুল লক্ষ্মীকান্ত
অদ্বৈত রাম রাধামোহন নন্দ ক্ষেত্রনাথ
কৃষ্ণকান্ত
নিমাই মদন বলরাম কানাই রামচরণ মদনদোলগোবিন্দগৌরহরি
রাসবেহারীবৈকুণ্ঠ নারায়ণ হরিপ্রসাদ
শ্যামসুন্দর
২৯ বৃন্দাবন সীতানাথ দ্বারিকানাথ
শ্রীরাম ২৯খুদিরাম
গুরুচরণ হরিপ্রসাদ গয়াচাঁদ শ্রীনাথ প্রাণনাথ
৩০ জীবন রামকুমার
কৃষ্ণানন্দসুত ২৩ পুরুষোত্তম
২৪ নন্দরাম রামচন্দ্র রামগোপাল রামগোবিন্দ
২৫কিশোর ২৫ বিশ্বম্ভর
২৫ পীতাম্বর নীলাম্বর গন্ধর্ব্ব হরনারায়ণ ২৫গরুড়
২৬গোপাল
২৬ নিতাই ২৬যুগল গদাধর খোসাল
২৬ জয়নারায়ণ গোলোকনাথ স্বরূপ
(রাইপুর) ২৭মাণিক ২৭ নকড়ি কৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ
রাম
২৭ কেনারাম রাধানাথ
২৮ নন্দকুমার সাধুচরণ মহৎচরণ
২৮ গোপীনাথ গুরুদাস ২৯ শ্রীনিবাস

কৃষ্ণানন্দ (১৪৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
৩০শ্রীনিবাস
কুঞ্জ মহানন্দ যাদব মাধব রাধা
২৯অনুপম
৩২উপেন্দ্র
৩১দুর্গাচরণ ৩১রাইকিশোর
৩২ গোপাল ৩২মহানন্দ
উদয় বনচন্দ্র গদাধর মুলুকচাঁদ ২৬ইন্দ্রনারায়ণ
২৭ যজ্ঞেশ্বর
গৌরসুন্দর রামলোচন
২৮ নিতাই (রাইপুরের নিকট কাঁকুড়ি)
২৩ যদুনন্দন
২৪ কৃষ্ণবল্লভ
২৫ রাজারাম আকুলদত্ত বাণেশ্বর
২৩ চন্দ্রশেখর
২৪ রঘুনাথ জগৎ প্রসাদ বৃন্দাবন
২৫কিঙ্কর
২৫ শঙ্কর কাশীনাথ
২৬ শতঞ্জীব
২৬ রামদত্ত ভজরাম জনার্দ্দন চৈতন্য আলমচাঁদ
২৭রামগোবিন্দ
কার্ত্তিক বনমালী মঞ্জর মহেশ্বর
কুঞ্জবিহারী আমীরচাঁদ মদন কানাই ২৮কৃষ্ণদাস সদানন্দ
২৭ ভবানী বিশ্বম্ভর
২৭ যুগলকিশোর ২৭লাউসেন
২৭ পরীক্ষিৎ
২৭শুকদেব (রূপনারায়
২৮ কেবলরাম অচ্যুত
২৮ কৃষ্ণদেব
পতিতপাবন ২৮মথুরাপ্রসাদ ২৮করুণাময়
২৮ হরিদেব
২৮ রামকৃষ্ণ
২৯ ভিখারী অম্বিকা
২৯ বিপিন বদন ২৯বৃন্দাবন ২৯রাজীবলোচন
২৯ হরিহর
২৯ত্রিলোকনাথ ২৯ বৈদ্যনাথ পার্ব্বতী ২৯কাশীনাথ লোচন নফর
জয় ৩০ নবীন বৈকুণ্ঠ
৩০ নবকুমার
৩০ গয়ানাথ
অক্ষয় মদন
রামসুন্দর
উমাচরণ
৩১ আবনাশ
৩১গোরাচাঁদ নিত্যানন্দ
৩১ গঙ্গাগোবিন্দ
৩১ ক্ষেত্রনাথ সীতারাম অনুপম দীপচাঁদ
প্যারীচরণ৩০শ্রীনিবাস
৩২শশধর মুরলী ৩২দেবেন্দ্র
রাখহরি
গিরিশ
ঈশান
৩০রামধন ঈশ্বর৩১মহেশ্বরপরমেশ্বরযজ্ঞেশ্বর নবদ্বীপ
৩২কেশব ৩২রাখাল
সারদা

দ্বাদশ অধ্যায়

দত্তবংশের ভাবকারিকা ও বর্ত্তমান বাসস্থান

ঘনশ্যাম মিত্র এইরূপ ভাব নির্ণয় করিয়াছেন—

"দত্ত দামু বামন ব্যাসবাটী তাজা চারি। রুদ্র শ্রীধর কেশু বিশু কহিয়া দিল সারি॥
দত্তবাটী ঠেঞাপুর নিরোল সিলোড়ি। অগ্রগণ্য তুল্য মান্য গণিয়া দিল খড়ি॥
দামুতে এরেড়া কেবল বামন চতুর গাঞি। কেবলবাটী ব্যাসদত্ত পরে আর নাই॥
বামনে টিকরি আগে কুজুড়া উত্তরপাড়া। তল সরসি আগরডাঙ্গি পরে ঐ বিছাড়া॥
রুদ্র দত্ত শাণিয়া শ্রীধর কাটোয়া রাওতড়া। সেরপুর সমীপে শক্তি দত্তবাড়ী ছাড়া॥
বিশে বাটী নগাঁ ভালাই গড়ের হাটে গড়া। কেশে কেবল দেশে বাটী পাটুলিতে খড়া॥
বরটিয়া ছাড়িয়া বলি পাড়ানের ঠাঞি। শ্রীগাঁ শ্রীনিধিপুর গোকর্ণ পাথাই॥
গোয়াল গাঁ মালতী এই পাড়ানের ঘর। হরির পাড়া না পাই দেশে দেখি সকল রাঢ়॥
অনল ঋষি সিমলিবাসী কাগাসবাসী পরে। তাজা মাজা অষ্ট রিপু সীমা দত্ত ঘরে॥
আট বাটী নয় খুর, দত্ত মধ্যে ঠেঙ্গাপুর। যুবরাজ কাশীশ্বর, ঠেঞাপুরায় বিভাকর॥
কিশু বিশু বর্জ্জিয়া দত্ত করি গর্জ্জিয়া॥"

অপর মতে কারিকা—

দত্তবাটী ঠেঙ্গাপুরা নিরোল সিলোড়ি। বামনবাটী উত্তরপাড়া কুজুড়া টিকরি॥
আগরডাঙ্গি এরেড়া দামবাটী ঘরে। বাটীর ভিতর কেশু বিশু পাড়ান ইহার পরে॥
বাটীর ভিতর কেশু বিশু লিখি খাটো রাগে। ঢাকরি করিয়া ঘটক ঠাকুর গালি দিয়াছেন আগে॥
চতুর্থে জানিবে যত পাড়ানের অংশ। জগাতি ছাড়া কুলপাড়া অগ্নিঋষিবংশ॥
তাহার পর বলি শুন পাড়ান সাত জন। বিবরিয়া তাহার গ্রাম করিবে লিখন॥
শ্রীগাঁ শ্রীনিধিপুর পাথাই মালতী। সাতগাঁ ভালাই সেনপাড়ায় যাহার স্থিতি॥
তাহার পরে অগ্নি ঋষি করি যে গণন। সিমলিয়া কাগাস আছেন কুলের দমন॥"

শুকদেব সিংহ দত্তবংশের এইরূপ কারিকা লিখিয়াছেন—

"ঠেঙ্গাপুর নিরোল গণি সিরড়ি এরেড়া। টিকরি আগরডাঙ্গা কুজুড়া উত্তরপাড়া॥
ব্যাস রুদ্র শ্রীধর কিশু বিশু ধর বাটী। বড়টিয়া বাসে চতুর্দ্দশে দোষে গুণে পাটী॥
শ্রীগাঁ শ্রীনিধিপুর পাথাই গোকর্ণ। গোয়াল গাঁ মালতী মতি পীলখুনি বিবর্ণ॥
সানাড় হরির পাড়া লিখি যে বিরস। বল্লালী পাড়ান সাত গ্রামে পাই দশ॥
অনল ঋষি সিমলি বাসী পশ্চাৎ কাগাসে। দত্ত গ্রাম লিখি দেখ গণন ছাব্বিশে॥"

মতান্তরে—

"দত্তবাটী ঠেঞাপুরা নিরোল সিরড়ি। বামনবাটী উত্তরপাড়া কুজুড়া টিকরি ॥
আগরডাঙ্গি এরেড়া দাস ব্যাসবাটী ঘরে। বাটীর ভিতর কিসু বিশু পাড়ান ইহার পরে ॥
বড়ট্যা ছাড়িয়া বলি পাড়ানের ঠাঞি। শ্রীগাঁ শ্রীনিধিপুর গোকর্ণ পাথাই ॥
মাউ গাঁ মালতীপাড়া ঘরে। কাগাস বাসী অগ্নি ঋষি জানি ইহার পরে ॥
দত্তবাটী হইতে হইল বলি তিন গ্রাম। তার মধ্যে ঠেঞাপুরা ডাকে সরস নাম ॥
সমান ভাবে দুই গ্রাম নিরোল সিরড়ি। এই চারি খান ভাবে লিখি গণ্যা দেখ খড়ি ॥
ব্যাসবাটী আগরডাঙ্গি টিকরি কুজুড়া। এরেড়া দামোদরবাটী পরে উত্তরপাড়া ॥
ব্যাসবাটী দক্ষিণার্ক, উদয় কণ্ঠ মিত্র পক্ষ। ঘোষ কান্দি বামুপাড়া নিরাবিল কক্ষ ॥
দক্ষিণার্ক ঘোষকান্দি উদয় বামুপাড়া। শ্রীকণ্ঠ বিহীন বংশ উতপর্য্য পাড়া ॥
সে সে অগ্রগণ্য নন্দী বাণেশ্বর। পলিসা কুলের কটু নাহি অতঃপর ॥"

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার গণনানুসারে কাশ্যপ গোত্র দত্তবংশীয়দিগের বর্ত্তমান্ বাসস্থান

১। বরুটিয়া দত্তবংশ — জেলা হুগলী—বাঁশবেড়ে, শিবপুর, রাজহাট, শ্রীরামপুর, বালি ও শেওড়াফুলী। কলিকাতা।

জেলা বর্দ্ধমান—নারায়ণপুর, গঙ্গাপুর, কোমরপুর, রাজুর, বাখুরিয়া, চাণক, কাশীয়ারা, জিয়ারা ও দীননাথপুর।

জেলা মুর্শিদাবাদ—কার্ত্তিকপুর ভোলতা, মণিগ্রাম, খৈরাটী, কৃষ্ণপুর ও জোত কমল। জেলা বীরভূম—সোণার কুণ্ড, ধলাসীন, ঝিকড্ডা, জেকুলিয়া, মাড়কোলা, ছাউতরা, সিউড়ি, দুর্গাপুর, ভুতুরা, কুলকুড়ি, মৌবুনা, তপাসপুর, সীতারামপুর, হেতমপুর, ময়নাডাল, মন্দিরে, রসা, নবসন, জামালপুর, রাধানগর, রাইপুর, আদমপুর, কাঁকুটিয়া, ধল্লা, সুখবাজার, ভরতপুর, টিকরবেতা, দুর্গাপুর, মহুগ্রাম, কুড়ুমসা, বহড়া, দত্তবগতোর, রূপপুর ও গোহালিয়ারা। জেলা বাঁকুড়া—দ্বারিকা, রতনপুর, সোধনা, তেল্লাপাত্র, বাখরা, বৈতল, ডিঙ্গাল ও বাঁকুড়া। জেলা মেদিনীপুর—চন্দ্রকোণা মানপুর ও চন্দ্রকোনা গোবিন্দপুর। জেলা মালদহ—বাচামারী। জেলা দিনাজপুর—ঘাসীপাড়া। জেলা সাওতাল পরগণা—চক্ ঠিক্‌রে ও পাটিজোড়া। জেলা মুঙ্গের—তারাপুর। জেলা ভাগলপুর—ধোরী।

২। দত্তবাটীর দত্তবংশ জেলা বৰ্দ্ধমান—নলেপুর। জেলা মুর্শিদাবাদ—ভরতপুর। জেলা নদীয়া—রঘুনাথপুর। জেলা মেদিনীপুর-- যশরা ও গোপালনগর। জেলা মুঙ্গের—খোনা ও লক্ষ্মণপুর। জেলা ভাগলপুর—চৌঢ়ন, কুসমাহা, মাঝিয়ারা, ইটহরী, কাশপুর, রামীকিতা, কশরা, ডি, খয়রা, রূপসা, ভুমরামা, সিংহনান্, কলাপুর ও মস্কন বরারিপুর। জেলা পূর্ণিয়া—চাঁদপুর, বিজৌলী, ভাঙ্গাহা ও ঝলেরী। জেলা হাবড়া নপাড়া।

৩। বিভাকরদত্তবংশ, ঠেঙ্গাপুর জেলা বৰ্দ্ধমান—বিরামপুর, মৌগ্রাম, এরুয়ার, মোহনপুর, ও বুজরুক নবগ্রাম। জেলা মুর্শিদাবাদ—আলুগ্রাম ও চাণক। জেলা বীরভূম—ছাউতরা, সুখজোড়, পলসরা, গোপালপুর ও আলিগ্রাম। জেলা বাঁকুড়া—বহলালপুর। জেলা নদীয়া—ধৰ্ম্মদহ, মাইলমারী ও কেচুয়াডাঙ্গা। জেলা মেদিনীপুর—গোপালনগর, বাসুদেবপুর ও চেতো রাজনগর। জেলা মালদহ—নঘরিয়া, যদুপুর ও দোলা বিষ্ণুপুর। (দোলা বিষ্ণুপুরবাসী দত্তবংশ বিশুদত্ত বা বিষ্ণুদত্তের বংশ, সম্ভবতঃ ঠাকুর নরোত্তমের অনুজ কানুরামের ধারা) জেলা যশোর—রামনগর, গাদগাছি, পুড়োপাড়া ও ফাজিলপুর। জেলা সাঁওতাল পরগণা—বন হরিপুর। জেলা দিনাজপুর—দিনাজপুর রাজনগর। জেলা হাবড়া—রামকৃষ্ণপুর, গুমোডাঙ্গা ও নারীট।

৪। বামন দত্তবংশ-টিকুরী, জেলা যশোর—শিবনগর, খাজুরা ও ঘোষপুর। (জেলা ভাগলপুরের ইটহরি, কাশপুর, রামীকিতা, কসবা প্রভৃতি গ্রামের থাক দত্তের ধারা এই বামন দত্তের বংশ।)

৫। যুবরাজদত্তবংশ নিরোল, জেলা ভাগলপুর --জগৎপুর, কৈরী ও মাদারা। জেলা সাঁওতাল পরগণা—খটনই, কানাই ডিহি ও ধন বৈ।

৬। কাশপুরদত্তবংশ সিরলী, জেলা ভাগলপুর—বৌশী ও তপাডিহি। জেলা সাঁওতাল পরগণা—পরাশী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শাণ্ডিল্যগোত্র ঘোষবংশ।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বিবরণের প্রথম খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে সাড়ে সাতঘর কায়স্থ লইয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সাড়ে সাতঘরের মধ্যে পাঁচজন শ্রীকর্ণ কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে শাণ্ডিল্যগোত্র ঘোষ ১, কাশ্যপগোত্র দাস ১, ভরদ্বাজগোত্র সিংহ ।০, এবং মৌদ্গল্যগোত্র কর ।০ এই চারি ঘর কায়স্থকে ঘর সংখ্যায় ২॥০ ঘর ধরিয়া লইয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। ইহারা পূর্ব্ব হইতেই গৌড় দেশে বাস করিতেছিলেন, সুতরাং ইহাদিগকে গৌড় কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কুলগ্রন্থে দেখা যায় শাণ্ডিল্য ঘোষ বংশের মূলপুরুষ অবন্তিকা হইতে, কাশ্যপ দাস বংশের মূলপুরুষ কাঞ্চীপুর হইতে, ভরদ্বাজ সিংহবংশের মূলপুরুষ দ্বারকাপুরী হইতে এবং মৌদ্গল্য করবংশের মূলপুরুষ হস্তিনাপুর হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা গৌড়ে প্রথম আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের উল্লেখ নাই। পরে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে যাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে—

"শাণ্ডিল্য গোত্রঃ প্রবুদ্ধঘোষ নাম।
পরে আগতঃ কাশ্যপো দাসরামঃ॥"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে শাণ্ডিল্যগোত্র প্রবুদ্ধ ঘোষ এবং কাশ্যপগোত্র রামদাস প্রথমে উত্তররাঢ়ীয় সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। মৌদ্গল্য করবংশের বংশলতায় প্রথম পুরুষের নাম কোথাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরকর এবং কোথাও বা কেবলরাম কর দেখা যায়। সম্ভবতঃ এক ব্যক্তিরই দুই নাম ছিল। ভরদ্বাজ সিংহবংশের প্রথম পুরুষের নাম কোথাও কোথাও ভরদ্বাজ সিংহ বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কুলাচার্য্যগণের কাগজ যাহা আমাদিগের দৃষ্টিগত হইয়াছে তাহা হইতে এ সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয় মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। ভাবনির্ণয় সম্বন্ধে কোথাও কোথাও দেখা যায় এই চারি ঘরের ভাব নাই। কিন্তু প্রথম যখন ইহাদিগকে সমাজ মধ্যে গ্রহণ করা হয় তখন ভাব না থাকিলেও পরে ইহাদিগের এক একটা ভাবনির্ণয় করা হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন কাগজে দেখা যায় শাণ্ডিল্যের ।৵০, কাশ্যপের ।৵০, ভরদ্বাজের ।০ এবং করের ।০ ভাবের উল্লেখ রহিয়াছে। উক্তরূপ ভাবের উল্লেখ থাকিলেও উক্ত চারি ঘরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ ছিল কুলপঞ্জিকায় যথা—

"শাণ্ডিল্যে স্বল্পহানিঃ স্যাৎ কাশ্যপে হানিরেব চ।
মহাহানির্ভরদ্বাজে করস্পর্শাৎ কুলক্ষয়ঃ॥"

অন্যত্র— "শাণ্ডিল্যে সুতনাশায় ধননাশায় কাশ্যপে।
ভরদ্বাজে সর্ব্বনাশঃ করে শীলনিপাতিতঃ ॥"

এইরূপ অভিসম্পাত সত্ত্বেও সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গ্লানি-ভোগ করিয়াও এই আড়াই ঘর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে স্থান পাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন। বর্ত্তমানকাল হইলে তাঁহারা সমাজের নির্য্যাতন স্বীকার করিতেন না। সম্ভবতঃ আচারাদির অনৈক্য হেতু কুলীন সমাজ তাঁহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতেন। সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি আচারের উপর নির্ভর করিতেছে। বক্ষ্যমাণ আড়াইঘর কায়স্থ কুলীন কায়স্থসমাজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সদাচার গ্রহণ করিতে পারিবেন এই লালসায় সকল প্রকার গ্লানি এবং নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে থাকা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। অর্থবলে বা তোষামোদে কুলীন কায়স্থকে নিজালয়ে আনিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

প্রবুদ্ধ বা প্রবোধ ঘোষ দক্ষিণখণ্ডে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তিনি মুরুন্দী গ্রামে বাস করিতেন। কিন্তু গ্রামনির্ণয়ের কারিকা পাঠে অনুমান হয় তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ শ্রীকণ্ঠ মল্লিক অথবা তৎপুত্র মল্লিক কণ্ঠহার মুরুন্দী গ্রামে বাস করিয়া-ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে ঘনশ্যাম মিত্রের কারিকায় লিখিত আছে—

"দক্ষিণে শাণ্ডিল্য খণ্ড মল্লিকে মুরুন্দী। জলস্থতি জাঙলিয়া কুজুড়া তলে লোহারুন্দী॥
শিরপাড়া পাড়াখণ্ড আলুগাঁ পৌরসে। শচী ঘর মহী সপ্ত সাবলদা বিশেষে॥
পাঁচ-ভাইয়া চৌ-ভাইয়া জোড়াখণ্ড আগা পিছে। কেদার চৌ-ভায়ার তুঙ্গ জাঙলিয়াতে আছে॥
চোঙদার চৌভাইয়ায় শেষ নিরাবিল বাছে। শচীঘর মহীসপ্ত সাবলদা বিশেষে॥"

অর্থাৎ দক্ষিণখণ্ড এবং দক্ষিণ খণ্ডের এক পাড়ার নাম শিরপাড়া, মুরুন্দী, কুজুড়ার মধ্যে লোহারুন্দী, জলস্থতি, জাঙলিয়া, আলুগ্রাম এই সাতখানি শাণ্ডিল্যের গ্রাম এবং সাবলদাও এক খানি গ্রাম ধরা যাইতে পারে।

শাণ্ডিল্য বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও বংশ প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রবুদ্ধ ঘোষ হইতে অধস্তন ১৯ পুরুষ মনোমোহন ঘোষ কর্ম্ম উপলক্ষে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী জাহানাবাদে বাস করিয়াছিলেন, পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় ভরতপুর থানার নিকট ভোলতা গ্রামে বাস করেন। এই বংশে ২৩ পর্য্যায়ে বল্লভীকান্ত ঘোষ ও রামানন্দ ঘোষ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। বল্লভীকান্ত ঘোষ কর্ম্ম উপলক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাটনায় গমন করেন ও তথায় ভিখনা পাহাড়ী মহল্লায় বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ এ পর্য্যন্ত তথায় বাস করিতেছেন। বল্লভীকান্ত ঘোষের দুই পুত্র হরগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দ বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত পাটনায় বাস করিয়াছিলেন। বল্লভীকান্ত ঘোষ পাটনা জেলায় কিছু জমিদারী সম্পত্তি করিয়াছিলেন। বল্লভীকান্ত ঘোষের একটী পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ পাটনার অহিফেন-কুঠীর দেওয়ানী কার্য্য

করিতেন এবং পাটনার রাজপুরুষগণ, জমিদারগণ এবং নবাব-পরিবারবর্গ কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত পাটনার বিখ্যাত উকীল রায় পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ বাহাদুর কাইসার-ই-হিন্দ মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহ উপলক্ষেই পূর্ণেন্দু পাটনায় শিক্ষার্থ গমন করেন ও উত্তর কালে তথায় বাস করেন।

বল্লভীকান্তের ভ্রাতা রামানন্দ ঘোষ কর্ম্ম উপলক্ষে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত আমলা-সদরপুর গ্রামে বাস করেন। তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকা আয়ের জমিদারী সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সুচতুর বিষয়ী লোক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। দুইটী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা ব্রজসুন্দরী ও কনিষ্ঠা প্যারীসুন্দরী। ব্রজসুন্দরীর বিবাহ ছাতিনা-কান্দী গোবিন্দ দশরথ সিংহ বংশে চন্দ্রনারায়ণ সিংহ সহ এবং প্যারীসুন্দরীর বিবাহ কান্দী জীবধর শ্রীকৃষ্ণবংশে কৃষ্ণনাথ সিংহ সহ হইয়াছিল। প্যারী-সুন্দরী অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় রামানন্দ তাঁহাকে একদিকে হিন্দু বিধবার উপযোগী শাস্ত্রাদি চর্চ্চা ও অপরদিকে বিষয়কর্ম্ম বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামানন্দ ঘোষ প্যারী-সুন্দরীকে নিজের বৈঠক-খানার পার্শ্বের কুঠুরীতে রাখিয়া আমলাদিগকে ডাকিয়া জমিদারীর ও নীলকুঠীর যাবতীয় কর্ম্ম করিতেন। প্যারীসুন্দরীকে মধ্যে মধ্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার বিষয়জ্ঞান দেখিয়া রামানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। প্যারীসুন্দরী বাল বিধবা হইলেও দত্তকগ্রহণ জন্য স্বামীর অনুমতি পাইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরীর একটী মাত্র কন্যা শ্যামাসুন্দরীর বিবাহ বংশীবদন ঘোষবংশে মনোমোহন ঘোষ সহ হইয়াছিল। রামানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি দুই কন্যায় পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্যারীসুন্দরীই সমস্ত বিষয়কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতেন। প্রজাপালন ও দুষ্টদমনকার্য্যে প্যারীসুন্দরীর নাম এখনও নদীয়া ও যশোর জেলার অধিবাসীদিগের আদর্শ রহিয়াছে। কথিত আছে, কুষ্টিয়ার বিখ্যাত নীলকর কেনি সাহেব অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার বহু লাঠিয়াল ছিল। তাহাদের সাহায্যে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগের এলাকায় নীল বপন করাইতেন এবং নানাপ্রকারে প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিতেন। বহু প্রজা প্যারীসুন্দরীর নিকট নিজেদের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। প্যারীসুন্দরী প্রথম প্রথম সাহেবের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইলেন। কিন্তু একে বাঙ্গালী তায় স্ত্রীলোক! কেনি সাহেব তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অপমানকর গালি দিলেন প্যারীসুন্দরী বলিলেন, আমি যদি রামানন্দঘোষের কন্যা হই, তবে কেনি সাহেবকে ধরিয়া আনিয়া তাহার মাথায় নীল বুনিব। এই কথা সাহেবের কাণে পৌছিলে সাহেব দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। প্যারীসুন্দরী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, চোর ডাকাতের মত অকস্মাৎ অত্যাচার করা ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। একটী নির্দ্দিষ্ট দিন দিয়া তিনি সাহেবকে জানাইলেন। অমুক দিন সূর্য্যোদয়ের পর তোমার কুঠী আক্রমণ করিব, তুমি আত্মরক্ষা করিও। বলা বাহুল্য কেনি সাহেবের প্রার্থনা মত জেলার মেজিষ্ট্রেট

একশত সশস্ত্র পুলীশ ও কেনির দুইশত লাঠিয়াল সহ সমস্ত রাত্রি কুঠীতে মেম সাহেবকে রক্ষা করিলেন। কেনি প্রাণভয়ে স্থানান্তরে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। এদিকে প্যারীসুন্দরী নিজের লোক জনকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিলেন, কেনি সাহেব বিলাত হইতে লোকজন আনেন নাই। দেশের লোক যদি তাহার টাকায় বশীভূত হইয়া দেশের লোকের অনিষ্ট করে তবে আমি কি করিব? তোমরা সাহেবের টাকার বশীভূত হইও না। সাহেবকে আঘাত না করিয়া ধরিয়া আনিবে, মেম সাহেবের উপর যেন অত্যাচার না হয়। বলা বাহুল্য প্যারীসুন্দরীর সুশিক্ষিত ও বাছাই একশত লাঠিয়াল যথাকালে কেনি সাহেবের কুঠী আক্রমণ করিল ও কুঠীর প্রাঙ্গণে গিয়া কেনি সাহেবকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিল। কিন্তু কেনি সাহেবের পরিবর্ত্তে তথায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে সেলাম করিয়া পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। সাহেব ও জনৈক মুসলমান দারোগা ঘোড়ায় চড়িয়া "পাকড়ো, পাকড়ো" বলিয়া তাহাদের পশ্চাতে ছুটিলেন। পুলিস দলও সেই সঙ্গে ছুটিল। প্যারীসুন্দরীর লোকগণ তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ ধাবন করিতে নিষেধ করিলেন। সাহেব ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু দারোগা শুনিলেন না। প্যারীসুন্দরীর লোকগণ দারোগাকে বল্লমে বিদ্ধ করিয়া লইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়া কোথায় চলিয়া গেল কেহ দেখিতে পাইলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট মূর্চ্ছিত হইলেন ও পুলীস অবাক্ হইয়া রহিলেন। এতদুপলক্ষে কঠিন ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্যারীসুন্দরীর বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পরেও কেনি সাহেব প্যারীসুন্দরীকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার কৌশলে নিজেই ধরা পড়িয়াছিলেন। বন্দী হইয়া সদরপুরের বাড়ীতে নীত হইয়া সাহেব অনশনব্রত আরম্ভ করিলেন। পরে প্যারীসুন্দরী সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার হাতে খাইতে চাহিলেন। প্যারীসুন্দরী সাহেবকে সন্তানস্নেহে ভোজন করাইলেন। তৎপরে সাহেব বলিলেন, 'মা, আপনি বলিয়াছিলেন আমার মাথায় নীল বুনিবেন, একটা গামলা আনিয়া আমার মাথায় রাখিয়া নীল বুনিয়া দিউন।' প্যারীসুন্দরী বলিলেন আর নীল বুনিবার প্রয়োজন নাই। সাহেব কিন্তু শুনিলেন না অগত্যা তাঁহার মাথায় নীল বুনা হইল। তৎপরে মুক্তিলাভ করিয়া সাহেব নিজ কুঠীতে ফিরিয়া গিয়া নীলের চাষ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্যারীসুন্দরীর মত আর ২।৪টী স্ত্রীলোক জমিদার থাকিলে এদেশে ইংরাজকে ব্যবসায় করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইত। শুনা যায় প্যারীসুন্দরীর আদর্শে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু তাঁহার দেবীচৌধুরাণী লিখিয়াছিলেন। প্যারীসুন্দরী বালিয়া রঘুনাথ সিংহবংশ হইতে একটী সন্তান আনাইয়া দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত পুত্রের নাম হইয়াছিল তারিণীচরণ সিংহ। ব্রজসুন্দরীর ও প্যারীসুন্দরীর মৃত্যু হইলে বল্লভীকান্ত ঘোষের পৌত্রগণ আমলা সদরপুর এষ্টেটের অধিকার পাইবার জন্য মুর্শিদাবাদে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। তারিণীচরণ বহু কষ্টে উক্ত মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন।(১)

(১) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বিবরণের প্রথমখণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় তারিণীচরণের বংশবিবরণ রহিয়াছে।

ব্রজসুন্দরীর কন্যা শ্যামাসুন্দরী। শ্যামাসুন্দরীর কন্যা গোপীসুন্দরী। জামুয়া মাধে শ্রীমুখ সিংহ-বংশে গোপীকৃষ্ণ সিংহের সহিত গোপীসুন্দরীর বিবাহ হয়। সম্প্রতি গোপীসুন্দরীর পৌত্রগণ রামানন্দ ঘোষের সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।(২)

দক্ষিণখণ্ডের ঘোষবংশের একটী ধারা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার তাঁতি বিরল গ্রামে বাস করেন। নবাবী আমলে তাঁহারা উচ্চপদে কার্য্য করিয়া এক ধারা চৌধুরী ও অপর ধারা মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেক সম্পত্তি ও কীর্ত্তি ছিল। সম্প্রতি অবস্থাহীন। এই বংশের গোপীনাথ ঘোষ মজুমদার ইংরাজ আমলে প্রথম মুনসেফ হইয়া ভাগলপুরে গিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার পশ্চিম পারে গঙ্গাতীরে বুধাইপাড়া গ্রামে একটী শাণ্ডিল্যবংশ বাস করেন। এই বংশের চন্দ্রনাথ ঘোষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র মধ্যে অঘোরনাথ ও পশুপতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রমাপতি মুনসেফের পদে কার্য্য করিতেছেন। আলুগ্রামে একটী শাণ্ডিল্যবংশের ধারা রহিয়াছে। তাঁহাদিগের দেবসেবা ও পুষ্করিণী ইত্যাদি কীর্ত্তি রহিয়াছে। শিরপাড়া গ্রামে চন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার ও তাঁহার ভ্রাতা যোগেন্দ্র মজুমদার বিখ্যাত লোক ছিলেন। যোগেন্দ্র নেপালরাজের অধীনে বহু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন।

---

(২) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠার বংশলতা দ্রষ্টব্য

শাণ্ডিল্য ঘোষবংশ
১ প্রবুদ্ধ ঘোষ
আখণ্ডল
২ গুণাকর
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ
৩ ত্রিভুবন
বামদেব গোপাল
৪জয়পতি যাদব গোপীকৃষ্ণ দিবাকর জ্ঞানচন্দ্র শ্রীনাথ রবিকর মেদিনীকর
৫ তেজঘোষ হেমচন্দ্র ৫সোমনাথ
মহাদেব ৬ মহেশ (নামান্তর পুরুষোত্তম)
৭ শতানন্দ (নামান্তর ষড়ানন)
মদনমোহন ৮ মুরারি গোপীনাথ
৯ কাবিরত্ন (বিনাম কবীশচন্দ্র) গদাধর তারাপতি রাজপতি ৯দামোদর কৃষ্ণরাম রাধানাথ
১০ শ্রীকণ্ঠ মল্লিক (মরুন্দী)
রামচন্দ্র ১১ মল্লিক কণ্ঠহার সদাশিব মল্লিক (নামান্তর বৈদ্যনাথ)
১২ শুভানন্দ
১৩ যাদবানন্দ
১৪ রত্নাকর
১৫ কৃষ্ণানন্দ (নামান্তর কেশব)
১৫ মধুসূদন (বাস আলুগ্রাম)
১৬ স্থিরঘোষ ১৬ দক্ষিণাকর ঘোষ
(বাস দক্ষিণখণ্ড)
১৬ বিষ্ণুদাস ১৬ মুকুন্দ
১৭ শম্ভুনাথ
১৭ রামনারায়ণ কল্যাণ ১৭ ধনিরাম
১৮ দেবিদাস (বাস আলুগ্রাম)
১৮ ব্রজবল্লভ রামগোবিন্দ
কৃষ্ণরাম ১৮ অযোধ্যারাম
(বংশ বাস যশোর
দেবিদাসপুর)
রাঘব ১৯ বলরাম
২০ পার্ব্বতী তেজোময়

১৬ দক্ষিণাকর ঘোষ সুত ১৭ নন্দলাল (১৫৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)

১৭ বিকর্ত্তন বিবরণ বীরনারায়ণ ধরাধর ধরণীধর

১৮ জনার্দ্দন ১৮ মুকুন্দ (বংশ বাস ভূষণা কামারগাঁ)

১৯ রতিকান্ত (বংশ বাস বড়গ্রা) মনোমোহন (বাস জাহানাবাদ,
(বিনাম মনোহর) পরে ভোলতা)

২০ গোপীকান্ত হৃদয়রাম ২০ কালিন্দী কেশবরাম কৃষ্ণকিঙ্কর

২১ ভগবতী মথুরানাথ

২২ ভরদ্বাজ রাধাবল্লভ ২১ পঞ্চানন শ্যামসুন্দর

২৬ ব্রজমোহন গোপাল

২২ সাহেবরাম বাসুদেব ২২ রাধাকৃষ্ণ জগমোহন

২৪ গুরু রামপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ ২৪ যদুনন্দন

২৩ সৃষ্টিধর রামানন্দ

২৫ কৃষ্ণহরি জয়হরি ২৫ গোবিন্দ নিমাই

২৪ গঙ্গাগোবিন্দ দ্বারিকানাথ কন্যা ২

২৬ শিবপ্রসাদ রামগোপাল নিতাই

বৃন্দাবন নীলকণ্ঠ বৈকুণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ রাজনারায়ণ গঙ্গানারায়ণ

২১ পঞ্চানন
২২ রাধাকৃষ্ণ
২৩ বল্লভীকান্ত (বাস ভিথনাপাহাড়ী পাটনা) লক্ষ্মীকান্ত ২৩গৌরচন্দ্র মথুরানাথ
২৪ বিজয়গোবিন্দ ভবানী কানাই হরিনারায়ণ বৈকুণ্ঠ
২৪ হরগোবিন্দ
২৪ জয়গোবিন্দ
২৫ গঙ্গাধর
২৫ বংশীধর
২৫ দুর্গাদাস
২৬ ললিত
২৬ যদুনাথ
২৬ উপেন্দ্র সুরেন্দ্র নরেন্দ্র
২৭ পুত্র
২৭মদনগোপাল
(দত্তক)
পুত্র
ধীরেন্দ্র বিল্বমঙ্গল
২৭ যতীন্দ্র ফুচু সৌরেন্দ্র
২৫ রায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর
২৫ গিরিশচন্দ্র হরিশচন্দ্র ২৫ ঈশ্বরচন্দ্র
কন্যা ও
প্রথম জামাতা
রায় বাহাদুর
পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ
যতীন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র
২৬ রমণী রজনী
২৭ জিতেন্দ্র মদনগোপাল
(দত্তকগত)
২৭ অনিল সুধীর
অসিত

৯ দামোদর (১৫৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
১০ রামচন্দ্র
১১ গোবর্দ্ধন
১২ শম্ভুনাথ
১৩ সুদর্শন
১৪ পুরন্দর
১৫ বাসুদেব
১৬ প্রভুরাম ১৬প্রীতরাম
১৭ মহেশ
১৮ সদানন্দ
১৯ মুরলীমোহন
২০ তারাপতি
২১ চন্দ্রবর
২২ দুর্গাচরণ
২৩শ্রীনিবাস
২৪ হৃদয়ানন্দ
২৫ শুকদেব
২৬ গোকুলকৃষ্ণ (বাস বুন্ধাইপাড়া)
২৭ বৈদ্যনাথ
ভৈরব ভোলানাথ ২৮গোপালনাথ শ্যামলাল
২৯ শিবনাথ সুত ৩০ চন্দ্রনাথ
৩১ অঘোরনাথ
পশুপতি
সুরপতি কৈলাসপতি রমাপতি
সুধীর
৩২ ভীমাচরণ
বিমলাচরণ নির্ম্মলা
দুঃখহরণ (বাস ভাগলপুর)
মটুকচাঁদ
হরিহর
দুলারচাঁদ মহিমচাঁদ (বাস কেলীপুর)
বুঢ়ানচাঁদ
বদনচাঁদ বিহারীলাল নারায়ণচন্দ্র
কৈলাস
কানাই
রাধাগোবিন্দ
গিরিশ
ভগবান্
ঈশ্বরচন্দ্র
ভোলানাথ দিলমোহন শালগ্রাম
যোগেন্দ্র মহেন্দ্র যোগেশ
নন্দগোপাল পঞ্চানন
অধীর ভিখারীলাল পুত্র
সুধীর অতুল
মোহনলাল প্রহ্লাদ গৌরগোপাল
অনাথ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কাশ্যপগোত্র দাসবংশ

যে চারিজন গৌড় কায়স্থ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে রামদাস অন্যতম ছিলেন। তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন এবং একটী স্বর্ণনির্ম্মিত গজ দান করায় সাধারণতঃ তিনি গজদানী রামদাস নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। গজদান বহুলোকেই করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হস্তী দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহও গজদানী বলে না। রামদাসের বিশেষত্ব এই যে তিনি একটী সজীব হস্তীর ন্যায় উচ্চ কলেবরবিশিষ্ট স্বর্ণনির্ম্মিত গজ দান করিয়া ছিলেন বলিয়া গজদানী বলিলে উত্তররাঢ়ীয় সমাজে এখনও রামদাসকেই বুঝায়। চৌরীগাছা রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গঙ্গা সমীপ একটী স্থান এখনও 'দানীর তলা' নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। কেহ কেহ উক্ত স্থানে গজদানী রামদাসের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া থাকেন।

উক্ত দানীর তলা হইতে প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিম-দক্ষিণে মাসলা গ্রামে রামদাসের বাস স্থান। উক্ত গ্রাম হইতে অনতিদূরে আমলাই গ্রাম ভরদ্বাজ সিংহের এবং তাহার পশ্চিমে আলুগ্রাম মৌদগল্য গোত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা কেবলরাম করের বাস স্থান ছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন রামদাসের আদিবাস কুনিয়া গ্রামে ছিল। কিন্তু মাসলা গ্রাম হইতে অনতিদূরে 'দানীর তলা' স্থান এখনও তাঁহার পরিচয় দিতেছে। সুতরাং অনুমান হয় মাসলার কাশ্যপ গোত্রীয় রামদাস, আমলাই গ্রামের ভরদ্বাজ সিংহ এবং আলুগ্রামের কেবলরাম কর পরস্পর নিকটবর্ত্তী গ্রামেই বাস করিতেন এবং দক্ষিণখণ্ডবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় প্রবুদ্ধ ঘোষের সহিত পরামর্শ করিয়া এক যোগে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ের উত্তরসীমা "পাগলান্ত উত্তর প্রদেশ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। হিলোড়া গ্রামের উত্তরে এই পাগলা নদী প্রবাহিত হইতেছে, হিলোড়া ও বাজিগ্রাম বারেন্দ্র কায়স্থপ্রধান স্থান ছিল। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের দক্ষিণ সীমা দুবা গ্রাম "দক্ষিণ কপাট" বলিয়া ঘটককারিকায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হিলোড়ার দক্ষিণ ও দুবার উত্তর রাঢ় দেশের এই অংশে শ্রীকর্ণ সম্প্রদায়ভুক্ত কায়স্থগণের বাস ছিল। বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বা বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থ এই স্থান মধ্যে বাস করিতেন না। এই নিমিত্ত উক্ত চারিজন গৌড় কায়স্থ শ্রীকর্ণ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াই সুবিধা বোধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি সদাচারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা নবাগত কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মাসলা প্রভৃতি গ্রামগুলি নদীবেষ্টিত এবং হিজোল নামে খ্যাত একটী বিলের দক্ষিণে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই প্লাবন জন্য রামদাস মাসলা হইতে

উঠিয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি কুণিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই গ্রাম মাসলা হইতে প্রায় ৬। ৭ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম ও থানা খড়গ্রামের এলাকায়, সিদ্ধেশ্বরী গয়েসপুরের নিকট, এড়োয়ালি গ্রামের দক্ষিণ। এখনও তথায় রামদাসের পুষ্করিণী ও বাসভূমির চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঘনশ্যাম মিত্র কাশ্যপ দাস সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রথমে বলিব শুন কাশ্যপের গাঁই। কুণিয়া হইতে রামদাসের সূত্র যে যে ঠাঁই॥
গজদানী রামদাস খ্যাত কুণিয়া বাস। তাহার সূত্র করেন ছয় গ্রামে নিবাস॥
বাতড়ি বড়ার লিখি আর ঝিকরহাটী। পীলসমা মাসলা কুণিয়া কটু ছয় বাটী॥
ইহার পর ভাব ছাড়া আছে যত জন। কটুর কটু মহাকটু করি যে গণন॥
প্রথমে বলিব অম্ল পরশিলে দাস। তার পর দধি গাঁই বিশ্বাসে প্রকাশ॥
আটঘরিয়া কোঙরডা মহী দাসপাড়া। গোকর্ণ গোময়হাটী বট সব কি ছাড়া॥
সিয়াঘরিয়া কুসুমা হাতো উচিপুর। কটুর কটু মহাকটু কুল করে চুর॥"

অন্য মতে—

"আটঘরিয়া কোঙরডা মহী দাসপাড়া। গোময়হাটী সনকপুর আর হাতোড়া॥
অম্লগ্রাম বা ভাঙা লিখি আর সিয়াঘর। কুসুমা উচিপুর আদি সকল সোণার॥
দধিটি সমেত দেখ বিশ্বাস মহাশয়। এই সকল গ্রাম কাশ্যপ আলয়॥"

অভিরাম গ্রামগত কক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বাতড়ি বড়ার ঝিকরহাটী পীলসমা মাসলা। কুণিয়া লইয়া এই ছয়খান কাশ্যপে আসলা॥
পাঁচখান লিখিয়ে তায় করণ কারণ সার। কুণিয়া শুনিয়া ভাল মতে করিয়ে বিচার॥
রামদাস কুঞ্জরদানী তবে গোটা ঘর। ভাব সরসি মহী সপ্ত পঞ্চ খাসা দধি পর॥
অম্লাদি অপর কটু যুথে মাজা নয়। নিজে কুণিয়া খাসা খোলে পরে ভাসা বয়॥
কুণিয়া সঙ্গ গিধিনা দধি গোকর্ণ গোময়। দাসপাড়া আটঘরিয়া কুসুমাতে রয়॥
কোঁয়রডা মণির বট বট সনকালয়। উচদেয়ারি ওঁছা কোগাঁ কুণিয়া কয়॥
বড়ারে নাহিক ভাব বাতড়ি বড়গাঞি। পীলসমাতে চণ্ডীদাস কুলে দিল ঠাঞি॥
মাসলা মলিন কিছু হাল হাসিলে লিখি। ঝিকরহাটী সমভাব পুরুষ নাহি দেখি॥
পরে শ্রবণ কটু যত ঘর কাশ্যপ বোলান। যাহাকে কুণে না গণেন সেও কুণে হইতে চান॥
কুণিয়া বড় আসল দড় না করে পরশ। করে ধরিয়া লিখে লও গাঞি একাদশ॥
বড়ার গোকর্ণ সিজা কুসুমা হলদি। গোময়হাটি অম্ল গ্রাম হাতোড়া অবধি॥
কোগাঁ দেওয়ারপুর উচিপুর আলয়। শ্রীকরণে জিজ্ঞাসিলে কুণিয়া কুণিয়া কয়॥
কাশ্যপ শ্রবণ কটু পাঁচকুল বৈসে। মহাকটু নিম্বপত্র গাঞি একাদশে॥
আসল কুণিয়া কর্ণ শুনিয়া না কর পরশ। করে ধরিয়া লিখে লও গাঞি একাদশ॥
কুণিয়া বড় কষ্ট গাঞি নাম মাত্র মূলে। তাথে কত কেবা মিশাইল কুলজাগ্র কুলে॥

কাশ্যপ কুলের কটু তাথে কটু কত। লেখা করিয়া বুঝি লও গাঞি আছে যত ॥
কহিব দাসের সন্ধি কর অবধান। তাহাতে অগ্রাহ্য কেবা কার আছে মান ॥
কাশ্যপ অক্ষটি বলি আগে দিল গালি। তাথে কেবা মাথা মাখি কার পড়িল আলি ॥
কুণিয়া বলে সবে কুলে কুণিয়ায় নাহি দায়। কুণিয়ায় বড় কুল জাগ্রত পাইলে ধরিয়া খায় ॥
কুৎসিৎ কাশ্যপ যত সিজা কুণিয়া বলে। তারা বিচারিতে নানা গাঞি কুল ঘন তোলে ॥
কেহ অন্ন, কেহ দধি, কেহ গোময়হাটী। আমলকী সিজাঘরিয়া বসু কুলের জাটি ॥
দাসপাড়া কোঁয়রডা কুসুমা গোকর্ণ। কটুর কটু রামের বটু শুনিয়া ফাটে কর্ণ॥

অথ গ্রামগত ব্যক্ত করণ।

চণ্ডী গৌরী করণ কারণ দেখি মহামনে। তবে কেন বলে কটু কাশ্যপ করণে ॥
প্রথমে বিশ্বাসখাসের হাজরায় করণ। এখন হেদে দেখ ভূষণায় কুলের গমন ॥
দেশে সবে বলেন বাসু সভাপতি বড়। বিদেশে উদয়সুত কুল করণ দড় ॥
জজানে উচিত কুল আগে নাহি দেখি। গোবিন্দ রাজার সুত ডাকে বড় লিখি ॥
রাঘবে বসন্ত রায় আগে গিয়াছিলা। পক্ষ শেষে রাজবল্লভ আশ্রয় লইলা ॥
মঘমনে পমাই গেলা গোদে বাঁশী সুত। বঙ্গ হইতে আইলা মণি বড়ই কৌতুক ॥
আগে জগন্নাথে ভাঙ্গিয়া ছিলা পাটুলির যুথ। পরে ধীরে ধীরে চলিয়া আইলা কালিদাসসুত॥
দিগম্বরে সানন্দকুলে জীবন আইলা দেখি। শম্ভু কুলে দন্ত বড় চরম ডাক লিখি ॥”

জালালপুরের রায়বংশ

গজদানী রামদাসের বংশে অনন্তদাসের ধারায় হিমকর দাসের পুত্র শ্রীরামদাস বিশ্বাস খাস একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান কান্দী মহকুমার অন্তর্গত কুণিয়া গ্রামের নিকট গয়েসপুর গ্রাম। উক্ত গ্রামের কিয়দংশ গিধিনা নামে খ্যাত ছিল। দিল্লীশ্বর হইবার পর সেরশাহ যখন ভারতের নানাস্থানে ‘শড়ক’ বা প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করেন, তৎকালে শ্রীরামদাস বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গৌড়ের বাদশাহগণের সময়ে উড়িষ্যা যাইবার যে শড়ক ছিল তাহা জঙ্গীপুর হইতে বেলুন ও মাড়গ্রাম হইয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ছিল। শ্রীরামদাস উক্ত পথ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় বাসস্থান গয়েসপুর গ্রামের নিকট দিয়া লইয়া গেলেন। উক্ত বাদশাহী ‘শরাণের’ পার্শ্বে একটী সুদীর্ঘ বাদশাহী দীর্ঘিকা রহিয়াছে। শ্রীরাম নিজ নামে “খাসবিশ্বাসদীঘী” নামে আর একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। খাসবিশ্বাস উপাধির বিশেষ কিছু অর্থ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাঁহার বংশধর রাজা সীতারাম রায় প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের রায় উপাধি দেখা যায়। গয়েসপুরে রায়ের দীঘী নামে একটী গভীর-

জল পুষ্করিণী রহিয়াছে। তথায় কেহ সাঁতরাইয়া পুষ্করিণী পার হইতে সাহস করেন না, এবং নানা প্রকার সংস্কার থাকায় কেহ তথায় মৎস্য শিকার করিতে যায় না।

বিশ্বাসখাস মৌলিক ছিলেন। তজ্জন্য কুলীন সমাজে তাঁহার বংশধরগণ উপেক্ষিত হইতেন। চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় সিংহ বংশীয় কুলীন, তাঁহার সময়েই বিশ্বাসখাসবংশে রাজা সীতারামের অভ্যুদয়। সীতারামের সমৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাজা মনোহর তাঁহার আশ্রিত যশোরের নিকটবর্ত্তী পুঁড়োপাড়ার ঘটকগণ দ্বারা লিখাইয়া রাখিলেন,

"হাল চষে তাল খায় গিধিনাতে বাস।
তার বেটা কায়েত হল বিশ্বাসখাস॥"

গয়েসপুরে শ্রীরামের বাসভূমির চিহ্ন এখনও পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত বাটীর সদর দেউড়ির সম্মুখ দিয়া কেহ কোনও যানারোহণে গমন করেন না। এইরূপে এখনও শ্রীরামের সম্মান রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীরামদাসের তিনটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায়, মধ্যম চণ্ডীচরণ রায় এবং কনিষ্ঠ বাসুদেব রায়। জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ পাঁচ-থুপী গ্রামে ভারতীবর হাজরা সহ। তাঁহার বংশধরগণ বাঁটীর বাড়ীর হাজরা নামে খ্যাত। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ নারদসিংহবংশে বাণীমোহন সিংহ সহ। ইহার বংশ দেখা যায় না। হরিশ্চন্দ্র রায়ের পুত্র উদয়নারায়ণ যশোর জেলায় ভূষণা পরগণা মধ্যে বাস করেন। তাঁহার পুত্র ইতিহাসবিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়। পৃথক্ অধ্যায়ে সীতারামের বিবরণ লিখিত হইল। মধ্যম চণ্ডীচরণের বংশধরগণ গয়েসপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পূর্ব্বে বড়ার গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারাও কালে বাস ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। বাসু-দেবের বংশ মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফুলরামের ধারায় একজন গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বর্ণীগ্রামে গিয়া বাস করেন। সম্প্রতি প্রায় শতাধিক বর্ষ অতীত হইল এই বংশ গঙ্গার পূর্ব্ব পারে জালালপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশে হরিনারায়ণ রায় অপুত্রক ছিলেন, তিনি সূর্য্যনারায়ণ রায়কে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যনারায়ণের তিনটী পুত্র—আশুতোষ, হরিমোহন এবং বিভূতিভূষণ। কাশ্যপ দাস বংশ মধ্যে এই ধারা পুরুষানুক্রমে সমাজের বিশিষ্ট ঘরে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন বলিয়া বিশেষ সম্মানিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহাদের বহু সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ায় এক্ষণে অবস্থা হীন হইয়াছে। জালালপুরের বাটীতে দেবসেবা, দুর্গোৎসব, কালীপূজা প্রভৃতি কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

গয়েসপুরের বাটীতে ইঁহাদের এখনও ৺মণিকর্ণিকা দেবীর সেবা রহিয়াছে। নিত্য অন্ন ভোগের সহিত মৎস্য দিতে হয়। দেবীর গঠিত মূর্ত্তি নাই, একখণ্ড অগঠিত শিলায় পূজা হইয়া থাকে। এই দেবীপূজা সংস্থাপন সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। গয়েসপুর গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঝিকরহাটী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিতেন। একদিন ঐ বাটীর কন্যা ও বধূগণ ঘাটে বাসন মাজিতেছিল, এমন সময় একটী

বালিকা একখানি থালা হস্তে লইয়া বলিল, আমি এইথালায় বসিয়া পুকুর পার হইতে পারি। বলিতে বলিতে বালিকাটী থালায় বসিয়া মধ্য পুষ্করিণীতে গেল এবং বালিকাসহ থালাটী ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীতে তরঙ্গ উঠিল এবং উক্ত তরঙ্গ পুষ্করিণীর এক কোণ ভেদ করিয়া সর্পগতি একটী ক্ষুদ্র প্রবাহিণী আকারে প্রবাহিত হইয়া পাটনের বিলে মিলিত হইল। কিছুকাল পরে গয়েসপুরের রায়বংশের কোনও ভাগ্যবান্ পুরুষকে স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি উক্ত প্রবাহিণীর তটস্থিত একটী বৃক্ষমূল হইতে একখণ্ড শিলা আনিয়া এই সেবা স্থাপন করিলেন ও নিত্যসেবা পরিচালন জন্য ১০⁄ বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এখনও উক্ত সেবা চলিতেছে; উক্ত দেবীর নাম হইল মনিকর্ণিকা এবং উক্ত প্রবাহিণী এখনও মুনাইকাঁদর নামে খ্যাত রহিয়াছে। যে স্থানে মণিকর্ণিকা দেবীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় উক্ত স্থানে একটী কুণ্ড রহিয়াছে এবং কাশীধামের মণিকর্ণিকার অনুকরণে এখানে একটী শ্মশানক্ষেত্রও হইয়াছে। স্থানটী এক্ষণে কুণ্ডতলার শ্মশান নামে খ্যাত। [১৬৫-১৬৬ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

কাশ্যপগোত্র দাসবংশ

বাসস্থান (ক) বড়ার, (খ) বাতুড়ি, বংশ ভাগলপুর, (গ) পিলসীমা, বংশ ধরমপুর, (ঘ) ঘুল্লে, বংশ পদ্মাপার, (ঙ) গোকর্ণ, বংশ বীরভূম, (চ) হলদী, বংশ মান্দারন, (ছ) কুলিয়া, (জ) বংশ মণ্ডলঘাট, (ঝ) ভাগলপুর, (ঞ) কাশীযোড়া, (ট) বীরভূম, (ঠ) বীরভূম, (ড) ঘোড়াঘাট, (ঢ) মালদহ, (ণ) মালদহ, (ত) মালদহ, (থ) মুর্শীদাবাদ, (দ) সহর বালুচর, (ধ) বড়ার।

(ন) ভূষণায় সূর্য্যকুণ্ড ও হরিহরনগর।

কাশ্যপগোত্র দাসবংশ
শ্রীরামদাস বিশ্বাসখাস (১৬৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
৯ চণ্ডী
১০ পরশুরাম
১১ মধুসূদন
১২ বাবুরাম
১২ মনোহর
দামোদর
১৩ ভদ্রচরণ
১৪ আনন্দচন্দ্র
১৫ ক্ষেত্রনাথ
১৬ সিতিকণ্ঠ
নীলকণ্ঠ
কুঞ্জবিহারী
১৬ শ্রীকণ্ঠ
বাণীকণ্ঠ
বরদাকণ্ঠ
সারদাকণ্ঠ
১৭ নিতাই
তারিণী
কালীপ্রসন্ন
হরিশচন্দ্র
রামচন্দ্র
বিষ্ণুচন্দ্র
অঘোর
গৌর
বিজয়
বলরাম
১৮রাধামোহন
রামমোহন
ভোলানাথ
১৭ কৃষ্ণচন্দ্র
হরেকৃষ্ণ
যজ্ঞেশ্বর
পূর্ণচন্দ্র
ধরণীধর
১৯ বৈদ্যনাথ
রামনৃসিংহ
১৮ রাখনারায়ণ
রাধাকিশোর
বৃন্দাবন
মধুসূদনসুত ১২ মনোহর
১৩ ভৈরব
১৪ শিবনাথ
১৫ পরেশনাথ
মহানন্দ
ত্রৈলোক্য
১৬ রামলাল
কৃষ্ণলাল
বিনোদ
হীরালাল
মোহনলাল
মতিলাল
গোবিন্দপ্রসাদ
১৭ গিরিশ
ভগবান্
রাধাসুন্দর
শ্যামাপদ
রমাপদ
রেণুপদ
দ্বিজপদ
১৮জগবন্ধু
রাধাপ্রসন্ন
গোলোকবিহারী
গোপেশ্বর
শরৎচন্দ্র
তারকব্রহ্ম
বটকৃষ্ণ
ব্রজনাথ
কাশীনাথ
ব্যাসকাশীনাথ

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা সীতারাম রায়

(গজদানী রামদাস-বংশ — হিমকরের ধারা)

মুসলমান আধিপত্য-কালে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজে যে সকল দেশভক্ত মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়া জননী জন্মভূমিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে শেষ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হইতেছেন রাজা সীতারাম রায়। যদিও মুসলমান লেখকগণের অনুগামী হইয়া ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সীতারামকে একজন ক্ষুদ্র জমিদার ও ডাকাইতের সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই*, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার চরিতকথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই মহাপুরুষের অধ্যবসায়, স্বধর্ম্মানুরাগ, বীর্য্যবত্তা, হিন্দু-মুসলমানের মিলনেচ্ছা, রাজনীতি ও সমাজনীতির পরিচয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" প্রকাশের পর হইতে নানা মাসিক পত্রিকায় অনেকের লেখনীতে সীতারামের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তন্মধ্যে অনেক উপকথা ও অলীক কিংবদন্তী স্থান পাইয়াছে। যতটা সম্ভব প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে রাজা সীতারামের পরিচয় লিখিতেছি।† পূর্ব্ব অধ্যায়ে সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ ও জ্ঞাতিগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। রামদাস গজদানীর অধস্তন ৭ম পুরুষ হিমকরের পুত্র শ্রীরাম বিশ্বাসখাসের প্রপৌত্র হইতেছেন—রাজা সীতারাম রায়। সীতারাম তাঁহার নিজ পরিচয়ে "শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোদ্ভব-কুলকমলোদ্ভাসকো ভানুতুল্যঃ" ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় যে 'বিশ্বাসখাস' উপাধিধারী শ্রীরামদাস একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না, পূর্ব্বাধ্যায়ে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের শেষ ভাগে যখন রাজা মানসিংহ রাজমহলে প্রাচ্যভারতের শাসনকেন্দ্র করিয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় শ্রীরাম সুবাদারের খাস সেরেস্তায় হিসাব বিভাগে অতি বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়া 'বিশ্বাসখাস' উপাধি লাভ ও সেই সঙ্গে প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র।

---

* Vide Stewart's History of Bengal, pp. 239-240.

† অন্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া উপন্যাসচ্ছলে রাজা সীতারামের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে বিশ্বকোষে 'সীতারাম' শব্দে সীতারামের প্রকৃত পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে। পরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "সীতারাম" নামে এবং এবং অপ্রদিন হইল, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার "যশোহর খুলনার ইতিহাস" ২য় খণ্ডে "সীতারাম" সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। উপরে তাহারই সারাংশ লিখিত হইল।

ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে হরিশ্চন্দ্র তথায় গিয়া উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার কার্য্যে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া নবাব তাঁহাকে 'রায়-রায়ান্' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার প্রিয় পুত্র উদয়নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীনে সাজোয়াল নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আগমন করেন। এই উদয়নারায়ণের পুত্র হইতেছেন মহামতি সীতারাম।

সীতারামের জন্মের পূর্ব্বেই বারভূঞার অন্যতম রাজা মুকুন্দরাম রায় ভূষণার রাজা ছিলেন, তৎপরে তৎপুত্র সত্রাজিৎ বা শত্রুজিৎ মোগল সরকারের অধীন সামন্ত ছিলেন। তিনি শত্রু পক্ষের নানা ষড়যন্ত্রে মৃত্যুদণ্ডে দেহপাত করেন এবং সংগ্রামশাহ ভূষণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই সময় উদয়নারায়ণের অভ্যুদয়। সংগ্রামশাহের পুত্রের মৃত্যু হইলে ভূষণা একজন ফৌজদারের শাসনাধীন হয়। রাজস্ব আদায় কার্য্যে উদয়নারায়ণ প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। সেই সময়ে সীতারামও পিতার সহিত ভূষণায় আসিয়াছিলেন।

সীতারাম সময়োপযোগী বিদ্যাশিক্ষা ও উপযুক্ত অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কার্য্যোপলক্ষে ভূষণা হইতে ঢাকায় যাতায়াত করিতেন। নবাব শায়েস্তা খাঁ তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভূষণার নিকটবর্ত্তী সা-তৈর পরগণার করিমখাঁ নামক এক পাঠান বিদ্রোহীকে দমন করিতে নিযুক্ত করেন। সীতারামের রণকৌশলে করিমখাঁ পরাস্ত ও নিহত হইল। তজ্জন্য নবাব অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভূষণার অন্তর্গত নলদী পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। জায়গীরের সনদ উপলক্ষে যে সময় তিনি ঢাকায় যান, সে সময়ে তাঁহার ভাবী সহচর দুই মহাপ্রাণের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, তন্মধ্যে একজন হইতেছেন ঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ মুনিরাম রায়, অপরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ রঘুরাম ওরফে রামরূপ ঘোষ। সীতারাম উভয়কে নিজ জায়গীর মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সঙ্গে লইয়া আসেন। রামরূপ একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার প্রকাণ্ড দেহ দর্শনে সকলে তাঁহাকে মেনাহাতী বলিত। সীতারাম দুই জন মুসলমান সেনানী পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বক্তার খাঁ ও আমল বেগ। আমল বেগ 'হামলা বাঘা' নামেও পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়া নমঃশূদ্র জাতীয় রূপচাঁদ ঢালী ও নিকারী জাতীয় ফকিরা মাছকাটা নামে দুই জন নীচ জাতীয় সেনানায়ক ছিল।

এ সময়ে ভূষণা সরকার মধ্যে বড়ই দস্যুর উৎপাত,—অধিবাসিগণ সকলেই ধন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। সীতারাম নিজ দলবল সহ প্রথমেই দস্যুদলনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার প্রভাবে ভূষণায় আবার শান্তি বিরাজ করিল, অনেক দস্যুই দস্যুতাত্যাগ করিয়া চাষ বাসে মন দিল। অনেক দস্যুসর্দ্দার সীতারামের সেনাবিভাগে নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিল। সীতারামের প্রতাপে দস্যুদলন ও দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে ভূষণার গ্রাম্য কবি গান রচনা করিয়াছিলেন,

"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হ'য়ে গেল দূর ॥

(এখন) বাঘ মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে ।
(এখন) রামী শ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গা স্নানে যাবে ॥”

সীতারামের সুশাসন গুণে নলদী পরগণার প্রজাবর্গ করবৃদ্ধি দিতে কুণ্ঠিত হইল না। অল্পদিন মধ্যেই আয়বৃদ্ধির সহিত সীতারাম উপযুক্ত জমিদার হইলেন। তিনি ভূষণার অন্তর্গত সাতৈর পরগণাও বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ক্রমশঃই তাহার যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহম্মদপুরের নিকট সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে নলদী পরগণার কাছারী ছিল। সেখানে ও হরিহর-নগরে গড়খাই-পরিবেষ্টিত অট্টালিকা ও সৈন্যাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। বলিতে কি সীতা-রামের শক্তির পরিচয় পাইয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

সীতারামের তিনটী বিবাহ শুনা যায়। প্রথম বিবাহ ইদিলপুরনিবাসী এক মৌলিক কায়স্থকন্যার সহিত। তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি জন্মে নাই। সীতারামের জায়গীর প্রাপ্তির পর তিনি বীরভূম জেলার দাস-পলসা গ্রামে সেকালীন ঘোষবংশীয় কুলীনপ্রবর সরল খাঁর কন্যা কমলাকে বিবাহ করেন। সীতারাম মৌলিক ও আভিজাত্যে নিম্ন ছিলেন। শুনা যায় এই বিবাহে সরলখাঁ কমলাকে ওজন করিয়া কুলমর্য্যাদা লইয়াছিলেন। পরে সরলখাঁ আরও কএকজন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসহ আসিয়া সীতারামের নিকট যথেষ্ট ভূমি বৃত্তি পাইয়া তাঁহার রাজধানীর নিকট ঘুল্লিয়া গ্রামে বাস করেন। এখন তথায় সরল খাঁর বাটীর ভগ্নাবশেষ ও দুইটী দীঘি বিদ্যমান।

সীতারাম বর্দ্ধমান জেলাস্থ পাটুলী গ্রামে তৃতীয় বার বিবাহ করেন। এই ৩য়া পত্নীর গর্ভে বামদেব ও জয়দেব নামে দুইটী পুত্র জন্মে, কিন্তু এই দুই পুত্রই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মধ্যমা মহিষী কমলার গর্ভে শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। শ্যামসুন্দরের বংশ লোপ হয়। সুরনারায়ণের পৌত্র রাধাকান্তের দৌহিত্রের ধারায় কএকজন জীবিত আছেন।

সীতারামের প্রতিপত্তির প্রারম্ভে তাঁহার পিতামাতা উভয়েই দেহত্যাগ করেন। সীতা-রাম উপযুক্ত আড়ম্বরে তাঁহাদের দানসাগর শ্রাদ্ধ করেন। পূর্ব্বে ভূষণা অঞ্চলে শ্রাদ্ধের দিন ব্রাহ্মণভোজনের রীতি ছিল না, সীতারাম তাহা প্রথম চালাইয়া গিয়াছেন।

পিতৃশ্রাদ্ধের এক বর্ষ পরে সীতারাম ছোট ভাই লক্ষ্মীনারায়ণের উপর জমিদারীর ভার দিয়া রামরূপ ও মুনিরামকে সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া বহু ভেট লইয়া দিল্লীতে আসিলেন। জায়গীরদাররূপে সীতারামের কার্য্যকুশলতার পরিচয় পূর্ব্বেই নবাব সায়েস্তা খাঁ উপযুক্তভাবে দিল্লীদরবারে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। দস্যুদলন, প্রজাপালন ও বিদ্রোহী শাসনে যে তিনি উপযুক্ত ছিলেন, তাহা আর বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইল না। সুবক্তা মুনিরামও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং বাদশাহ অরঙ্গজেব সীতারামকে সানন্দে ‘রাজা’ উপাধির ফরমান এবং দক্ষিণ বঙ্গের আবাদী সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

সীতারাম ফরমান লইয়া বরাবর ঢাকায় আসিলেন। নবাব পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কার্য্যে প্রীত ছিলেন। এক্ষণে তিনি বাদশাহী সনদে স্বাক্ষর করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন। সীতারাম হরিহরনগরে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মহিষী কমলা সহ রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। সেদিন মহা আনন্দোৎসব হইয়াছিল। রাজা হইবার পর তিনি একটী নিরাপদ সুরক্ষিত স্থানে আপন রাজধানী পত্তন করিলেন, এই রাজধানীর নাম হইল মহম্মদপুর।

সীতারামের পিতৃকুল শাক্ত ছিলেন, তিনিও প্রথমে শক্তির সেবা করিতেন। গোঁসাই গোরাচাঁদের 'সংকীর্ত্তন-বন্দনা' গ্রন্থে লিখিত আছে—

"শ্রীরণরঙ্গিনী মাই, সীতারাম যাকে পাই
হইল দেখ রাজ রাজ্যেশ্বর।"

সীতারাম রাজধানী-প্রতিষ্ঠার পরই রণরঙ্গিনী দশভুজার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই মন্দিরের গায়ে এইরূপ লিপি উৎকীর্ণ ছিল—

"মহীভুজঃ রসাক্ষৌণীশকে দশভুজালয়ম্।
অকারি শ্রীমত' সীতারামরায়েণ মন্দিরম্।"

অর্থাৎ ১৬২১ শক (১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে) রাজা সীতারাম দশভুজার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দির মধ্যে ইহাই তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি।

সীতারাম শাক্ত হইলেও অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিষ্ণুভক্ত হইয়া পড়িলেন। গোরাচাঁদের গ্রন্থে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ সাধক কামদেব তার্কিক ও তাঁহার উত্তরসাধক যাদবেন্দ্র ঘোষ ভূষণায় আসিয়া রণরঙ্গিনীর মন্দিরে দেখা দিলেন—একসঙ্গে যেন চন্দ্র-সূর্য্য উদিত হইল। তাহাদের দেখিবার জন্য বহু লোক আসিতে লাগিল। তাঁহাদের রূপ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংবাদ শুনিয়া রাজা সীতারামও দেখা করিতে আসিলেন এবং যাদবেন্দ্রের মুখে হরেকৃষ্ণের নামগান শুনিলেন।* তখন হইতে সীতারাম কৃষ্ণভক্ত হইয়া পড়িলেন। গোরাচাঁদ লিখিয়াছেন,—

"হরিনাম-সংকীর্ত্তন ভজনের সার। চিত্তশুদ্ধ যাহে হয় আনন্দ অপার॥
প্রত্যক্ষ সাক্ষী দেখ রাজা সীতারাম। দেবের সমান হইল শুনি কৃষ্ণনাম॥
রাজা হঞা রাজ্যপাট সব দিল ছাড়ি। কাঙ্গাল হইয়া আসে গোপীনাথের বাড়ী॥
শ্রীহরেকৃষ্ণ রায় স্থাপন করিল। গৃহী হঞা বৈরাগ্য সে রাজর্ষি হইল॥"

সীতারামের কৃষ্ণভক্তির নিদর্শন—দশভুজার মন্দির-প্রাঙ্গণের পশ্চিম পার্শ্বে অতি সুন্দর জোড়বাঙ্গালা নির্ম্মাণ ও তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা। ইহার পরে গুরুদেবের সন্তোষার্থ কানাইনগরে প্রসিদ্ধ হরেকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন ও তাঁহার জন্য বঙ্গীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন

---

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫৩৫ পৃষ্ঠা।

পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরসংলগ্ন কষ্টিপাথরের একটী গোলফলকে এইরূপ শ্লোক উৎকীর্ণ ছিল—

"বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রৈঃ পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ
শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোদ্ভবকুলকমলোদ্ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
ভ্রা জচ্ছিল্পৌঘযুক্তং রুচিররুচি হরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ॥"

অর্থাৎ ১৬২৫ শকে (১৭০৩ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণসন্তোষার্থ—ভানুতুল্য যিনি শ্রীমান্ বিশ্বাস খাসকুলকমলকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমান্ শ্রীসীতারাম রায় যদুপতিনগরে (কানাইনগরে) উজ্জ্বল শিল্পরাজিসম্বলিত সুরুচিসম্পন্ন বিচিত্র হরেকৃষ্ণমন্দির উৎসর্গ করেন। কানাইনগরের মন্দির সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত অপর সকল মন্দির হইতে বড় ও উচ্চ বলিয়া বহুদূর হইতে সকলের নেত্র আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই মন্দিরে তিনি অতি চমৎকার রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এখানকার ও অপরাপর দেবসেবার জন্য বহু ভূমি-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এখানে প্রত্যহ দুই বেলা হরিনাম-সংকীর্ত্তনের সুবন্দোবস্ত ছিল। রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে যেখানে রাধাকৃষ্ণের দোল হইত—মনুমেণ্টের ন্যায় সেই ভগ্ন দোলমঞ্চ আজও খাড়া রহিয়াছে। বলিতে কি রাজা সীতারাম বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজধানীর নিকটে কানাইনগরে বৃন্দাবনের কল্পনা করিয়াছিলেন। তাই এখানে বহু গোপের বাস হইয়াছিল। যে পাড়ায় গোপেরা বাস করিত, তাহার নাম গোকুলনগর। এখনও তথায় গোপের বাস আছে। কানাইনগরের হরেকৃষ্ণবিগ্রহের সেবক গোপ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারিত না। বৃন্দাবনের নিকট শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতির অনুকরণে কানাইনগরের চারিধারে শ্যামনগর, রাধানগর, মথুরানগর আদি নামে কতকগুলি গ্রামের নাম হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণবিগ্রহের সেবার জন্য যে তিনখানি গ্রাম দেবোত্তর দেওয়া হয়, তাহাও হরেকৃষ্ণপুর, লক্ষ্মীপুর ও বলরামপুর নামে পরিচিত। কানাইনগর হইতে রাজধানীর গড় পর্য্যন্ত এক মাইল দীর্ঘ পরিখাই যমুনা নদী এবং হরেকৃষ্ণপুরের অপূর্ব্ব জলাশয় কৃষ্ণসাগরই কালীয় হ্রদ কল্পিত হইয়াছিল। কানাইনগরে হরেকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার পর রাজা সীতারাম মহম্মদপুরে ১৬২৬ শকে (১৭০৪ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরে এইরূপ লিপি উৎকীর্ণ ছিল—

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে।
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে সীতারামেন মন্দিরং॥"

অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের অবস্থানের নিমিত্ত ১৬২৬ শকে (১৭০৪ খৃষ্টাব্দে) সীতারাম কর্ত্তৃক পিতৃপুণ্যার্থ (এই) মন্দির নির্ম্মিত হইল।

সীতারাম তাঁহার অধিকারভুক্ত জনপদে বহুসংখ্যক দেবালয় ব্যতীত প্রজাদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বিস্তর দীঘি ও পুখুর কাটাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার জলকীর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত

কৃষ্ণসাগর এবং মহম্মদপুরের রামসাগর ও সুখসাগর প্রধান। মহম্মদপুর অধুনা জঙ্গলময় হইলেও রামসাগরের জল বরাবর সমান আছে। এখনও সুন্দর স্বচ্ছ জল—শৈবালদামের চিহ্ন নাই—এরূপ প্রাচীন অথচ এরূপ স্বচ্ছসলিল সরোবর বোধ হয় বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় নাই। এখন জলাশয়ের আয়তন অনেকটা কমিয়া আসিলেও আজও জলাশয় দৈর্ঘ্যে ১৬০০ ও প্রস্থে ৬০০ হাত হইবে। পাহাড় সহ ধরিলে বেড় প্রায় ২০০ বিঘা হইবে।

সীতারাম যে কেবল দেবকীর্ত্তি ও জনহিতকর কার্য্য করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। নিজ পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উপযুক্ত ধনজনের প্রয়োজন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তিনি নিজ রাজধানীতে সৈন্যসংগ্রহ, কোষবৃদ্ধি ও অস্ত্রাগার পূর্ণ করিতেছিলেন। যাঁহারা চুরি ডাকাতী করিয়া চালাইত, অথচ কোন দিন চাষবাসে মন দেয় নাই,—তাহাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হওয়ায় এখন তাহারাই দলে দলে আসিয়া সীতারামের সেনাদলে প্রবেশ করিল। অল্পদিন মধ্যেই সীতারামের অধীনে বহু সহস্র যোদ্ধা নিযুক্ত হইল। তাহাদের সাহায্যে সীতারাম ভাটীরাজ্য শাসন ও জঙ্গলময় প্রদেশে বহু প্রজা পত্তন করিয়া ভাবী আয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। সুবাদারকে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া তাঁহার প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি সুন্দরবনের যে আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সীমা নির্দ্দেশ ছিল না। সুতরাং এই সনদবলে সীতারাম নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র জমিদারগণের অধিকার গ্রাস করিতে লাগিলেন। বিনোদপুর নবগঙ্গার তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে ছিল, বিনোদপুরের অপরপারে সত্রাজিৎপুর বা শত্রুজিৎপুর। এখানে বারভূঞার অন্যতম মুকুন্দরামের বংশধর কালীনারায়ণ চাকলা ভূষণার অন্তর্গত রূপপাত, পোকতানি, রুকনপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র পরগণার ও নলদীর কচুবাড়িয়ার জমিদার ছিলেন, তাঁহার পৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যুর পর ঐ সকল সম্পত্তি তাঁহার নাবালক পুত্রের হস্তে পড়ে। এই নাবালককে ফাঁকি দিয়া অনেকে আয় ভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সীতারাম প্রথমেই নাবালকের জমিদারী দখল করিলেন। নাবালকেরা সমস্ত খরচাই পাইতেন। তবে রাজস্ব নবাবসরকারে না গিয়া সীতারামের কোষাগারে জমা হইত।

তৎকালে মামুদশাহী পরগণা নলডাঙ্গার রাজার অধিকারে ছিল। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী গিয়া পরগণার পুর্ব্বাংশ আক্রমণ করেন। রাজা রামদেব সীতারামকে পূর্ব্বভাগ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিলেন। (এই সম্পত্তি পরে নাটোররাজের অধিকারে যায়।)

ক্রমে ক্রমে পদ্মার পার্শ্ববর্ত্তী অধিকাংশ ক্ষুদ্র জমিদারীই সীতারাম দখল করেন। পাবনা জেলার কতকটা তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে নব অর্জ্জিত জমিদারীগুলির সমস্ত আয় তিনিই গ্রহণ করিতেন, নবাবের নিকট কোন রাজস্ব পাঠাইতেন না।

সীতারাম কেবল দস্যুদমন বলিয়া নহে, বিদ্রোহী পাঠানদিগকে জয় করিয়া মোগল সুবেদারের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার জায়গীর লাভের পর হইতে বহু জমিদারী দখল করিয়া সেই সেই স্থানের রাজস্ব না পাঠাইলেও নবাব সীতারামের প্রতি

বিরক্ত হন নাই। সুতরাং অল্পদিন মধ্যেই সীতারাম প্রভূত ধনশালী হইয়া পড়িলেন। আর্থিক উন্নতির সহিত রাজভবন সুদৃঢ় ও রাজধানী সুরক্ষিত করিবার বিপুল আয়োজন হইল। অপর স্থান হইতে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করিতে গেলে পাছে মোগল রাজপুরুষগণের নয়ন-পথে পতিত হন, বিশেষতঃ পরমুখাপেক্ষী হইলে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হইবে ভাবিয়া তিনি ঢাকা হইতে উপযুক্ত কামার আনাইয়া দুর্গের পার্শ্বে বাস করাইয়াছিলেন। তাহারা নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র গড়িয়া সীতারামের অস্ত্রাগার পূর্ণ করিয়াছিল। তাহাদের নির্ম্মিত বড় বড় কামান, গুলি গোলা, সূচ্যগ্র বর্শা ও সুতীক্ষ্ণ তরবারি রাজপুরুষগণের বিস্ময়োৎ-পাদন করিত। তদ্ভিন্ন বড় বড় হাট বাজার স্থাপন করিয়া নানা স্থান হইতে ব্যবসায়ী ও বণিক্‌গণকে আনিয়া বসাইলেন। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যাহাতে কোন দিন রসদের অভাব না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন।

সীতারাম জানিতেন যে তিনি যখন মোগল-সুবেদারকে খাজনা পাঠাইতেছেন না, স্বাধীন ভাবে নিজে সমস্তই গ্রহণ করিতেছেন, তখন মোগল সরকারের সহিত বিবাদ ও তাহার পরিণাম যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। বাদশাহ অরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ ও কঠোর শাসনে হিন্দুসমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ হিন্দুবিদ্বেষী বাদশাহকে সন্তুষ্ট রাখিয়া সীতারাম ধীরে ধীরে উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু বঙ্গের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে হিন্দু জমিদারগণ তাঁহার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িলেন। একতার কথা ভুলিয়া গেলেন। কঠোর মোগল শাসনে সকলেই এক প্রকার আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। মোগলের অশেষ প্রকার উৎপীড়ন অবনতমস্তকে সহ্য করিতেছিলেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ান হইয়া ঢাকায় আসেন। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে দেওয়ানীর সহিত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নাএব নাজিম হইলেন। দেওয়ানী হইতেই তিনি অতি কঠোর ভাবে কর আদায় আরম্ভ করেন। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য যত প্রকার যন্ত্রণাদায়ক উপায় আছে, মুর্শিদকুলী হিন্দু জমিদারগণের উপর প্রয়োগ করিতেন। তাঁহারই সময়ে জমিদারগণকে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য পুরীষাদি পূর্ণ "বৈকুণ্ঠ" নামক খাতের সৃষ্টি। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলীর অত্যাচার আরও বাড়িয়া উঠে নানা কঠোর উপায়ে অর্থশোষণ করিয়া নূতন নূতন বাদশাহকে সন্তুষ্ট রাখিতে লাগিলেন। বাঙ্গলায় হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। তথাচ নিগৃহীত জমিদারগণ সকলে এক হইয়া কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন না। সেই সময়ে কেবল একজন হিন্দুসমাজের দুরবস্থা বুঝিয়া ছিলেন। তিনিই রাজা সীতারাম রায়।

আজিম উস্‌সান সুবাদার হইয়া ঢাকায় আসিবার পর তাঁহার এক পরমাত্মীয় মীর আবু তোরাপকে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠান। তিনি ভূষণায় আসিয়া সীতারামের সভায় লোক পাঠাইয়া রাজস্ব তলব করিলেন। সীতারাম তাঁহাকে কর পাঠাইলেন না। তাহাতে মীর সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিয়া সীতারামের সভায় পত্র দিলেন। এরূপ অপমান-সূচক পত্র পাইয়া সীতারাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অত্যাচারী মুসলমানকে কখনই কর দিবেন

না। আবু তোরাপ সীতারামকে শাসন করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি পীর খাঁকে সসৈন্যে পাঠাইয়া ছিলেন। উভয় পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ হইল। পীরখাঁ সুবিধা করিতে না পারায় আবু তোরাপ নিজে রণক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন এবং দুর্দ্ধর্ষ মেনাহাতীর হস্তে নিহত হন।

আবু তোরাপ নিহত হইলে সীতারাম ভূষণা দুর্গ দখল করিয়া নিজে তথায় রহিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন আবু তোরাপের নিধন এবং ভূষণা দুর্গ বেদখল সংবাদ পাইলে মোগল সুবেদার সহজে ছাড়িবেন না। এ কারণ সীতারাম নানাভাবে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি, কামান গোলা গুলি ও বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধ সরঞ্জামের বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী হিন্দু জমিদারগণও যাহাতে অত্যাচারী মোগল সুবেদারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, ভিতরে ভিতরে তাহারও চেষ্টা চলিতে লাগিল।

মুর্শিদাবাদে আবু তোরাপের নিধন সংবাদ পৌঁছিবামাত্র মুর্শিদকুলীখাঁ মোগল সম্মান বজায় রাখিবার জন্য কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার শ্যালীপতি বক্স আলীকে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠাইলেন। নিকটবর্ত্তী সকল জমিদারকে জানাইলেন যে কেহ যেন রসদ বা সৈন্য দিয়া বা কোন প্রকারে সীতারামকে সাহায্য না করেন। যাঁহাদের সাহায্য করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন সুবেদারের ঘোষণাপত্র শুনিয়া সকলেই পিছাইয়া পড়িল। স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশা বিলীন হইল।

বক্স আলীর সঙ্গে দুই জন সহকারী সেনানী আসিয়াছিলেন, একজন সুবেদারী সৈন্যের নায়ক সংগ্রাম সিংহ, অপরে জমিদারী ফৌজের পরিচালক দয়ারাম রায়। সীতারাম পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন। তিনিও বিপক্ষ সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। ভূষণা দুর্গ দখল করিতে না পারিয়া মোগল পক্ষ ভূষণা অবরোধ করিল; পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণকেও সসৈন্যে আসিয়া যোগদান করিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিল; সীতারাম বুঝিলেন তাঁহার সম্মুখে ঘোর বিপদ্—বাহির হইতে কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই।

তৎকালে রামরূপ ঘোষ ওরফে মেনাহাতী মহম্মদপুরের দুর্গরক্ষক ছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, ব্রহ্মচর্য্য ও অসাধারণ বীরত্বের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। সৈন্যসামন্ত সকলেই তাঁহার উৎসাহবাক্যে কেহই প্রাণদান করিতে পরাঙ্মুখ ছিল না। এরূপ মহাবীরকে সরাইতে না পারিলে দুর্গাধিকার এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার, তাহা মোগলপক্ষ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বহুদিন চেষ্টাতেও যখন সংগ্রামসিংহ বা দয়ারাম রায় সুবিধা করিতে পারিলেন না, তখন দয়ারাম রামরূপকে মারিবার জন্য গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করিলেন।

রামরূপ দুর্গদ্বারের নিকটবর্ত্তী গৃহে রাত্রিযাপন করিতেন। প্রাতে, অতি ভোরে উঠিয়া শৌচান্তে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া সশস্ত্র নগর প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্গ ও নগররক্ষার জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক, সেনানীগণকে তাহার উপদেশ দিয়া আসিতেন। একদিন ভোরে উঠিয়া শৌচ করার

জন্য যেমন তিনি দোলমঞ্চের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছেন কুয়াসার অন্ধকারে গোপনে কএকজন ঘাতক পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে বীরবরকে শূলবিদ্ধ করিল, মহাত্মা রামরূপ গুরুতর আঘাতে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডেরা তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পলায়ন করিল। দয়ারাম বাহাদুরী লইবার জন্য সেই ছিন্নমুণ্ড মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু নবাব সেই বীরবরের কাটা মুণ্ড সসম্মানে মহম্মদপুরে ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। নবাব সেই প্রকাণ্ড মুণ্ড দেখিয়া বলিয়াছিলেন—এরূপ মহাবীরকে সশরীরে কারারুদ্ধ না করিয়া কেন তাঁহাকে গোপনে হত্যা করা হইল। যেখানে রামরূপের মুণ্ডহীন দেহের সৎকার হইয়াছিল, সেইখানেই তাঁহার ছিন্নমুণ্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। রাজা সীতারাম রামরূপের অস্থিখণ্ডের সমাধিনির্দ্দেশক একটী উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সীতারাম ভূষণাদুর্গ হইতে রামরূপের হত্যাকাণ্ড শুনিলেন। এ সংবাদে তিনি যেন চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ অনুজ লক্ষ্মণসদৃশ প্রধান সেনাপতির পরিণাম শুনিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। ভূষণাদুর্গ রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া অবশিষ্ট যোদ্ধাগণকে গোপনে রাত্রিযোগে মহম্মদপুরে আসিবার পথ বলিয়া দিলেন। স্বয়ং ছদ্মবেশে মধুমতী পার হইয়া মহম্মদপুরে উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে দয়ারামের অধীনস্থ জমিদারী ফৌজ মহম্মদপুরের চারিধারে হুঙ্কার করিতেছিল। সংগ্রামসিংহের দলবল ভূষণার জঙ্গল ছাড়িয়া মহম্মদপুরের দিকে আসিতেছিল। শক্রপক্ষ তখনও রাজধানী আক্রমণ করে নাই। সীতারামকে পাইয়া রাজধানীর সকলে আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু সীতারাম বুঝিলেন যে আর রক্ষা নাই। পূর্ব্বে তিনি হিন্দু ধর্ম্মের দিক্‌ দিয়া আশা করিয়া ছিলেন যে হিন্দু জমিদারগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। এখন দেখিলেন কাপুরুষ জমিদারগণ তাঁহাকে সাহায্য করা দূরের কথা, বরং শক্রপক্ষকেই নানা প্রকারে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহার জয়াশার কোন সম্ভাবনা নাই। এখন তিনি আত্মমর্য্যাদারক্ষার জন্য বীরোচিত ভাবে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। দুর্গস্থ স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা যাহারা অস্ত্রধারণে যোগ্য নহে, তাহাদিগকে দুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়া যান বাহন ও রক্ষী দিয়া নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। রাণীগণের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি শেষ পর্য্যন্ত সীতারামকে উৎসাহিত করিতে বিচলিত হন নাই। দয়ারামের ও ফৌজদারের সৈন্যগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিয়া এক সময়ে প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়াছিল। কএক দিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। সীতারামের গুলি গোলার বিপুল সংগ্রহ থাকিলেও শক্রপক্ষ একে একে কামান গুলি অধিকার করিল—প্রধান প্রধান বীরগণ একে একে ধরাশায়ী হইল। সীতারাম দুর্গমধ্যে থাকিয়া আর ফল নাই বুঝিয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন এবং শরীররক্ষী সৈন্যগণ লইয়া সেই বিশাল শক্র-সৈন্যসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু আর কতক্ষণ যুঝিবেন? অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া আহত ও ধৃত হইলেন। এখন মোগল সৈন্য রাজধানী লুটিতে ব্যস্ত হইল। দয়ারাম কাহাকেও দেবমন্দিরে ও অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তিনি কৃষ্ণজী বিগ্রহের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লুটের কোন-

অংশ গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু সেই কৃষ্ণবিগ্রহ গোপনে বস্ত্রাভ্যন্তরে লইয়া চলিয়া আসেন। এখনও দীঘাপতিয়া-রাজবাটীতে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক চিহ্নস্বরূপ সেই মূর্ত্তির সেবা চলিতেছে, সেই বিগ্রহের পাদপীঠে "দয়ারাম রায়" (১) খোদিত আছে।

দয়ারাম রায় সীতারামকে বন্দী করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কৃষ্ণজীর পাষাণমূর্ত্তি লইয়া দীঘাপতিয়া আসিবার সময় তিনি বন্দী সীতারামকে নাটোরের কারাগারে রাখিয়া আসেন। যেখানে সীতারামকে রাখা হইয়াছিল, এখনও লোকে সেই স্থান দেখাইয়া থাকে। দয়ারাম রায় রাজা সীতারামকে লইয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে তিনি নবাবের প্রশংসাভাজন এবং তাঁহার বীরত্বের জন্য 'রায়রায়ান্' উপাধি সহ কতকগুলি জমিদারী পাইয়াছিলেন।

সীতারাম মুর্শিদাবাদে আনীত হইলে নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। এ সময় রাজা সীতারামের মাসতুতা ভাই রাজা রামরামরায় নবাবের নিকট সীতারামের প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। বঙ্গাধিকারী ও জগৎশেঠও অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই, এজন্য রামরায় ক্ষুণ্ণ হইয়া নবাবের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গয়তায় চলিয়া আসেন।(২) গঙ্গাতীরে রাজা সীতারামের শ্রাদ্ধ হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার পিতৃগুরুবংশীয় শ্রীরাম বাচস্পতিকে ১১২১ সালে ২৩এ কার্ত্তিক পরগণে নলদীর অন্তর্গত জয়রামপুর ও আঠারবাঁকা গ্রামে ১২/ বিঘা জমি এবং সীতারামের গুরুপৌত্র আনন্দচন্দ্র ও গৌরচরণ গোস্বামীকে ১১২১ সালে ২২শে কার্ত্তিক পরগণে নলদীর অন্তর্গত কানুটীয়া, বুল্লিয়া, বিনোদপুর ও নারায়ণপুর গ্রামে কএক পাখী জমি দান করিয়াছিলেন, সেই জমি-দানের সনদ অনেকে দেখিয়াছেন।(৩) এরূপ স্থলে মনে হয় ১১২১ সালের আশ্বিন মাসে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) সীতারামের জীবনলীলা শেষ হয়।

সীতারামের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"মুসলমান ইতিহাস-লেখক তাঁহাকে যেরূপ ভীত ও আতঙ্কযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি সেরূপ ভীত হইলে অবশ্যই সন্ধিস্থাপনের আয়োজন করিতেন। মুসলমানকে করপ্রদান করিতে সম্মত হইলে সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত ; রাজ্য থাকিত, রাজদুর্গ থাকিত, রাজশক্তি অব্যাহত ভাবে সীতারামের গৌরব ঘোষণা করিত ; এবং হয়ত আজিও মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদে প্রভাতে সায়াহ্নে সশস্ত্র দ্বাররক্ষিগণ সীতারামের বংশধরদিগকে মহারাজ, রাজা বা

১) কেহ কেহ "সীতারাম রায়" পাঠ করিয়াছেন।

(২) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, ৩য় অংশ, ১০—১১ পৃষ্ঠা।

(৩) যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৫৯৯—৬০০ পৃষ্ঠা দেখ

নিতান্তপক্ষে রায় বাহাদুর বলিয়া অভিবাদন করিবার অবসর পাইত। একটু পদানত হইলে, একটু ক্ষমাভিক্ষা করিলে, একটু অধীনতা স্বীকার করিলে হাস্যময়ী পুরী এমন শ্মশানভূমিতে পরিণত হইত না। যিনি স্বহস্তে বিস্তৃত রাজ্য গঠন করিয়া বাহুবলে সেই রাজ্য শাসন করিতেন, তিনি যে এতটুকু বুঝিতেন না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? তথাপি এতটুকু করিতেও সীতারাম সম্মত হইলেন না কেন? এই জন্যই মনে হয় যে আত্মবংশ বা আত্মপরিবারকে ধনগৌরবে গৌরবান্বিত করিবার জন্য সীতারাম ব্যাকুল হন নাই। **বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার জন্যই অগ্রসর হইয়াছিলেন** এই অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে, সীতারামের ইতিহাস পড়িতে বসিলে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন অনুমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায় না।"(৪)

সীতারামের উত্থান ও পতনের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হইবে মহাপ্রাণ সীতারামের সাধু সঙ্কল্প বুঝিবার ও তদনুসারে কার্য্য করিবার উপযুক্ত লোকাভাব ছিল,—সীতারাম জাগিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু জমিদারগণের মোহনিদ্রা কাটে নাই। শতাধিক বর্ষ মোগল-শাসনে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিকৃত হইয়াছিল, উত্থানের আশা—স্বাধীনতার জ্যোতিঃ তাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় নাই। বলিতে কি সীতারামের সহিতই বঙ্গের হিন্দু জাতির স্বাধীন হইবার শেষ আশা বিলুপ্ত হইল।

সীতারামের জীবনলীলা শেষ হইবার পর তাঁহার বংশধরেরা অনেক দিন জীবিত ছিলেন। প্রথমে নলডাঙ্গার রাজবংশীয়েরা কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ নলদী পরগণা খরিদ করিবার পর যখন সীতারামের বংশধরগণের দুর্গতির সংবাদ পাইলেন, তাঁহাদিগকে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ বলেন, সীতারামের বংশধরগণ মহম্মদপুরে কিছু দিন নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। সীতারামের সাবালক পুত্রগণের মধ্যে শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণ পলায়ন করেন নাই। বামদেব ও জয়দেব দুই জনেই নাবালক ও পলায়নকারীদিগের মধ্যে ছিলেন এবং নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। শ্যামসুন্দরের পৌত্র নিমাই রায়ের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। রাণী ভবানী সুরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণকে কিছু ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন। প্রেমনারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত, তৎপুত্র নবকুমার কান্দি রাজসরকার হইতে প্রথমে ৬০৲ টাকা এবং বৃদ্ধাবস্থায় ৩৬০৲ বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার সহিত সীতারামের বংশ লোপ ঘটে। নবকুমারের ভগিনীবংশ এবং সীতারামের সহোদর লক্ষ্মীনারায়ণের বংশ বিদ্যমান। পূর্ব্বাধ্যায়ে সীতারামের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বংশলতা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে সীতারামের বংশ ও বংশধরের দৌহিত্র-বংশের বংশলতা দেওয়া হইল :—

---

(৪) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত—সীতারাম, ৬৯—৭৯ পৃঃ
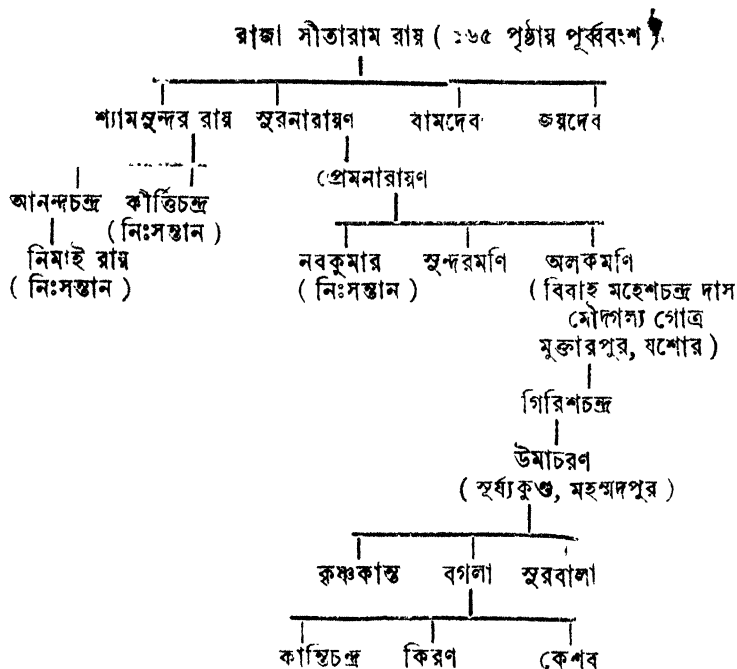
কুণিয়ার কাশ্যপ দাস—বাস চন্দ্রকোণা

কারিকা অনুসারে কাশ্যপ দাসের এগারখানি গ্রাম হইলেও বংশ বৃদ্ধি অনুসারে তাঁহারা বহু গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাশ্যপদাস মধ্যে কুণিয়াবাসিগণ ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সমাজে যেরূপ স্থান ও আদর পাইয়াছিলেন, অন্যান্য গ্রামবাসিগণ সেরূপ সম্মান পান নাই। কুণিয়ার পরেই বাতুর গ্রামব সিগণ সমাজে সম্মানের স্থান পাইয়াছিলেন। এই এগারখানি গ্রামের অতিরিক্ত গ্রামবাসী সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণ অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার কারণ অনেকে সমাজ হইতে দূরে পড়িয়া আত্মপরিচয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কুণিয়ার নামটী বিখ্যাত ছিল বলিয়া অনেকেই কুণিয়ার দাস বলিয়া পরিচয় দিতেন। হয়ত তন্মধ্যে কেহ কেহ গ্রামান্তরবাসী ছিলেন। ঘটকগণ বাৎস্য ও সৌকালীন গোত্রীয়গণের কুলবিবরণ যেরূপ সতর্কতার সহিত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কাশ্যপ দাসবংশ সম্বন্ধে সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। এজন্য অনেক বংশের বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষ পরিচয় না লইয়া মাত্র মুখের কথায় কাশ্যপগোত্র দাসবংশের সহিত সামাজিক ব্যবহার করিতে কুলাচার্য্যগণ নিষেধ করিয়াছেন।

যে সকল বংশ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ। গঙ্গদানী রামদাস হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত পুরুষগণনায় অনেকেরই পর্য্যায়-সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তথাপি যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের নামের সহিত পুরাতন কাগজের মিল হইল সেগুলি প্রকাশ করা হইল। অধিকাংশই মিল করিতে পারা গেল না। ঘটকের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় এবং বহু পুরুষ

প্রধান সমাজ হইতে দূরে অবস্থান হেতু অনেক ঐশ্বর্য্যশালী বংশও স্ব স্ব বংশধারা বিস্মৃত হইয়াছেন। যাঁহারা মূল সমাজে বাস করিয়া থাকেন,—ভূমি, সম্পত্তি, বাটী, পুষ্করিণী ইত্যাদির অংশাদিতে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বপুরুষের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। এই হেতু শাস্ত্রে বলে "স্থানভ্রষ্টাঃ ন শোভন্তে দন্তাঃ কেশাঃ নখাঃ নরাঃ।"

সুধাকরের তৃতীয় পুত্র রামগোপালের ধারায় শ্রীনাথ বিনাম সৃষ্টিধর দাস জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কোনও রাজকর্ম্ম উপলক্ষে তিনি তথায় গিয়া থাকিবেন। এই বংশে কৃষ্ণমোহন দাস সবজজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামলোচন উকীল ছিলেন। রামলোচনের ছয়টী পুত্র মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখর ইঞ্জিনিয়ার এবং যদুনাথ, উপেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও মহেন্দ্র উকীল ছিলেন। দেবেন্দ্র পাটনার গবর্ণমেণ্ট উকীল ছিলেন। ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, শেষে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিয়া সম্প্রতি কার্য্য হইতে অবসর লইয়া পেনসন ভোগ করিতেছেন। চন্দ্রশেখরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্র একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সম্প্রতি দেওঘরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিতেছেন। ইনিও রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই বংশ সম্প্রতি শিক্ষায় ও পদমর্য্যাদায় উন্নতিলাভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ সমাজে আদান-প্রদান আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের আচারের সহিত ইঁহাদের কতকগুলি আচারের মিল না থাকায় প্রধান সমাজের লোকেরা ইঁহাদিগের সহিত আদানপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেন না। সম্প্রতি এই চন্দ্রকোণা বা মণ্ডলঘাট সমাজের অনেক সংস্কার হইয়াছে এবং প্রধান সমাজের অধিবাসিগণ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন বলিয়া, আর আদানপ্রদানে কোনও বাধা হইতেছে না।

চন্দ্রকোণাবাসী মাসলার দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর সরকার ভাগলপুরের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। তিনি প্রথমে রায় বাহাদুর সূর্য্যনারায়ণ সিংহের আশ্রয়ে ভাগলপুরে গিয়াছিলেন। পরে স্বীয় প্রতিভাগুণে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতি স্থিরবুদ্ধি ও মধুরভাষী ছিলেন। ভাগলপুরের কেহও কখনও তাঁহার ক্রোধ দেখেন নাই। তাঁহার আইনের জ্ঞান দেখিয়া বিচারপতিগণ বিস্ময়ান্বিত হইতেন। আইনের অবতার সার্ রাসবিহারী ঘোষ এবং লর্ড সিংহ চন্দ্রশেখর সরকারের সহিত একযোগে বহুবার কার্য্য করিয়াছিলেন। যে সকল মোকদ্দমার ফল সম্বন্ধে তাঁহারা হতাশ হইতেন তাহাতে চন্দ্রশেখরের উপদেশ লইয়া সুফল লাভ করিতে পারিতেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। চন্দ্রশেখরের মধ্যম ভ্রাতা সারদাপ্রসাদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি Polar theory of wealth নামে একখানি অর্থনীতির পুস্তক লিখিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাচরণ সরকারের পাঠ্যাবস্থায় অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তি বিকাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরীক্ষকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। দুর্গাচরণের অকালমৃত্যুতে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ শোকাতুর হইয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর সরকার জেলা বাঁকুড়ায় ২টী ছোট ছোট রাজ-এষ্টেট খরিদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু নগদ অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাঁচটী পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনকালেই তিনটী পুত্র তাঁহার সহিত ওকালতী কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কুণিয়ার কাশ্যপ-দাসবংশ—চন্দ্রকোণা সমাজ
সুধাকর সুত ৫ রামগোপাল (রামলোচন) (১৬৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ।)
৬ কৃষ্ণচন্দ্র লোহারাম হেরম্ব বিদ্যানন্দ কুবের
৭ লক্ষ্মণচন্দ্র গোকুল মাধবানন্দ সিংহেশ্বর
৮ যুগলকিশোর নন্দকিশোর কৃষ্ণ রাধাকিশোর
৯ শিবচন্দ্র রামচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র কুঞ্জবিহারী
১০ ভৈরব বৈদ্যনাথ রামনাথ কাশীনাথ লোকনাথ মহাদেব
১১ লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকান্ত
১২ প্রাণনাথ ভৈরব নীলকণ্ঠ সিতিকণ্ঠ
১৩ শ্রীনাথ (সৃষ্টিধর) ভবনাথ দুর্গানাথ লোকনাথ
১৪ হরিদয়াল রাধাকৃষ্ণ
১৫ বৃন্দাবন অশোক নরহরি রসিক
১৬ কৃষ্ণবল্লভসুত ১৭ মদনগোপাল তৎসুত ১৮ রসিক তৎসুত ১৯ তুলারাম
২০ শোভারাম বাবুরাম
২১ কুড়ারাম তৎসুত ২২ রাধাচরণ
২৩ কৃষ্ণমোহন জগমোহন হরিমোহন
২৪ রাজীবলোচন রামলোচন
২৫ শ্যামাচরণ কৈলাসচন্দ্র ২৫চন্দ্রশেখর যদুনাথ উপেন্দ্র দেবেন্দ্র মহেন্দ্র সত্যেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
২৬বিপিন ২৬কুঞ্জ অমরেন্দ্র রবীন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র গোপেন্দ্র অচলেন্দ্র নৃপেন্দ্র হীরেন্দ্র হরেন্দ্র
(রায়বাহাদুর)
যতীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র সুরেন্দ্র যোগেন্দ্র
২৬মণীন্দ্রনাথ

কুণিয়ার কাশ্যপ দাসবংশ—বাস পোপাড়া সাগরদীঘী

ত্রিলোচন চৌধুরী নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সম্পত্তির সহিত পোপাড়া গ্রামের রকম ॥১১। আট আনা সওয়া এগার গণ্ডা অংশ খরিদ করেন। বাকী অংশ কান্দী প্রভাকর হরিদাস সিংহ বংশীয়দের ছিল, পরে চৌধুরীদের সম্পত্তি বিক্রয় হইলে উক্ত সিংহ মহাশয়গণ বাকী অংশ খরিদ করিয়াছিলেন। এই সূত্রে জমিদার বাবু পুর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের জ্ঞাতি ও শরিক বাবু রামমোহন সিংহ সাগরদীঘীর ঘাট-সংলগ্ন শিলালিপি ও কয়েকটি বুদ্ধ মূর্ত্তি লইয়া গিয়া স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে দিয়' ছিলেন। ত্রিলোচন চৌধুরী দেবসেবা ও দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর গণের অবস্থা হীন হওয়ায় গ্রামে অন্য দেবালয়ে এই সেবা চলিতেছে।

কুণিয়ার কাশ্যপদাস, বাস পদ্মাপার, মালদহ কালীগঞ্জ

সুধাকরসুত ৫ নীলাম্বর দাস তৎসুত ৬ জনার্দ্দন

৭ রামভদ্র | ব্রজবল্লভ | দয়াল (উমানাথ) | গোপীবল্লভ

৭ রামভদ্র → দীনদয়াল | যদুনাথ | ৮ রামনাথ

৮ রামনাথ → ৯ বংশীবদন → ১০ অভিরাম (ভিকুরাম) → ১১ অখিলচন্দ্র → ১২ যুগলকিশোরসুত ১৩ মদনচন্দ্র

১৩ মদনচন্দ্র → ১৪ কৃষ্ণলাল | শিবনাথ | মহানন্দ | নন্দলাল

১৪ কৃষ্ণলাল → ১৫ মিছুচন্দ্র

শিবনাথ → রাখালচন্দ্র | শশী | ১৫ বিধুভূষণ

১৫ বিধুভূষণ → ১৬ ভুজঙ্গভূষণ | তারাপতি

১৬ ভুজঙ্গভূষণ → ১৭ গিরিজা | অতিভূষণ

কুণিয়ার দাসবংশ বাস কালমেঘা

ধরাধর সুত ৪ চন্দ্রকান্ত (১৬৫ পৃষ্ঠার পূর্ব্ববংশ।)

৫ কৃষ্ণরাম → ৬ কমলাকান্ত → ৭ শ্রীনিবাস → ৮ রামকৃষ্ণ → ৯ রামগোপাল → ১০ বাবুরাম তৎসুত ১১ ঠাকুরদাস → ১২ নিমাইচরণসুত ১৩ রাসমোহনসুত ১৪ বৈকুণ্ঠনাথ

১৪ বৈকুণ্ঠনাথ → ১৫ রাখালচন্দ্র | মুরারিমোহন

১৫ রাখালচন্দ্র → ১৬ মুনীন্দ্র | রাধারমণ

মুরারিমোহন → ১৬ ফণীভূষণ | বিধুভূষণ
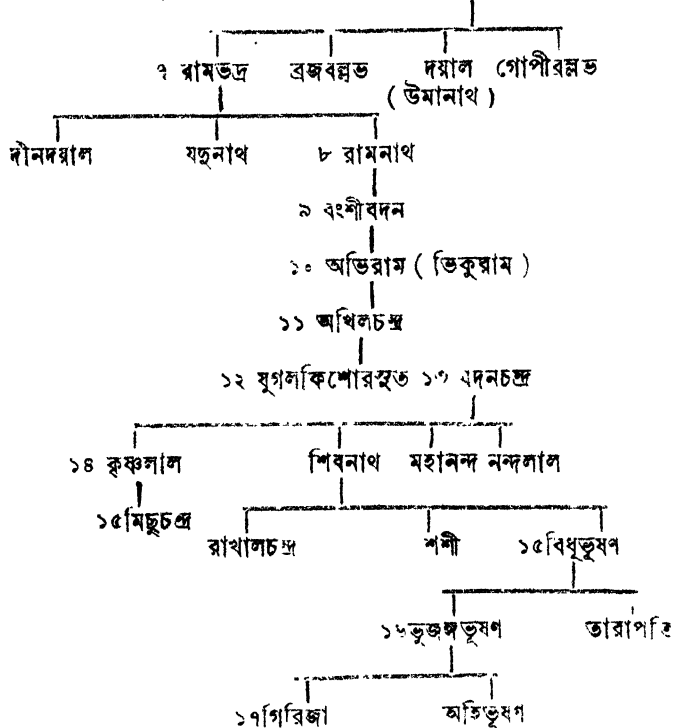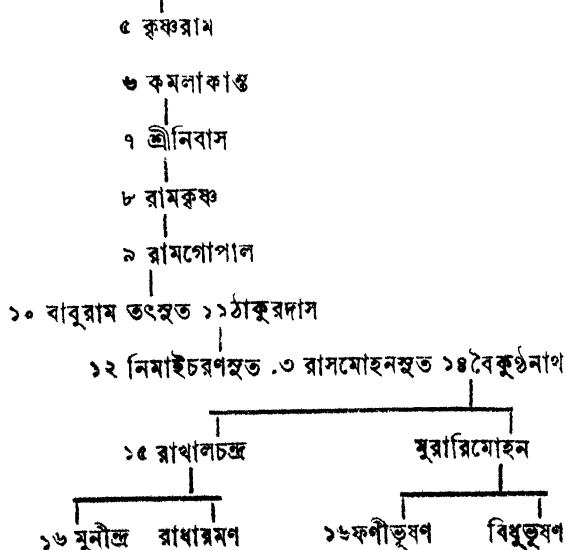
কাশ্যপ দাসবংশ শিবরামের ধারা
গজদানী রামদাসসুত ২ শিবরাম (মাণিক)
৩ শ্রীরাম
৩ রাজারাম
৩ রামকৃষ্ণ
৪ জয়কৃষ্ণ
৪ কুশল (বিনাম হরিদাস)
৫ রাধাকৃষ্ণ
৫ নীলাচরণ
৫ নারায়ণ
৫ গোপাল
নরেন্দ্র
৬ গোপাল
৬ কার্ত্তিক
৬ জয়রাম
৬ কৃষ্ণরাম
৭ রাধানাথ
৭ কৃষ্ণনাথ
৭ রাধাকান্ত
৭ হরিহর
গোপীনাথ
৭ কৃষ্ণদেব
৮ বিশ্ববিহারী
জয়হরি
৮ রামদাস
৮ গোপাল
৮ হরিহর
৯ বিজয়রাম
৯ রামেশ্বর
গোবিন্দরাম
১০ রামমোহন
১০ হরেকৃষ্ণ
কৃষ্ণদাস
প্রসাদদাস
১১ বিহারীদাস
১১ কালীপ্রসাদ
১২ রামকৃষ্ণ
১২ গোলাপ
১২ রামেশ্বর
১২ বিশ্বম্ভর
১২ হরিদেব
জগদানন্দ
১৩ বল্লভীকান্ত
ব্রজকিশোর
১৩ ক্ষুদ্রনারায়ণ
হরিদাস
১৩ ভজগোপাল
হরিচাঁদ
১৩ ইন্দ্র
১৩ মহেন্দ্র
অনুপনারায়ণ
১৪ হরেরাম
১৪ জয়চাঁদ
রামহরি
১৪ পঞ্চানন
শ্যামাচরণ
১৪ জগদ্দুর্লভ
১৫ ভরতচন্দ্র
১৫ রামেশ্বর
১৪ প্যারিলাল
১৪ রাজমোহন
গোলাপ
বেণীমাধব
ক্ষেত্রনাথ
তিনকড়ি
১৬ জগদ্দুর্লভ
রামহরি
প্রসন্নকুমার
শরচ্চন্দ্র
১৭ কৃষ্ণকান্ত
রাজনারায়ণ
পুরুষোত্তম
নীলাম্বর
কেশব
১৬ অক্ষয়কুমার
বংশধর
হটু
১৩ শিবচন্দ্র
মহেশ
দ্বারিকানাথ (নূতনগ্রাম)
রামরাম
ভগবান্
ব্রজবল্লভ
কুলানন্দ
সত্রাজিত
পশুপতি
গোলাপ
১৭ কৃষ্ণকিঙ্কর
কৃষ্ণনাথ
কৃষ্ণকিশোর
১৮ বলরাম
বিহারী

ষোড়শ অধ্যায়

ভরদ্বাজ গোত্র—সিংহ-বংশ

ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ-বংশের যিনি প্রথমে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম পাওয়া যায় নাই। তবে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে যিনি প্রথমে মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম ঘটকের কাগজে ভরদ্বাজ সিংহ লিখিত রহিয়াছে। তিনি আমলাই গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার অন্তর্গত এবং ভাগীরথী হইতে প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

মেলা গোপীনাথপুরের প্রিয়াবংশ

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় গৌড়দেশ প্লাবিত হইয়াছিল তাহার ফলে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে কতকগুলি প্রেমিক ভক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। কুলায়ের ঘোষ ঠাকুর, কান্দরার দাস ঠাকুর, ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বংশ-পরিচয়কালে তাহার কিছু কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমলাই গ্রামবাসী ভরদ্বাজ সিংহের অধস্তন একোনবিংশতি পুরুষ নন্দরাম সিংহ উক্ত মহাপুরুষগণের অন্যতম। তিনিও প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গাভিঘাতে আহত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহচর ও অকৃত্রিম বন্ধু উক্ত গ্রামনিবাসী রাজকুমার চক্রবর্ত্তী বিনাম যজ্ঞেশ্বর সহ একদা দীক্ষাগ্রহণ উদ্দেশ্যে শান্তিপুরনাথ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সন্নিধানে গমন করিয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এই গুরু-পাটে দীক্ষালাভ করিলেও পুরুষ গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন না, স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ইহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে তাঁহার গৃহিনী সীতাদেবীর নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। সীতাদেবীর নিকটে গিয়া তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন আমার শিষ্য হইলে প্রকৃতিভাবে সিদ্ধ হইবে, পুরুষভাবে সিদ্ধ হইতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া দুইজনে সীতার চরণে পড়িয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলে সীতাদেবী কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিলেন, এবং নন্দরাম সিংহের নন্দিনীপ্রিয়া ও যজ্ঞেশ্বরের জঙ্গলীপ্রিয়া নামকরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে স্ত্রীবেশে সীতাদেবীর নিকটে থাকিয়া গুরুসেবা করিয়াছিলেন। (১)

---

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমবয়স্ক এবং সহপাঠী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী 'শ্রীসীতাচরিত' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে নন্দিনীপ্রিয়া ও জঙ্গলীপ্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিত রহিয়াছে। লোকনাথের মাতার নাম সীতা এবং পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ছিল। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী লোকনাথের মাতা সীতাকে 'সই' বলিতেন এবং পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গী ছিলেন। লোকনাথ অদ্বৈত প্রভুর ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। সুতরাং নন্দরাম সিংহ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি নন্দরাম সিংহকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"আর এক কথা কহি শুন সর্ব্বজন। জঙ্গলী নন্দিনী শিষ্য হইল যেমন॥
ক্ষেত্রিকুলে জন্ম এক নাম নন্দরাম। শ্রীকৃষ্ণ অনুষঙ্গতে হয় গুণধাম॥"

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

কিছুকাল এইরূপ সেবা করিবার পরে সীতাদেবী তাঁহাদিগকে যথাইচ্ছা গমন করিতে আদেশ করিলেন। নন্দিনীকে বলিলেন, "তুমি ব্রজে বীরাদেবী ছিলে এবং জঙ্গলীকে বলিলেন তুমি বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবী ছিলে।"

"বৃন্দাবনে বীরাদেবী বৃন্দাখ্যা যা চ সংস্থিতা।
কলৌ ভূতলমাগত্য জন্ম লব্ধা ততঃ পরম্।
নন্দিনী জঙ্গলী নাম্নী শিষ্যেতি পরিকীর্ত্ততে॥"

এক্ষণে তোমরা বনাশ্রয় বা বনিতাশ্রয় করিতে পার।"

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা নন্দিনী ও জঙ্গলীকে কৈলাসে পার্ব্বতীর সহচরী জয়া ও বিজয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা--

"নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নন্দিনীকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন। যথা— আদিখণ্ডে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে--

'নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্য দাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস।"

ভক্তমালা গ্রন্থে তৃতীয় মালা—

"নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতা সহচরী।
পূর্ব্বে যেই শ্রীজয়া বিজয়া অনুচরী॥
যোগমায়া প্রতিবিম্ব উমা মায়া শক্তি।
অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি॥"

প্রেম বিলাস—চতুর্ব্বিংশ বিলাসে—

"সীতা দেবীর দুই দাসী জঙ্গলী নন্দিনী।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি॥
নন্দিনী সেবয়ে শ্রীসীতার শ্রীচরণে।
জঙ্গলী তপস্যা করিতে গেলা বনে॥" ইত্যাদি

উক্ত গ্রন্থে—অর্দ্ধ বিলাসে

"সীতার দাসী জঙ্গলী নন্দিনীর কথা।
জঙ্গলীর তপ মাহাত্ম্য রাজার উদ্ধার সর্ব্বথা॥"

যাহা হউক বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি নন্দিনীপ্রিয়া বা নন্দরাম সিংহকে সীতাদেবীর শিষ ও দাসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে নন্দিনী ও জঙ্গলী ব্রজধামে বীরা ও বৃন্দা এবং কৈলাসে জয়া ও বিজয়া রূপে প্রকট ছিলেন, কিন্তু গৌরলীলা অনুষঙ্গী হইয়া তাঁহারা কেন পুরুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন তাহার কোথাও উল্লেখ নাই, বরং পুরুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে অদ্ভুত উপাখ্যান বর্ণিত রহিয়াছে।

জঙ্গলীপ্রিয়া সীতাদেবীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া গিয়া জেলা মালদহের অন্তর্গত একটী জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা আরম্ভ করেন। একদা গৌড়েশ্বর (হোসেন সাহ) মৃগয়া উপলক্ষে বন-মধ্যে গিয়া একটী সুন্দরী রমণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া নারীবেশে একটি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিজেকে স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন একটি স্ত্রীলোক আনিয়া পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন উক্ত ব্যক্তি প্রকৃতই স্ত্রী। গৌড়েশ্বর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে—

"রাজা বোলে তপস্বিনী তুমি নারী না পুরুষ।
জঙ্গলী বোলে নারী আমি না হই পুরুষ॥
নারী জনে নারী দেখে পুরুষে পুরুষ।
কারে কোন কালে আমি না কহি পরুষ॥
সজ্জনে আমারে নারী দেখে সর্ব্বক্ষণ।
মা, মা, বলিয়া মোরে করে সম্ভাষণ॥
পুরুষে পাইলা মোরে দেখয়ে প্রকৃতি।
মন দুষ্ট হৈলে দেখে পুরুষ আকৃতি॥"

রাজা মাতৃ-সম্বোধন করিয়া জঙ্গলীর পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। জঙ্গলীপ্রিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। রাজা উক্ত বন মধ্যে একটী দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। জঙ্গলীপ্রিয়া তথায় বিগ্রহসেবা স্থাপন করিলেন। উক্ত স্থান জঙ্গলী-টোটা নামে এখনও খ্যাত রহিয়াছে। শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে এখনও উক্ত সেবা চলিয়া আসিতেছে।

নন্দরামসিংহ বা নন্দিনীপ্রিয়া সীতাদেবীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বরেন্দ্রভূমে তুলসীগঙ্গা নদীতটে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। উক্ত স্থান পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে বগুড়া জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের আক্কেলপুর ষ্টেসন হইতে প্রায় ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। একদা রাত্রিকালে স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি প্রত্যুষে নদীতটে গমন করেন এবং তথায় শ্রীশ্রীগোপাললাল ঠাকুরের ও তৎসহ শ্রীমতীর এবং অষ্ট সখীর শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। শ্রীবিগ্রহ গুলি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মত পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট। নন্দরাম ঐ গুলির অঙ্গরাগ করাইয়া বহু যত্নে সেবা প্রকাশ করিলেন। উক্ত স্থানের জমিদার তাহিরপুর রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ নন্দরাম সিংহকে দেব-মন্দির নির্ম্মাণ ও দেবসেবা পরিচালন জন্য গ্রামটী নিষ্কর দান করেন। তদবধি গ্রামটীর নাম হইল গোপালপুর। তথায় মন্দির ও পুষ্করিণী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া নন্দরাম সিংহ দেবসেবা পরিচালন করিতে লাগিলেন। উক্ত স্থানটী নদী সমীপ ছিল। একদা বন্যার প্লাবনে একটী সখী মূর্ত্তি ভাসিয়া যাওয়ায় নন্দরাম উক্ত গোপীনাথপুরের বাস ত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে গোপালপুরে গিয়া বাস করিলেন ও তথায় দেবসেবা পরিচালন করিতে লাগিলেন।

নন্দরামের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এমন কি অনেক ব্রাহ্মণও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। একদা মুসলমান নৃপতি 'সহস্র লস্কর সঙ্গে উষ্ট্র ঘোড়া হাতি' লইয়া উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। নন্দরামের প্রভাবে অসূয়াপরাবশ হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বর (হোসেন শাহ) নিকটে গিয়া জানাইলেন নন্দিনীপ্রিয়া 'পুরুষ হইয়া স্ত্রীমূর্ত্তি ধরে'। রাজসকাশে আনীত হইয়া 'নন্দিনী কহেন আমি হই স্ত্রী আচরি'। তখন তাহার বস্ত্র খুলিবার আদেশ হইলে নন্দিনী নিষেধ করিলেন। রাজপুরুষগণ বস্ত্র শেষ করিতে পারিলেন না। 'আচম্বিতে উরু বাহি নাম্বয়ে রুধির।' রজোলক্ষণ পাইয়া নৃপতি চিত্তে অস্থির হইলেন এবং অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক 'তিন গ্রাম ছাড়ি দিলেন লিখে দানপত্র। স্থাপিলেন গোপীনাথের শ্রীমন্দির তত্র।" এইরূপে বাদশাহ হোসেন শাহের আদেশে ও ব্যয়ে গোপালপুরে গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মিত হইল ও তিনগ্রাম নিষ্কর ভূমি লাভ হইল। এই গ্রামেরও গোপীনাথপুর নাম রাখা হইল। উত্তর কালে দোলপূর্ণিমার মেলা উপলক্ষে এই গ্রামের নাম মেলা-গোপীনাথপুর হইয়াছে। নন্দিনী-প্রিয়ার অলৌকিক শক্তির কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইল এবং গোপীনাথ দর্শনের জন্য বহু যাত্রী আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহিরপুরের রাজার ও হোসেন শাহ বাদসাহের দেওয়া সম্পত্তি লাভের পরে দিনাজপুর, বলিহার, পুঠিয়া প্রভৃতি রাজ-এষ্টেট হইতেও বহু সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছিল। উত্তর কালে নাটোর, মুক্তাগাছা প্রভৃতি রাজ-এষ্টেট হইতেও শ্রীশ্রীগোপীনাথের জন্য সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মেলা-গোপীনাথপুর মৌজার উপর রাজস্ব ধার্য্য হয়। সবাইতগণ কানও কালে বৈষয়িক ছিলেন না, নিয়ত সেবা কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিতেন। শিষ্যগণ ও দেশস্থ সাধারণ ভদ্রলোকগণ মিলিত হইয়া বহু চেষ্টা করিবার পর স্থির হয় যখন রাজস্ব ধার্য্য হইয়া গিয়াছে তখন তাহা বাদ পড়িতে পারে না। তবে শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবার জন্য রাজস্ব সমপরিমাণ টাকা প্রতিবৎসর কালেকটরী হইতে দেওয়া হইবে। কিন্তু কেহ উক্ত টাকা লইবার চেষ্টা না করায় কয়েক বৎসর পরে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। পরে শিষ্যগণের ও সাধারণ লোকের পুনর্ব্বার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট সালিয়ানা ৭২৮৶০ টাকা তের আনা শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবার জন্য রাজসাহী কালেকটরী হইতে দিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে উক্ত টাকা বৎসর বৎসর আদায় হইয়া আসিতেছে। এখন বগুড়া-কালেকটরী হইতে উক্ত টাকা পাওয়া যায়।

নন্দরাম সিংহের স্ত্রী পুত্রাদি ছিল না। জেলা বগুড়ার অন্তর্গত বড়তারা গ্রামের সৌকালীন ঘোষবংশের একটী বালককে একদা সর্পে দংশন করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে মৃত বালকটীকে একটী মঞ্জুষার উপর স্থাপন করিয়া তুলসীগঙ্গা নদী বক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। নন্দরাম উক্ত নদীতে স্নান করিতেছিলেন। মঞ্জুষাস্থিত বালকের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি তাহাকে উঠাইয়া লইয়া পুনর্জ্জীবিত করেন ও দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক দেবসেবার কার্য্যে নিয়োজিত করেন। বালকের আত্মীয়বর্গ সংবাদ পাইয়া মেলা-গোপীনাথপুরে আগমন

করেন এবং বালকটীকে নন্দরামসিংহকে দান করিয়া যান। নন্দরাম তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই দত্তকপুত্রটীও দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনিও একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে শিষ্য করিয়াছিলেন। বহুপুরুষ এইরূপ পুত্র বা শিষ্য দ্বারা সেবা পরিচালনের পর কোনও এক সেবাইত দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই অবধি পুত্র বংশ চলিতেছে। দারপরিগ্রহ করিলেও ইঁহারা স্ত্রীবেশে রহিতেন এবং স্বহস্তে নারায়ণ ও শ্রীবিগ্রহদিগের সেবা করিতেন এবং স্বয়ং রন্ধন করিয়া অন্নভোগ দান করিতেন। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই উক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। রাধাবল্লভপ্রিয়া কিছুকাল ঐরূপ সেবা পরিচালন করিবার পর ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবার ও ভোগ রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তদবধি প্রায় ৪।৪৫ বৎসর হইতে ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবা হইতেছে। বর্ত্তমান পূজারীগণ আসাম দেশীয় ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জল আচরণীয় জাতি নন্দিনীপ্রিয়ার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। আজকাল আর ব্রাহ্মণশিষ্য দেখা যায় না। অন্য অন্য জাতি মধ্যে বহু গণ্যমান্য শিষ্য রহিয়াছেন। মেলা গোপীনাথপুরের চতুর্দ্দিকে ৫।৭ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত গ্রাম সমূহের অধিবাসিবর্গ নন্দিনীপ্রিয়ার বংশধরগণকে 'ঠাকুর মহাশয়' বলিয়া থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কতকগুলি সংস্কার এদেশের লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে।(১) এজন্য কোনও গৃহস্থের গৃহে দুগ্ধ, ফল, মূল, তরকারী, শাক ইত্যাদি নূতন বা প্রথম হইলেই শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবার জন্য না দিয়া কেহ তাহা খায় না। অনেকে গাভীর প্রথম বৎসতরীটা শ্রীশ্রীগোপীনাথকে সমর্পণ করে। এইরূপে শ্রীশ্রীগোপী-নাথের বহু গাভী সংগৃহীত হইয়াছে। এখান হইতে প্রসাদ লইয়া গিয়া হিন্দু ও মুসলমান শিশুদিগের অন্নপ্রাশন ও নবান্ন কার্য্য সম্পন্ন করে। প্রসাদকণিকা পাইলে সকলেই কৃতার্থ।

এখানকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে মুসলমানপ্রধান স্থান হইলেও এখানে ধর্ম্মদ্বেষ বা গোহত্যা নাই।

এই মেলা-গোপীনাথপুর একটী সার্ব্বজনীন প্রেমের রাজ্য। সকলেই শ্রীশ্রীগোপীনাথের ভাণ্ডারের অতিথি। দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী হইতে অসীম ক্ষমতাবান্ রাজপুরুষ পর্য্যন্ত

---

(১) গোপীনাথপুরের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামবাসী জনৈক সঙ্গতিপন্ন মুসলমানের চক্ষুরোগ হওয়ায় বহুদিন কষ্ট পাইতেছিলেন। সন ১৩৩৪ সালে একরাত্রি তিনি স্বপ্নে শ্রীশ্রীগোপীনাথের আদেশ পাইয়াছিলেন যে পুরাতন গোপীনাথপুরের পরিত্যক্ত মন্দিরসংলগ্ন পুষ্করিণীতে স্নান করিলে তাঁহার চক্ষুপীড়া আরোগ্য হইবে। বলাবাহুল্য তদনুসারে তিনি উপর্য্যুপরি তিন শুক্রবার তথায় স্নান করিবার পর চক্ষুরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। এক্ষণে বহুলোক নানা ব্যাধি আরোগ্য জন্য শুক্রবারে উক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া থাকে। কেহ কেহ আরোগ্যলাভও করিতেছে।

সকলকেই এই ভাণ্ডারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টানাদি ধর্ম্মভেদ নাই। প্রসাদ পাইতে কাহারই আপত্তি নাই।

দেবসেবার নিত্য ভোগের জন্য দিনে অন্নের অর্দ্ধমণ এবং পায়সের আড়াইসের আতপ চাউলের এবং তদনুপযোগী ডাল তরকারী ইত্যাদির বন্দোবস্ত রহিয়াছে। রাত্রিকালে ফল মূল দুগ্ধ ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা আছে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে রাত্রিকালে লুচি, পায়স ও পিষ্টকাদি এবং দিনে অন্নাদির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দিনে সমস্ত প্রসাদ অতিথিদিগকে দিয়া সেবাইৎদিগের জন্য একজনের উপযুক্ত প্রসাদ রাখা হয়। তাহাদিগের জন্য অন্দরে পৃথক্ রন্ধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অতিথির সংখ্যা অধিক হইলে অন্দর হইতে অন্ন আনিয়া তাঁহাদিগকে দিতে হয় অথবা সিধা দিতে হয়।

চাষের ধান্য হইতে অন্ন এবং সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ হাট হইতে তরকারীর ব্যবস্থা হয়। কে কোথা হইতে দুগ্ধ আনে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং দেবসেবার কোনও অসুবিধা নাই। উপরন্তু নিত্য আবশ্যকীয় দুগ্ধ, ছানা, মাখন ইত্যাদি যোগাইবার জন্য গোয়ালার নিষ্কর জমি, নিত্য ভোগ রন্ধনের মৃৎপাত্র জন্য কুম্ভকারের জমি চারি জন পূজারী ব্রাহ্মণের জমি, নিত্য সঙ্কীর্ত্তন জন্য আট জন কীর্ত্তনীয়ার জমি, দুই জন পরিচারকের জমি, বাসন মাজিবার জন্য দুইজন ভৃত্যের জমি ইত্যাদি জমির বন্দোবস্ত থাকায় দেবসেবার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ হয় না।

রাধাবল্লভপ্রিয়ার দুই পুত্র গোবিন্দবল্লভ এবং কৃষ্ণবল্লভ বিশেষ উৎসাহী এবং সামাজিক লোক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ফতেসিংহ সমাজে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোবিন্দবল্লভ তিনটী নাবালক পুত্র রাখিয়া সন ১৩১৫ সালে পরলোকগমন করেন। কৃষ্ণবল্লভ ভ্রাতুষ্পুত্র গুলিকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তিনি তিনটী ভ্রাতুষ্পুত্র এবং চারিটি ভ্রাতৃকন্যার বিবাহ সমাজের প্রধান প্রধান ঘরে দিয়াছিলেন। তাঁহারও ২টী কন্যার বিবাহ ভাল ঘরেই দিয়াছেন। একটী পুত্র এবং দুইটী বিবাহিতা ও একটী অবিবাহিতা কন্যা রাখিয়া সন ১৩৩৪ সালের কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণবল্লভপ্রিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। গোবিন্দবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপেন্দ্রবল্লভ উচ্চশিক্ষিত এবং বি, এল, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। মধ্যম রেবতীবল্লভ বিষয়কার্য্য দেখা শুনা ও সাধারণ হিতকর কার্য্য লইয়া থাকেন। কনিষ্ঠ ব্রজবল্লভ জ্যেষ্ঠদিগের নির্দ্দেশানুরূপ কার্য্য পরিদর্শন করেন। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রামকৃষ্ণ অল্প বয়স্ক। তিনি স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

বাদশাহ হোসেন সাহের আদেশে নির্ম্মিত মন্দিরটীর কারুকার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে চূড়ার অগ্রভাগ ৬০।৬১ হাত উচ্চ ছিল। নাটমন্দির ও সিংহদ্বারে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত ইষ্টক ছিল। সন ১৩০৪ সালে ভীষণ ভূমিকম্পে সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছে। কিছু কিছু চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এক্ষণে মাটীর দেওয়ালের উপর টিনের আচ্ছাদন দেওয়া একটী গৃহে দেবসেবা পরিচালিত হইতেছে।

কৃষ্ণবল্লভপ্রিয়া ভগ্ন মন্দিরটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু বহু ব্যয়সাধ্যব্যাপার বলিয়া হঠাৎ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। উপরন্তু সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর মধ্যে অনেকগুলি সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাকে বহু সহস্র অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য বৎসর বৎসর মন্দির নির্ম্মাণ জন্য কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রায় ১০ লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত ও কিছু কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ ও বহুব্যয়ে একজন সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা মন্দিরের নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহার মৃত্যুকালীন কামনাপূর্ণ জন্য মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে শুনা যায়।

দোল পর্ব্ব উপলক্ষে গোপীনাথপুরে একটী মেলা হইয়া থাকে। কৃষ্ণবল্লভ উক্ত মেলা স্থানে জলকষ্ট নিবারণ জন্য বহুসংখ্যক নলকূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একজন হেল্‌থ্‌-অফিসার, একদল পুলীশ ফৌজ এবং একজন রাজপুরুষ ১৫ দিন কাল এই মেলায় উপস্থিত থাকেন। তাঁহাদিগের যাবতীয় ব্যয় সেবাইৎগণকে বহন করিতে হয়।

শ্রীশ্রীগোপীনাথের সহিত সেবিত কৃষ্ণ ও বলরাম বিগ্রহ প্রতিবৎসর মাঘ মাসে একবার করিয়া পুরাতন গোপীনাথপুরের মন্দিরের ভিটায় গিয়া বনভোজন করিয়া থাকেন। দোল উপলক্ষে ঠাকুর গ্রামের দক্ষিণ মেলা স্থানের মন্দিরে গিয়া ৭ দিন তথায় অবস্থান করেন। রাসযাত্রা উপলক্ষে রাসবাড়ী ও রথযাত্রা উপলক্ষে পিত্তল নির্ম্মিত সুবৃহৎ রথে গুণ্ডিচাবাড়ী যাইবার ব্যবস্থা আছে।

দর্শন উপলক্ষে অনেক বড় বড় রাজপরিবারের এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ এখানে আসিয়া সেবাইৎগণের পরিবার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বহু ইষ্টকালয় রহিয়াছে, কিন্তু সেবাইৎগণের বাসের চত্বর বাটীর দেওয়ালের ঘর কোনওটী টিনের চাল কোনওটী বা খড়ের চাল। সম্ভবতঃ ইষ্টকালয়ে বাস করিলে চিত্তে রাজসিক ভাব আসিতে পারে বলিয়া পরম বৈষ্ণব সেবাইৎগণ স্বীয় পরিবারবর্গের বাসের জন্য মৃত্তিকার ঘরের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহাদের বাড়ীতে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী ছোট ডাক্তারখানা ও একটী ডাকঘর রহিয়াছে। অতিথির আশ্রয় জন্য অনেকগুলি ঘর আছে।

এই সেবাইৎগণের পূর্ব্বতন পুরুষগণের রচিত গ্রন্থাদি ও বাদশাহী সনদ ও জমিদারদিগের দানপত্র ইত্যাদি একখানি গোগাড়ী বোঝাই কাগজ বগুড়া জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ইতিহাস লিখিবার উদ্দেশ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অকালমৃত্যু হওয়ায় সেগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

ভরদ্বাজসিংহ হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত এই বংশের বংশলতার একটী নকল আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আমাদিগের হস্তগত না হওয়ায় উপস্থিত যতদূর পাওয়া গেল দেওয়া হইল।
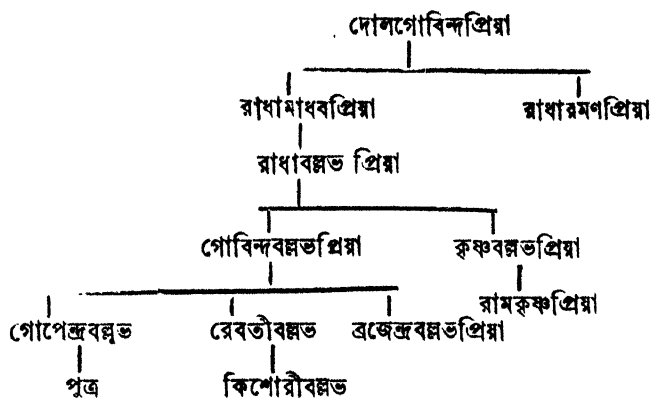
ভরদ্বাজগোত্র দাস বংশ

ভরদ্বাজগোত্রীয়গণ সর্ব্বত্রই সিংহ উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে জেলা বর্দ্ধমান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মোস্তফাপুরবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয়গণ নিজদিগকে দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে একজনের নাম নয়নদাস ছিল। তিনি নবাব দরবারে কর্ম্ম করিয়া সহরমজুমদার উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই নয়নদাস হইতেই ইহাঁরা দাস বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। পরে এই বংশ রায় উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। এই বংশে স্বরূপচন্দ্র দাস বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর দেওয়ানী পদে কর্ম্ম করিয়া বহু বিত্ত ও সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের উক্ত সম্পত্তিভোগের সুযোগ ঘটে নাই। অধিকাংশ সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

ভরদ্বাজগোত্র—নয়নদাস সহর মজুমদার বংশ

নয়নদাস, তৎসুত বীর হাম্বির দাস, তৎসুত নীলাম্বর দাস, তৎসুত লক্ষ্মণচন্দ্র দাস,

গৌরাঙ্গ দাস, তৎসুত নন্দকিশোর

বিজয়রাম রামচন্দ্র বিশ্বনাথ

বলরাম

যোগাদ্যাচরণ কৃষ্ণচন্দ্র গোলোক রূপচন্দ্র অনুপচন্দ্র তিলকচন্দ্র স্বরূপচন্দ্র রায় গোবিন্দচন্দ্র গোপালচন্দ্র

হলধর কালীচরণ রামপ্রসাদ মথুরানাথ

নীলমাধব

লক্ষ্মীনারায়ণ মহেন্দ্রনাথ

রামকুমার গদাধর গোকুলচন্দ্র দ্বারিকানাথ

নকুড়চন্দ্র

রাধামোহন রামলোচন রামনারায়ণ প্যারীলাল মতিলাল
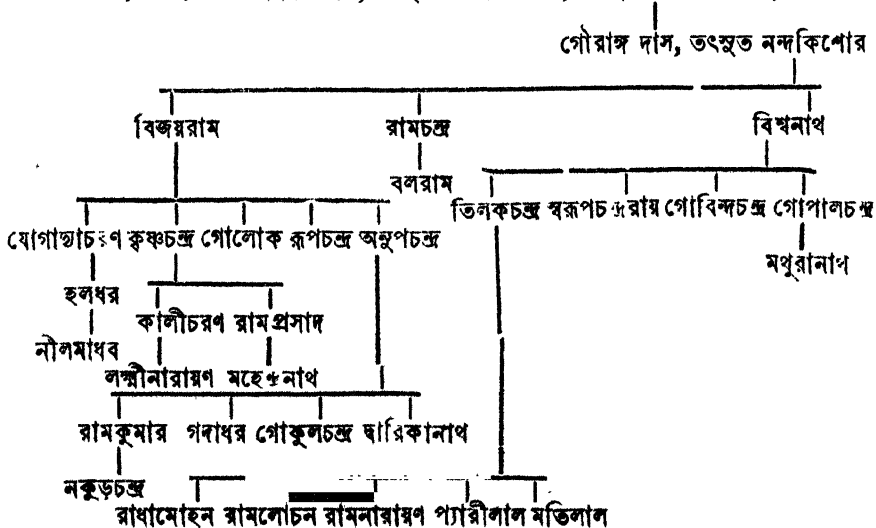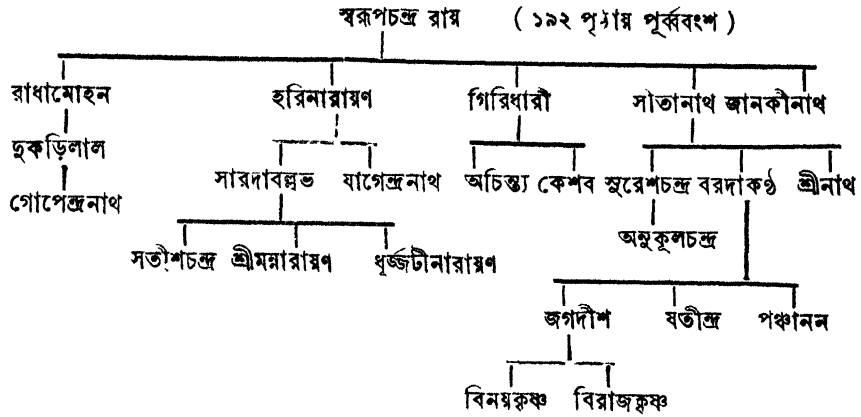
ভরদ্বাজগোত্রীয় গোপাল দাস নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া সহর-মজুমদার উপাধি পাইয়াছিলেন। নয়নদাস সহরমজুমদারের ন্যায় ইনিও দাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। জেলা মালদহে স্বনামে গোপালপুর নামে একটী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার খোদিত দীর্ঘিকা রহিয়াছে। সম্প্রতি এই বংশের এক ধারা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাহাতাগ্রামে বাস করিতেছেন।

গোপালদাস সহর মজুমদার
কৃষ্ণনাথরায়
রামমোহন সুত ব্রজকিশোর
চিন্তামণি রাসবিহারী
শচীনন্দন সাধুচরণ জনার্দ্দন রাধানাথ সার্থকচন্দ্র
পরীক্ষিৎচন্দ্র গোবিন্দপ্রসাদ নীলাচল ভুবনমোহন
পঞ্চানন জগদ্দুর্লভ গুরুপ্রসাদ রামানন্দ
নবকৃষ্ণ
ঠাকুরদাস রামলোচন রাজীবলোচন নীলমোহন
কার্ত্তিকচন্দ্র
রাখালদাস কেশবনারায়ণ শ্রীনারায়ণ বিহারীলাল প্যারীলাল রসিকলাল বনোয়ারীলাল ব্রজলাল
চারুচন্দ্র প্রভাসচন্দ্র শরচ্চন্দ্র জ্যোতিষচন্দ্র

সপ্তদশ অধ্যায়

মৌদ্গল্য-গোত্র করবংশ
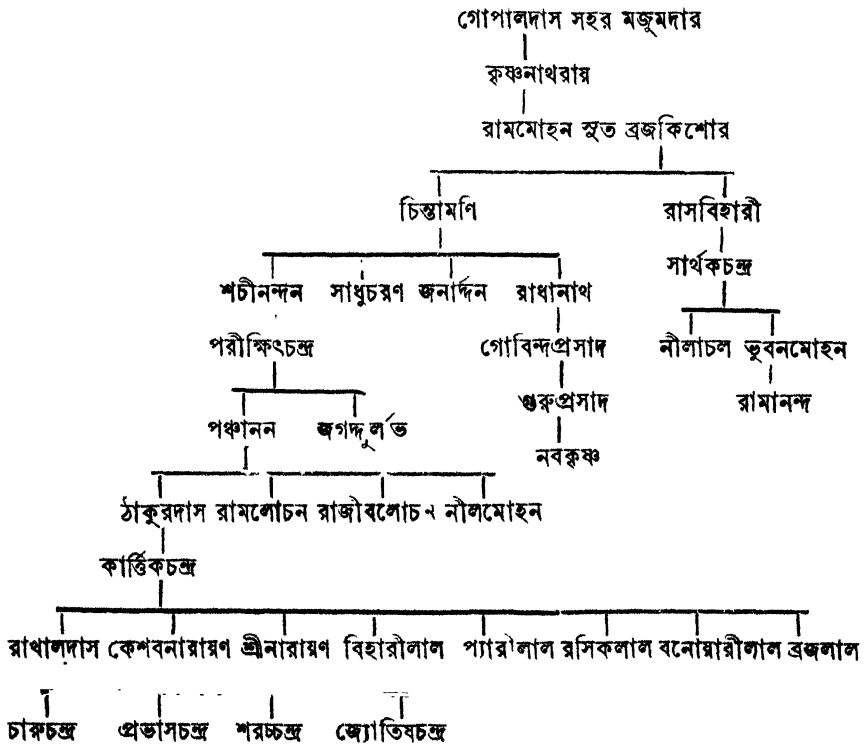
উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে যেরূপ কাশ্যপগোত্র দুই ঘর অর্থাৎ শ্রীকর্ণ সম্প্রদায়ভুক্ত কাশ্যপ-গোত্রীয় দত্ত এবং গৌড় কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় দাস, সেইরূপ মৌদ্গল্য গোত্রীয় দুই ঘর রহিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকর্ণ সম্প্রদায়ভুক্ত মৌদ্গল্য দাস এবং গৌড় কায়স্থ-সম্প্রদাভুক্ত মৌদ্গল্য কর। এই কর উপাধিযুক্ত মৌদ্গল্য গোত্রীয়গণের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যিনি প্রথমে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর। কোনও কোনও কাগজে তিনি কেবলরাম কর নামেও পরিচিত রহিয়াছেন। তাঁহার বাসস্থান থানা ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী আলুগ্রাম। ইঁহার অধস্তন পুরুষগণ জেলা মালদহের গিলাহবাটী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তিনি ভাতিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। অনেক সদ্বংশীয় কায়স্থকে মালদহ জেলায় লইয়া গিয়া বাস করাইয়াছিলেন, এজন্য ভাতিয়া করের সমাজ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই বংশে পুরুষোত্তম করের দুই পুত্র মধ্যে ভরদ্বাজ ঘোড়াঘাট মধ্যে বাইস-হাজারী বা বাহিচা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে কান্তনাথ কর কর্ম্ম উপলক্ষে দিনাজপুর সহরে বাস করিতেন। কান্তনাথের পৌত্র কার্ত্তিকচন্দ্র দিনাজপুরে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের পুত্রগণ এক্ষণে তথায় বাস করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোক্ষদাপ্রসাদ বিন ম গোষ্ঠবিহারী জমীদারী সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ ওকালতী করেন।

পুরুষোত্তমের দ্বিতীয় পুত্র রামগোপাল গিলাহবাটীতেই বাস করিতেন। এই বংশের দৌহিত্র সূত্রে কেহ কেহ এক্ষণে গিলাহবাটীতে বাস করিতেছেন, কিন্তু তথায় আর করবংশ কেহ নাই। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের সংখ্যা ক্রমশঃই অল্প হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ভরদ্বাজ ও কর বংশীয়গণের সংখ্যা যে পরিমাণে হ্রাস হইতেছে, তাহাতে কিছুদিন পরে লোপ হইবার আশঙ্কা হইয়াছে।

মৌদ্গল্য করবংশ

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (বিনাম কেবলরাম) কর
প্রজাপতি
বীরুদাস
ফেরুদাস
ভূপতি
সত্যবান্
কুলানন্দ
কেশব(কয়া ও আসুগ্রাম)
পশুপতি (গণকর মির্জাপুর)
কবি (রামকৃষ্ণ)
হরি(রাধাকিশোর
পুরুষোত্তম
কানুরাম
ভরদ্বাজ
রামগোপাল
জিতরাম
ভাস্কর
ভবানী
মহাদেব
মহেশ্বর
মাণিক
লক্ষ্মণ
কুবের
শিবচন্দ্র
দিবাকর
সত্যজিৎ
গদাধর
দুর্ল্লভরাম
রাজারাম
হরিবল্লভ
মেদিনীকর
পঞ্চানন
কৃষ্ণনারায়ণ
হরিনারায়ণ
মণিরাম
ঘনশ্যাম
শ্যামসুন্দর
প্রাণনাথ
রঘুনন্দন
কৃষ্ণপ্রসাদ
রাজবল্লভ
লালসুন্দর
মাণিক
রামনাথ
জগন্নাথ
কান্তনাথ (বাস দিনাজপুর সহর)
যদুরাম
নবকান্ত
দুর্গাপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ
সনাতন
গৌরসুন্দর
ভবানী
গোবিন্দ
সারদা
কার্ত্তিক
মহেশচন্দ্র
বরদা
চণ্ডীপ্রসাদ
মোক্ষদাপ্রসাদ
হরিদাস
শিবপ্রসাদ
সত্যনারায়ণ
বগলাপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ

অষ্টাদশ অধ্যায়

মিত্রাদি ৬ ঘরের ভাবনির্ণয় ও বাসস্থান।

বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্রবংশের ভাব প্রধান অপেক্ষা।৶০ আনা হানি।

গ্রাম	মহাভাব	ভাব	সুসন্তান	সন্তান	সংকেষ্টা	কেষ্টা
মেহগ্রাম	১	০	০	০	০	০
বেলুন	১	০	০	০	০	০
ডুঘা	১	০	০	০	০	০
নৈহাটী	০	০	০	০	০	০
খাজুরডিহি	০	০	০	০	০	০
কাচনা	০	০	০	০	০	০

কাশ্যপ গোত্রীয় দত্তবংশের ভাব প্রধান অপেক্ষা ॥/০ নয় আনা হানি।

গ্রাম	মহাভাব	ভাব	সুসন্তান	সন্তান	সংকেষ্টা	কেষ্টা
বরুটিয়া	০	১	০	০	০	০
দত্তবাটী	০	১	০	০	০	০
ক্ষেত্রডাই মনোহরপুর	০	০	০	১	০	০
ঠেঙ্গাপুর	১	০	০	০	০	০

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ঘোষবংশের ভাব প্রধান অপেক্ষা ॥৴০ দশ আনা হানি।

গ্রাম	মহাভাব	ভাব	সুসন্তান	সন্তান	সংকেষ্টা	কেষ্টা
দক্ষিণখণ্ড	১	০	০	০	০	০

কাশ্যপ গোত্রীয় দাসবংশের ভাব প্রধান অপেক্ষা ॥৴০ দশ আনা হানি।

গ্রাম	মহাভাব	ভাব	সুসন্তান	সন্তান	সংকেষ্টা	কেষ্টা
বাতুর	১	০	০	০	০	০
কুশিয়া	১	০	০	০	০	০

ভরদ্বাজ গোত্রীয় সিংহবংশের ভাব প্রধান অপেক্ষা ৸০ বার আনা হানি।

গ্রাম	মহাভাব	ভাব	সুসন্তান	সন্তান	সংকেষ্টা	কেষ্টা
আমলাই	১	০	০	০	০	০

মৌদ্গল্য গোত্রীয় করবংশের ভাব প্রধান অপেক্ষা ৸০ বার আনা হানি।

গ্রাম	মহাভাব	ভাব	সুসন্তান	সন্তান	সংকেষ্টা	কেষ্টা
আলুগ্রাম	১	০	০	০	০	

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী সভার পক্ষ হইতে গণনাকালে
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ঘোষ, কাশ্যপ গোত্রীয় দাস, ভরদ্বাজ গোত্রীয়
সিংহ এবং মৌদ্গল্য গোত্রীয় করবংশের বাসস্থান।

শাণ্ডিল্য ঘোষবংশ

১। দক্ষিণখণ্ডের ঘোষ—জেলা বর্দ্ধমান—মাতোঞ্চা, শিরপাড়া, মৌগ্রাম, মাগাতা, মোহনপুর ও কাশীয়ারা। জেলা মুর্শিদাবাদ—সুঁন্দীপুর, কান্দী সন্তোষ সিংহের বেড়, মামুদপুর, আলুগ্রাম, ভোল্‌তা, মাসলা, কামনগর, প্রসাদপুর, বংশবাটী, বোখারা, তাঁতিবিরোল, জোতকমল, বুন্ধাইপাড়া, কেন্দুয়া ও সাঁপলদহ। জেলা বীরভূম—ময়নাডাল ও রূপপুর। জেলা সাঁওতাল পরগণা—গোয়ালখোর। জেলা ভাগলপুর—চৌকী নিয়ামৎপুর ও কলাপুর। জেলা নদীয়া—কুষ্ঠিয়া ও চিলেখালি। জেলা মেদিনীপুর—যশরা, খড়কীকাঁথি ও বাসুদেবপুর। জেলা বাঁকুড়া—বৈতল, ডিঙ্গাল ও পরীক্ষাপাড়া। কলিকাতা—অপার সারকুলার রোড। জেলা পাটনা—ভিখনাপাহাড়ী (বাঁকীপুর)।

২। জলস্থতির ঘোষ—জেলা বর্দ্ধমান—নূতন গ্রাম ও জিয়ারা। জেলা বাঁকুড়া—পরীক্ষাপাড়া ও গাঁতি কৃষ্ণপুর।

৩। মুকুন্দীর ঘোষ—জেলা বর্দ্ধমান—পানুহাট। জেলা বীরভূম—খয়রাশোল।

কাশ্যপ দাসবংশ

১। কুনিয়ার দাস—জেলা মুর্শিদাবাদ—পাঁচথুপী দক্ষিণপাড়া, গড্ডা, পলষণ্ডা, ভরতপুর, খয়রা, কামনগর, বিপ্রশিখর, বরঞা, নারায়ণপুর, বংশবাটী, পোপাড়া, মণিগ্রাম, খৈরাটী, ঘোড়শালা, কালমেঘা, জালালপুর ও কেন্দুয়া। জেলা বর্দ্ধমান—মুরুন্দী, পাণ্ডুগ্রাম, রাজুর, লাখুরিয়া ও দীননাথপুর। জেলা বীরভূম—রতনপুর, কলহপুর, কাণাচি, তালজ্ঞা, ব্রজের গ্রাম, দুর্গাপুর, আমরা পালন, মৌবুনা, বাতিকার, গোহালিয়ারা, হেতমপুর, গড়গড়া, কুসুমযাত্রা, ওলকুণ্ডা, মহুলা ও শিবগ্রাম (সিউগ্রাম)। জেলা সাঁওতাল পরগণা মহারাজপুর। জেলা যশোহর—হরিহরনগর। জেলা দিনাজপুর—খামকয়া ও আলিগড়া। জেলা পূর্ণিয়া—লুতিপুর। জেলা নদীয়া—ধর্ম্মদহ, রঘুনাথপুর, মথুরাপুর, পলাশীপাড়া ও বেতাই। জেলা মালদহ—গিলাহবাটী, আইহ, গোপালপুর,

কুতুবপুর, বাচামারী, মালদহ শর্ব্বরী, কামারডা, নশীপুর, পুখুরিয়া, শিবগঞ্জ, কালীগঞ্জ, কুকুরবাড়ী চক দর্পনারায়ণপুর, দরবারপুর, কমলপুর ও নঘরিয়া। জেলা মেদিনীপুর—চন্দ্রকোণা মানপুর, চেতো রাজনগর ও কাঁথি আঠিলাগড়ী। জেলা বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুর কাদাকুলী বিশ্বাসপাড়া, বিষ্ণুপুর কাদাকুলী, দ্বারিকা, লোধনা, অযোধ্যা ও বৈতল।

২। মাসলার দাস—জেলা বীরভূম—পরিহারপুর ও কানাচি। জেলা মুর্শিদাবাদ—মাসলা, ভরতপুর, সুঁদিপুর, সিঞ্জারি, মাল্লা ও বেওয়া। জেলা বৰ্দ্ধমান—বুজরুক নবগ্রাম, সেঁয়ো ও নবগ্রাম। জেলা ভাগলপুর—রতনপুর, বিহিপুর, লক্ষ্মণপুর (১ম), পৌনী, লক্ষ্মণপুর (২য়), চোঢ়ন, মস্কন বরারিপুর, মুখেরিয়া ডুমরামা ও খঞ্জরপুর। জেলা মুঙ্গের—পিপরা ও গন্ধর্ব্বপুর। জেলা মালদহ—কমলপুর ও বাহারাল। জেলা মেদিনীপুর—চন্দ্রকোণা নূতন-হাট ও চেতো জো‧ বসান।

৩। বাতুরের দাস—জেলা মুর্শিদাবাদ—বাতুর, গোকর্ণ, কোমড্ডা, হিলোড়া, বরার ও বেওয়া। জেলা বীরভূম—পরিহারপুর, কুলকুড়ি, ময়নাডাল, দুর্গাপুর, আলিগ্রাম, কালিকাপুর, মহীবতিপুর, গোপালপুর ও দত্ত বগ্‌তোর। জেলা বৰ্দ্ধমান—মাতোঞা, ভিন্ ভিন্ গোপালপুর, এরুয়ার, নূতন গ্রাম, জিয়ারা, নারায়ণপুর ও শিলাকোট। জেলা সাঁওতাল পরগণা—গোয়ালখোর ও মহারাজপুর। জেলা মালদহ—দোলা বিষ্ণুপুর।

ভরদ্বাজ সিংহবংশ।

১। আমলাইর সিংহ—জেলা মুর্শিদাবাদ—পুণ্যো ও পাতাণ্ডা। জেলা বৰ্দ্ধমান—রতনপুর ও পাণ্ডুগ্রাম। জেলা বীরভূম—মালঞ্চি। জেলা বাঁকুড়া—মান্দরা, মথুরা, দ্বারিকা ও চাকদহ। জেলা বগুড়া—গোপীনাথপুর। জেলা সাঁওতাল পরগণা—মহারাজপুর। জেলা মালদহ—মহুদীপুর, কামারডা ও গোপালপুর। জেলা মেদিনীপুর—সহর মেদিনীপুর দ্বারি ৷ বাঁধ।

মৌদ্গল্য করবংশ।

১। আলুগ্রামের কর—জেলা দিনাজপুর—সহর দিনাজপুর গণেশতলা। জেলা মুর্শিদাবাদ—মাসলা ও বিপ্রশিখর। জেলা বীরভূম—আমরা পালন ও গোবিন্দপুর।

২। কাঞ্চনগড়িয়ার কর—জেলা মুর্শিদাবাদ—কাঞ্চনগড়িয়া। জেলা বৰ্দ্ধমান—চাণক।

১৬। ৺জানকীনাথ সিংহ

প্রথম খণ্ড ১২৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র।

যশোহর জেলাস্থ পুঁড়াপাড়ানিবাসী ঘটকবংশের কারিকা

পুড়াপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ ঘটক মহাশয় নিজ বংশের নিম্নলিখিত প্রাচীন কারিকা লিখিয়া দিয়াছেন—

"বলির কুলে উপজিল সাত ভাইয়া পাঁচ ভাইয়া।
সাত ভাইয়া নৈপুর বাস বিভা তুস্‌স মাইয়া॥
পাঁচ ভাইয়া সঞ্চার দেশে সবাকে না পাই।
মহেশপুরে মহেশসিংহ মানকরে ভাই॥
যাদো সুত পাত ছাব্বিশ নাতি। নৈপুরে গোষ্ঠীপতি॥
দেশে কীর্ত্তি যাদববাটী। দূর বিদেশে কুলে ভাটী।
শ্রীধরসিংহ মুরারি তাত। মুরারে বলভদ্র জাত।
জগদানন্দে চন্দ্রকেতু। পুরুষোত্তম মহেশ বতু॥
রাজারামে শুকদেব নাম। মহেশপুর মাহেশী ধাম॥
গোমতি মিত্র লক্ষ্মীনাথ। রামকৃষ্ণ ঘনুর খ্যাত।
সুতা দিল সিংহ রাজারামে। মহেশপুর মাহেশী ধামে॥
শুকদেব জন্মিল তথি। তেই সে ধ্বনি ঘনুর নাতি॥
নাথ আদেশে ঘনুর পুথি। ঘনুর অংশে ঘনুর নাতি॥
যেন ভনিতে শচীপতি। তেমনি যেন ঘনুর নাতি॥

অথ শাখা -

মথুর রঘু লক্ষ রাম। দুর্গা যাদব অশোক নাম॥
গর্ভ বলি রামদেবে। হাড়ো হরিহর ক্রমে সেবে॥
শ্রীধরেতে শাখা বারো। বংশ বলি বিচার কর॥

২ ৫ ৯ ৭ ৩ ৭
শ্রী মুরারি রুদ্র কুমুদ নন্দন বল্লভে।
দুই পাঁচ নয় সাত তিন তিন দিবে॥
পঞ্চ বিনা কে এরি বংশে গ্রামে চারি শাখী।
দেশ বিদেশে বংশ বাসে কেহ বা শূন্য লিখি॥
ঘনুর নাতি ভনে ইতি শ্রীধরের অংশ।
পাঁজি ধরি লেখা করি বুঝাল সুবংশ॥"

বাৎস্যগোত্র বালিয়া শ্রীধর বলভদ্রসিংহের ধারা—পুড়াপাড়ার ঘটকবংশ
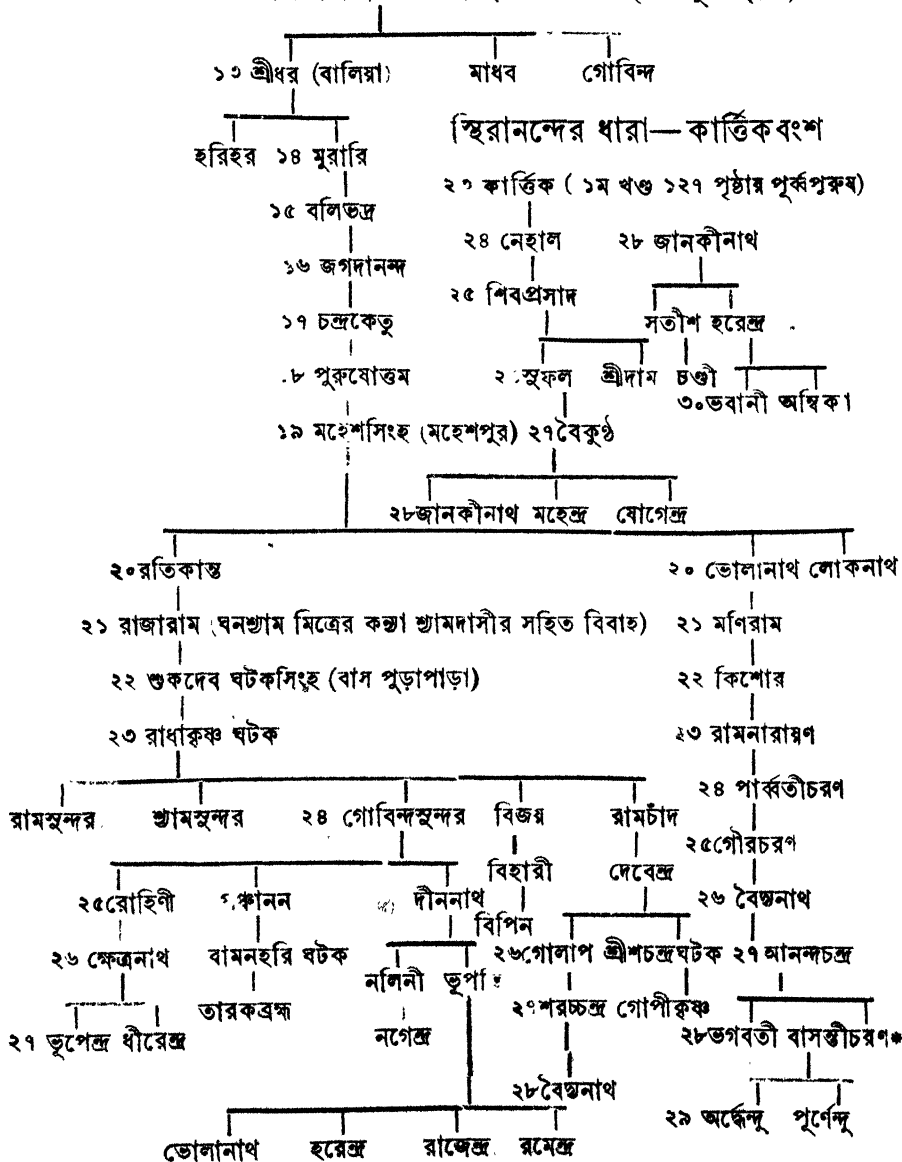
* শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ এম,এ, বি,এল, মজঃফরপুরের প্রসিদ্ধ উকীল। ইনি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন।

সমাপ্ত